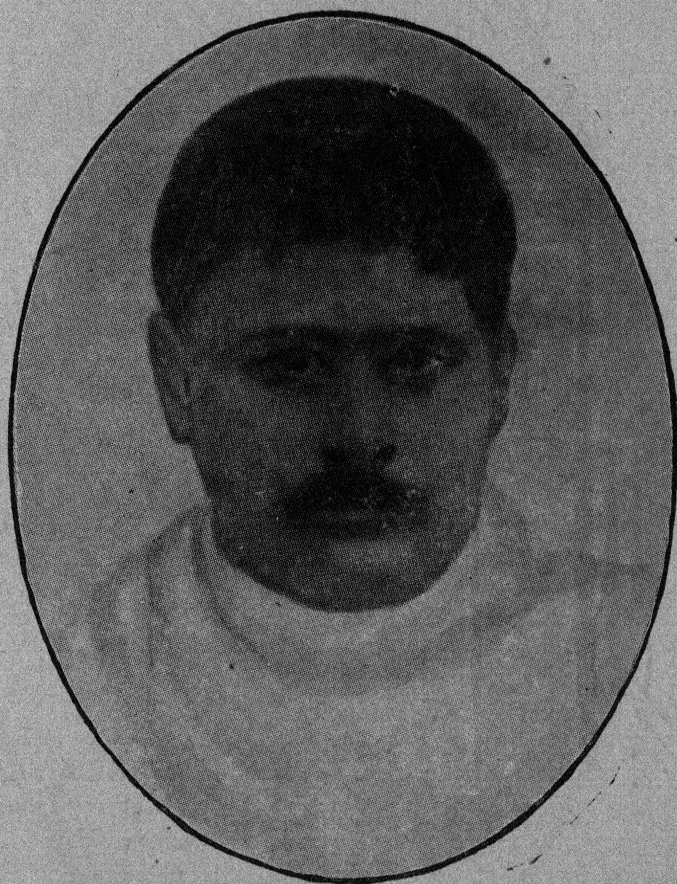
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, সাহিত্য মুদ্রণ
এ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০৭৩



রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

[illegible] করেষু

তোমার এক Inspector General এর সাহেবের Personal assistant এর নিকট লিখিত হয়, "I have made several applications to the District Supdt of Police for passing my salary for [illegible] He has neither passed my salary nor assigned any reason for withholding it. I humbly submit that he may be instructed to pass my salary." ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

9 Z [illegible]

May 30/52

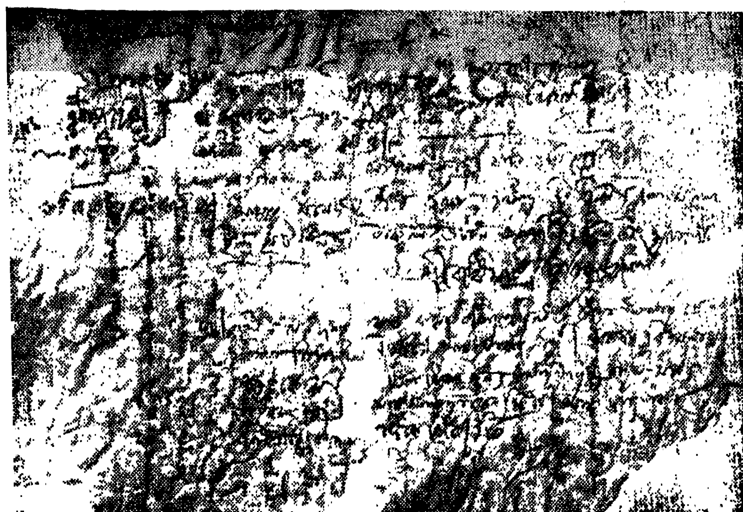
My dear Madame [illegible]

Excuse my not replying to you earlier. I do not know anything about my going to Broughly & though for aught I know the thing may happen here.

Trusting you are all well there

Yours truly

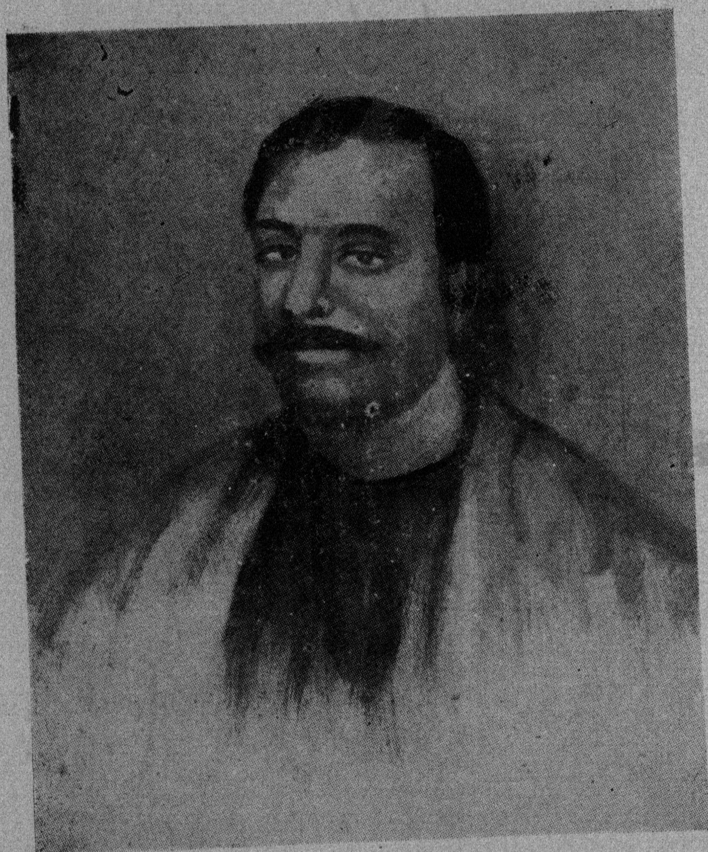
[illegible]



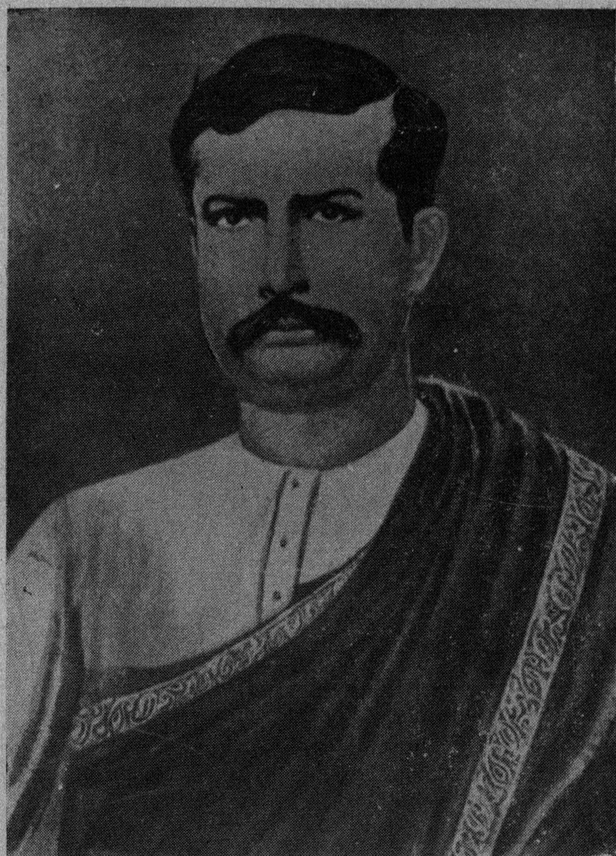
একটি শতছিন্ন চিঠির শেষাংশ



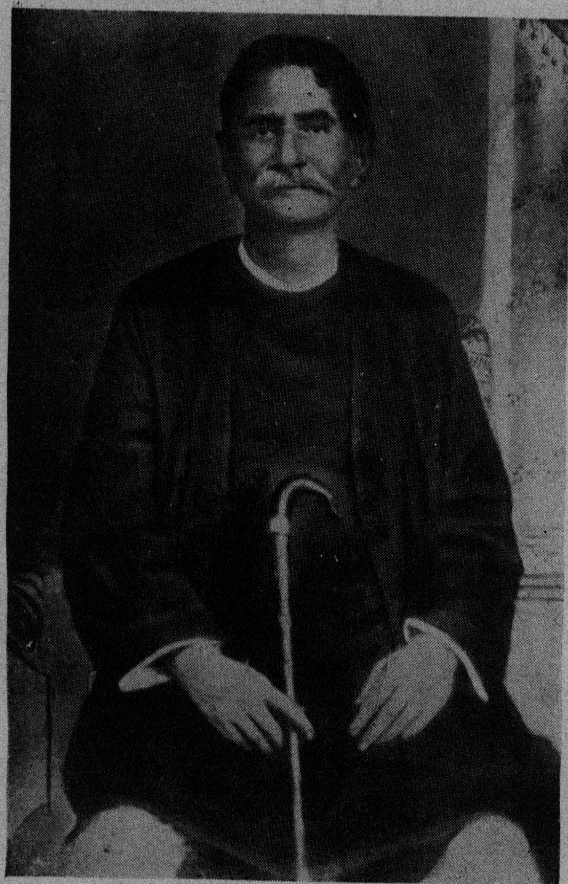
বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



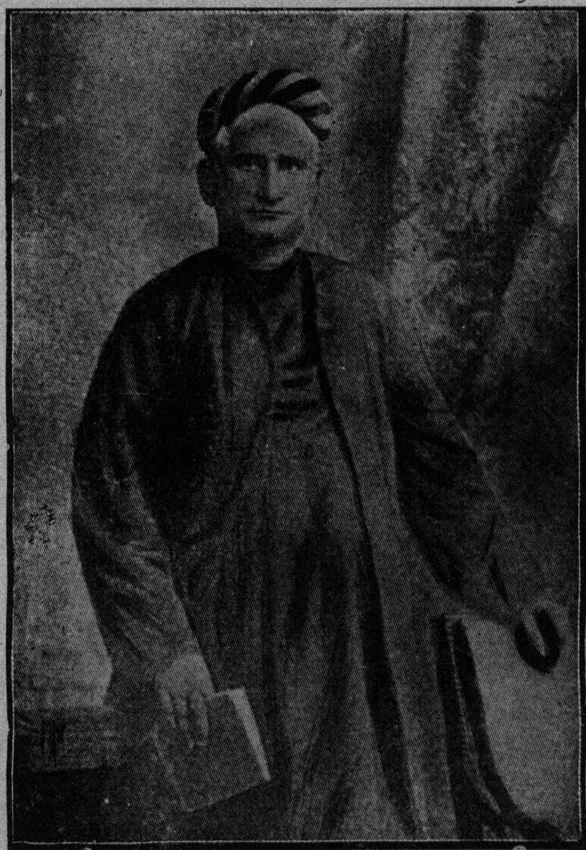
বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ



বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র



বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র



বঙ্কিমচন্দ্র



বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী



বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবী



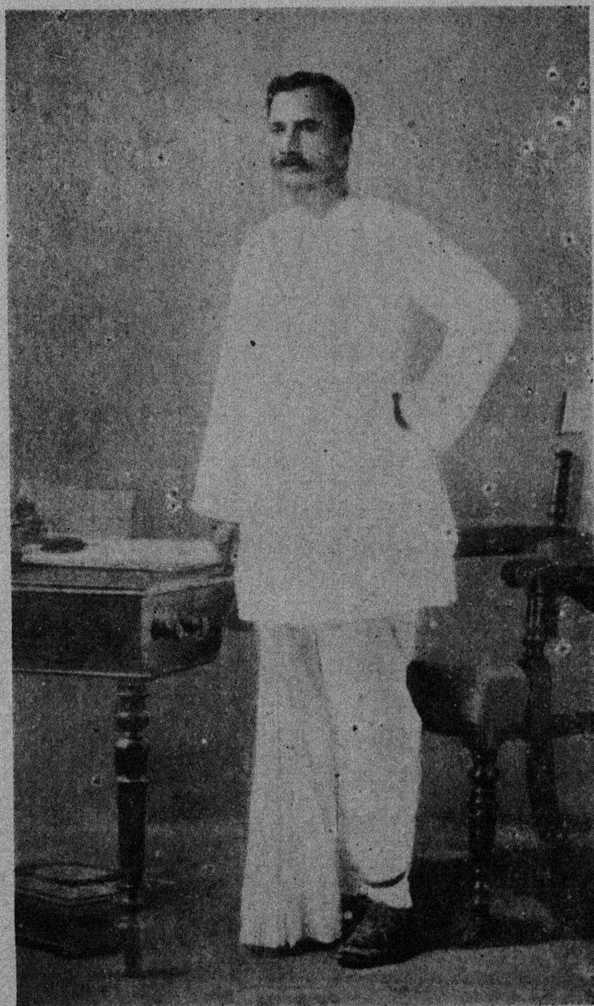
বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জ কুমারী দেবী



বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারী দেবী



শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্র



সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র



দীনবন্ধু মিত্র



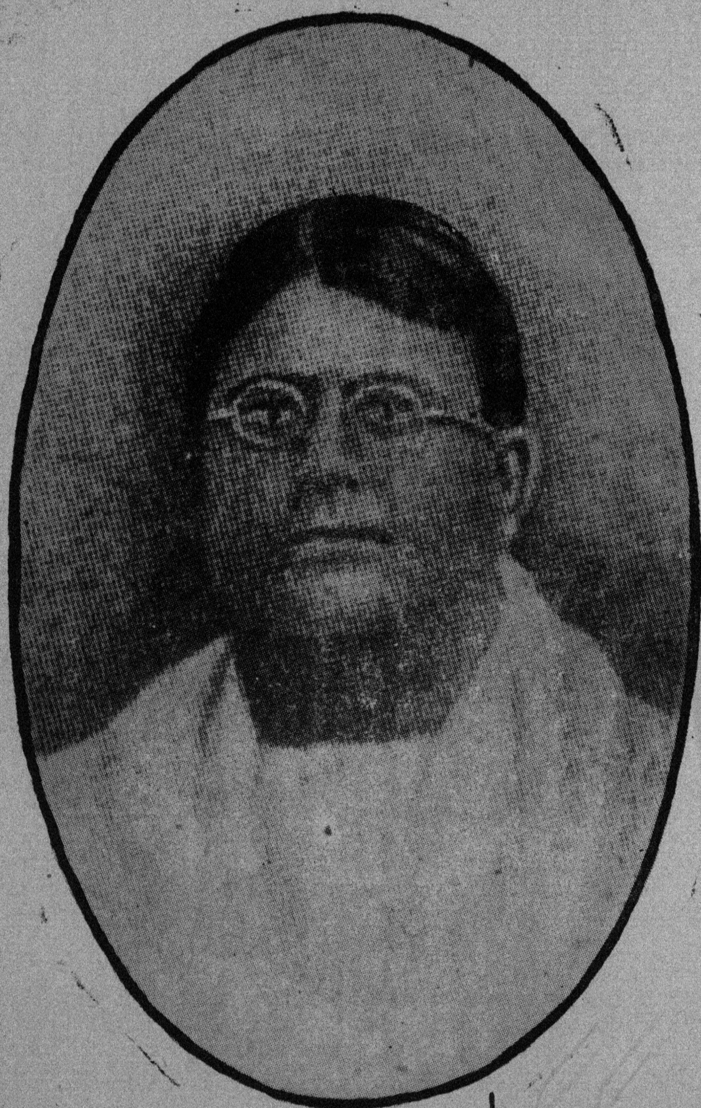
দামোদর মুখোপাধ্যায়



শ্রীশচন্দ্র মজুমদার



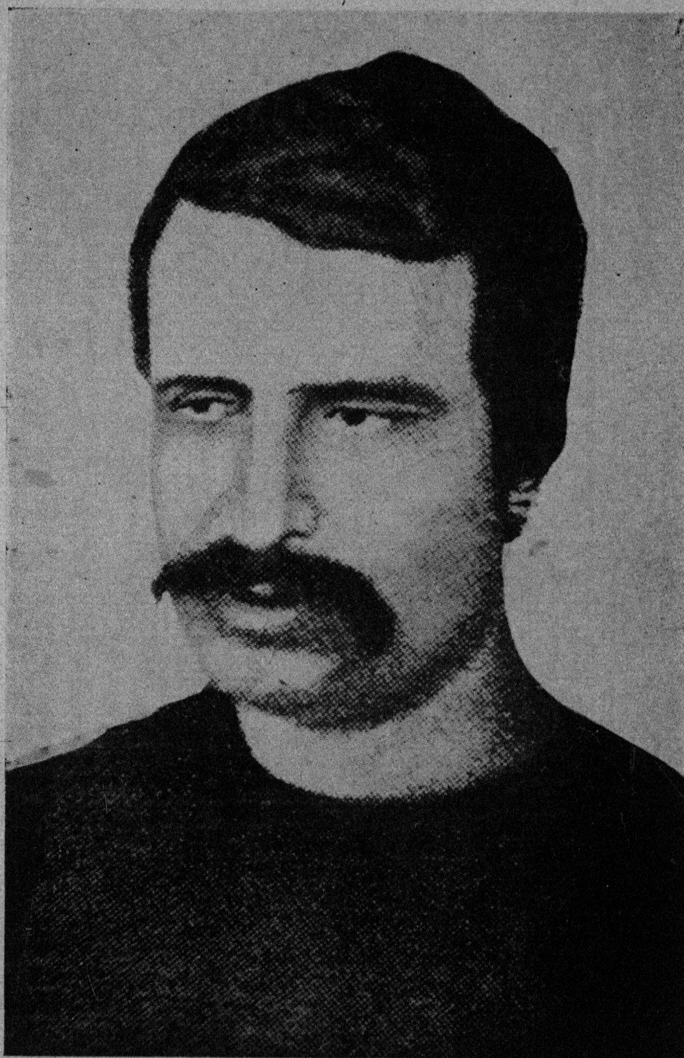
অক্ষয়চন্দ্র সরকার



সুরেশচন্দ্র সমাজপতি



যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু



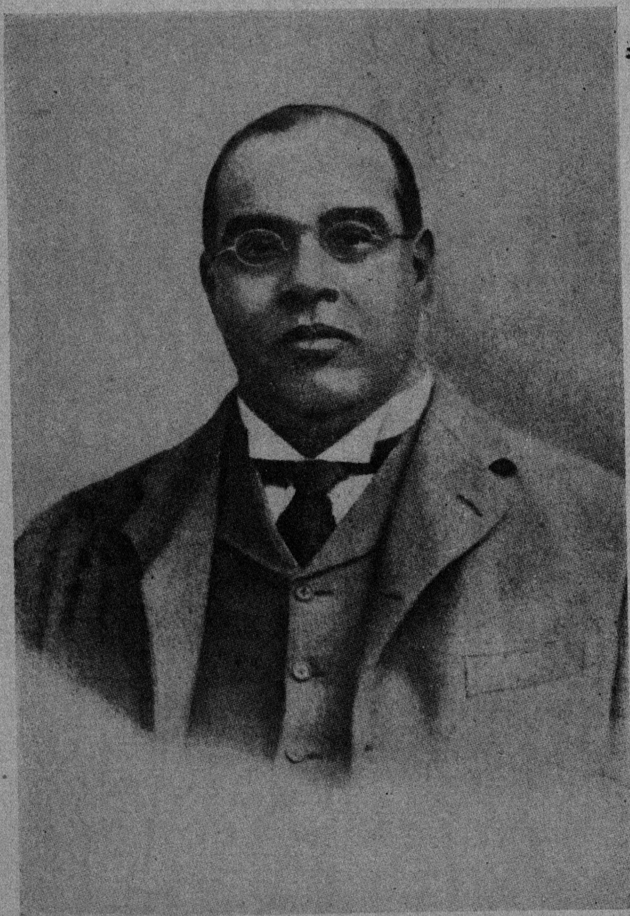
ভূদেব মুখোপাধ্যায়



নবীনচন্দ্র সেন



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



রমেশচন্দ্র দত্ত

১

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কাঁটালপাড়ার বাড়ি থেকেই গঙ্গা পার হয়ে অপর পারে হুগলীর কোর্টে যাতায়াত করেন। কিছুদিন যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন তিনি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করে হুগলীর পাশে চুঁচুড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে সেখানে চলে গেলেন।

ঐ সময় চুঁচুড়া থেকে পিতা যাদবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি চিঠি, যাদবচন্দ্রেরও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠির উত্তর এবং পিতাকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের দুই অগ্রজ শ্যামচন্দ্র বা শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সেই সময়কার কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি পাওয়া গেছে। এই চিঠিগুলির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির একটা ছোটখাট বৈষয়িক ব্যাপার রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কবে এবং কেন বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন, সেই নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক্। আলোচনা কালে যথা সময়ে চিঠিগুলিও উদ্ধৃত করব। এতেই বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি দুটির এবং অপর চিঠিগুলিরও ইতিহাস পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কারণ ও সময় সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—'১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বন্ধ করিয়া দিলেন।⋯ ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁটালপাড়ার বাড়ির অংশ দেন নাই। ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল।⋯এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল-পাড়ার বাস উঠাইয়া চুঁচুড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চুঁচুড়ায় যাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'১২৮৩ সালের প্রথমে

বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কারণবশত বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।'

শচীশবাবু তাঁর ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র আবার বঙ্গদর্শন উঠিয়ে দেবার যে দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি হ'ল 'আত্মীয়-বিরোধ'।

এখন দেখা যাক্, প্রথমত—ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবুর কথামত বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার সময়টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে সদ্ভাবের অপ্রতুল ছিল কিনা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহও ঘনিয়ে উঠেছিল কিনা? আর শচীশবাবুর কথামত তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আত্মীয়বিরোধ হয়েছিল কিনা? দ্বিতীয়ত—ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবুর লেখা অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়ি ছাড়ার সময় তাঁদের ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পেকে উঠেছিল কিনা? তৃতীয়ত—শচীশবাবুর কথামত ১২৮৩ সালের প্রথমে এবং ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবুর লেখা অনুযায়ী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১২৮৩ সালের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন কিনা?

এখন এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই—

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র উইল করে চার পুত্রকেই পৃথক অন্ন করে দেন ১২৭২ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন বন্ধ করেন ১২৮২ সালে। অতএব বঙ্গদর্শন বন্ধ করার সময়টা হচ্ছে, যাদবচন্দ্রের উইল করার ১০।১১ বছর পরে। যাদবচন্দ্র তাঁর উইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচন্দ্র বা শ্যামাচরণকে ও তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বসত বাটীর কোন অংশ দেননি। এঁদের না দিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রকে এবং অল্প উপার্জনের কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে সমস্ত বসত বাটী দান করেছিলেন। যাদবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়ির অংশ না দিলেও পরে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর নিজের অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখে দিয়েছিলেন। এই জন্যও বটে আর সঞ্জীবচন্দ্রের অভাব-অনটনের জন্যও বটে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে বহুদিন মাসে ১০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য করতেন। পরে মাসে ৬০ টাকা করে এবং তারও পরে মাসে ৩০ টাকা করে বহু বৎসর সাহায্য করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বাড়ির অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখে দেন ১২৮১ সালে অর্থাৎ বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার আগের বৎসর। বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কয়েক মাস পরে ১২৮৩ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র এক দানপত্রের দ্বারা

সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব দান করেন। এর ফলে সঞ্জীবচন্দ্র পুনরায় ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তো লিখতেনই, এমনকি নিজের সম্পাদনার সময়ের ন্যায় বঙ্গদর্শনের যত্নও নিতেন। এই সব কারণে, এখন বলা যেতে পারে যে, অনেক পূর্বে বা পরে যাই হোক, অন্তত বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কিছু আগে বা পরে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনরূপ মনোমালিন্য ছিল না।

পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বা সঞ্জীবচন্দ্রের কোনদিন যে তীব্র মনোমালিন্য হয়েছিল, এমন কোন নজির পাওয়া যায় না। বরং পূর্ণচন্দ্রের উপর এঁদের যে চিরদিনই পরিপূর্ণ স্নেহ ছিল তারই বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের সঙ্গেই অন্য ভাইদের কয়েকবার মনোমালিন্যের কথা জানা যায়। তবে বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কিছুদিন আগে বা পরে শ্যামাচরণের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতাদের যে অসদ্ভাব ছিল, এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীত নিদর্শনই পাওয়া যায়। কেন না, বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার ঠিক তিন মাস আগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির নিকটের অধিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্যামাচরণের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রদের চার ভাইকে একত্রে গল্প করতে দেখেছিলেন। শাস্ত্রীমশায় ঐ সময় বি এ পাস করে বঙ্গদর্শনে তাঁর একটা লেখা ছাপাবার জন্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই প্রথম দিনের পরিচয়ের প্রসঙ্গে শাস্ত্রী-মশায় ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় লিখে গেছেন—'তিনি (রাজকৃষ্ণবাবু) আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলাম যে, তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙাইলেই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ির দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ি ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল। আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি কে ?···

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন···বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়া ছিল। আমার 'ভারত মহিলা' লইয়া বাকি

তিন মাস পূর্ণ হইল। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ছাড়িয়া দেন।'

এ ছাড়া আরও দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের যে দানপত্রটি লিখে দেন, সেই দানপত্রে শ্যামাচরণ এবং পূর্ণচন্দ্রও স্বাক্ষর করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে তখন যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল, এ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব এখন বলা যেতে পারে যে, বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কিছু আগে বা পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতাদের, বিশেষ করে শ্যামাচরণেরও কলহ তো ঘনিয়ে ওঠে নাই-ই বরং সদ্ভাবই ছিল। তাই ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবু কথিত 'ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল' বা ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না।

শচীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বন্ধ করার অন্যতম কারণ হিসাবে 'আত্মীয় বিরোধে'র কথা বলেছেন। এই আত্মীয় বিরোধ বলতে ভ্রাতৃবিরোধ কিনা তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা ভিন্ন অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধের কোন কথা শোনা যায় না। আর তাহলেও তাঁদের সঙ্গে বিরোধের জন্য বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কারণও থাকতে পারে না। শচীশবাবুর কথিত আত্মীয়বিরোধ অর্থে ভ্রাতৃবিরোধ হওয়াই সম্ভব। যদি তাই হয়, তাহলে পূর্ব আলোচনা থেকেই বলা যেতে পারে, বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার সময় ভ্রাতাদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন কোন বিরোধ ছিল না।

বঙ্গদর্শন বন্ধ করার আসল কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, শেষ দিকে প্রতি মাসে কাগজের জন্য তাঁকে একাই প্রচুর লিখতে হ'ত। চাকরি করতে করতে তিনি আর পেরে উঠছিলেন না। তাই কাগজ বন্ধ করে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়ি ছাড়ার কথায় ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবু লিখেছেন, 'ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে।'

এখন সত্যই কি বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘোর ভ্রাতৃবিরোধের জন্যই কাঁটালপাড়ার বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় চলে গিয়েছিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়ি ছাড়ার কারণ সম্পর্কে আমি যতদূর জানতে

পেরেছি তাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের উপর এবং পিতা যাদবচন্দ্রের উপরও অনেকটা ক্ষোভ ও অভিমানবশতই তাঁর নিজ বাড়ি (সঞ্জীবচন্দ্র প্রদত্ত) ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে শ্যামাচরণের ও পূর্ণচন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকে বসতবাটীর যে অংশটি পেয়েছিলেন সে অংশটি ছিল সব চেয়ে সেরা। এর দক্ষিণ ও পূর্ব দিক খোলা এবং এই অংশটি সদর বাড়ির সংলগ্ন। সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র তাঁদের একত্রের সদর বাড়ির অংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখে দেওয়ায় এই সদর মহলটি তখন তিনজনের অংশে দাঁড়িয়েছিল এবং কার কোন্ অংশ সেরূপ ভাগ না হওয়ায়, তিনজনেরই একত্রে সম্পত্তিটি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র প্রদত্ত নিজ অংশের লাগোয়া পূর্ব দিকে সদর মহলের একাংশে জামাতাদের জন্য ঘর তৈরি করতে আরম্ভ করলে সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কেননা সঞ্জীবচন্দ্র নিজ অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখে দেওয়ায় বসতবাটীর মূল অংশে তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি পূর্ণচন্দ্রের একটা অংশে বাস করছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র থাকায় তাঁর সংসার অত্যন্ত ছোট ছিল। মূল বসতবাটীতে কোন অংশ না থাকায় তিনি ঠিক করেছিলেন, সদর বাড়ির ঐ অংশে একমাত্র পুত্রের জন্য বাড়ি করে দেবেন। সদর বাড়িরও এই অংশটাই ছিল সেরা, কারণ সদর বাড়ির উত্তরে ছিল ঠাকুর দালান, পূর্বে বঙ্গদর্শন প্রেসের অফিস, আর দক্ষিণে ছিল দুটি বৈঠকখানা। সদর বাড়ির ঐ অংশে বাড়ি করে নিলে অন্যস্থানে আলো বাতাসের কিছু অভাব হয়।

এই কারণেই হয়ত সঞ্জীবচন্দ্র ঐ অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতাদের জন্য বাড়ি করায় আপত্তি করেছিলেন, আর আপত্তি যদি নাও করে থাকেন তো নিশ্চয়ই কোন উৎসাহও দেখান নি। সঞ্জীবচন্দ্রের এই আপত্তি বা উৎসাহের অভাবের কথা যে অনুমান করছি, তার কারণ এও হতে পারে যে—সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁর প্রদত্ত বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র জামাতাদের না বসালে শেষ সময়ে তিনি তাঁর (সঞ্জীবচন্দ্রের) পুত্র জ্যোতিশকেই বাড়িটি দান করে যাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থাপন্ন জামাতারা পরে শ্বশুর বাড়িতে থাকবেন না, এই বলে যাদবচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ জামাতাদের জন্য বাড়ি করায় বাধা

দিয়েছিলেন। যাদবচন্দ্র চাইতেন না যে, তাঁর নিজ চট্টোপাধ্যায় বংশে অর্থাৎ তাঁর পৌত্র প্রপৌত্রদের সঙ্গে অন্য গোত্রীয় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা ও দৌহিত্ররা একত্রে বাস করেন। যাদবচন্দ্র তাঁর উইলে বঙ্কিমচন্দ্রকে যে বসতবাড়ির অংশ দেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান না থাকা, তারও একটা কারণ ছিল।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতাদের জন্য এই গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত ঐ সব কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন—এ ব্যাপারে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকেই আপত্তি এসেছে। তাই অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃদত্ত না হলে ভ্রাতৃদত্ত সম্পত্তিতে বাস করবেন না বলে, ভ্রাতৃদত্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে চুঁচুড়ায় চলে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় চুঁচুড়ায় গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁর পিতাকে যে পত্রটি দিয়েছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন—

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ

প্রণাম শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ, ভোলা মাঝির মারফৎ ৭।। টাকা ও আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্দরমহলের চাবি পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। পূজার দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণচন্দ্রের ভাণ্ডারে রাখাইবেন এবং পূজার কর্ম্মের ভার বিপিনের মাতাকে দিবেন। পূজার সময়ে আমাদিগের কাঁটালপাড়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।...

আমার ক্ষোভ নিবারণার্থ এই পত্র মধ্যে একখানি মুশাবিদা পাঠাইলাম। পড়িয়া দেখিবেন, উহাতে অতি সামান্য কথা আছে মাত্র। যদি ঐ মুশাবিদা মত একখানি দলিল মহাশয় আমাকে লিখিয়া দেন, সপরিবারে আবার কাঁটালপাড়ায় যাইব। যদি উহা কাল লেখাপড়া হয়, তবে পরশু পরিবার কাঁটালপাড়ায় পাঠাইব। যেদিন লেখাপড়া হইবে, তাহার পরদিন পাঠাইব। আর উহা লিখিয়া দিতে যদি মহাশয় অস্বীকৃত হন অথবা যদি মধ্যমের সম্মতির অপেক্ষা করেন, তবে আর একদিনের জন্যও কাঁটালপাড়ায় যাইব না।

...মধ্যমের...কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার কোন হক্ বা স্বত্ব আমায় দিতেছেন না—বা ইহাতে তাঁহার কোন ইষ্ট-অনিষ্ট নাই। যদি তথাপি তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা করেন, তবে জানিব যে তাঁহার সম্মতি ব্যতীত আমাকে কাঁটালপাড়ায় যাইতে দিতে মহাশয়েরও ইচ্ছা নাই! এই দলিল লিখিত পঠিত হইলে কাঁটালপাড়ায় আমার বাস করা হইবে, এমন বুঝিতে পারিলে মধ্যম উহাতে কখনই সম্মত হইবেন না। ইহা নিশ্চিত জানিবেন। ইতি—তাং ২১ আশ্বিন

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠির মধ্যেকার বিপিন হলেন, পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পরবর্তীকালে কর্মজীবনে সাবজজ হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতাকে লেখা চিঠির সঙ্গে যে দলিলের মুশাবিদাটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি এই—

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি

লিখিতং শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং কাঁটালপাড়া, পঃ হাবিলিশহর, থানা নৈহাটি, সব ডিষ্ট্রিক্ট নৈহাটি, জেলা ২৪ পরগণা। উক্ত কাঁটালপাড়া গ্রামে আমার যে ভদ্রাসন বাটী ছিল ও আছে, তাহা সন ১২৭২ সালে আমি আমার পুত্র শ্রীমান্ সঞ্জীবচন্দ্র ও শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দান করিয়া ছিলাম। তৎকালে ঐ ভদ্রাসন বাটী চারি অংশে বিভক্ত করিয়া আমার চারি পুত্রকে দান করিবার আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচন্দ্র…আমায় তৃতীয় পুত্র তুমি, তোমরা পৃথক ২ বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার কৃত ভদ্রাসন বাটীর অংশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে, তোমাদিগের দুইজনকে ভদ্রাসন বাটীর কোন অংশ না দিয়া সমুদয় দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলাম। তৎপরে শ্যামচন্দ্র পৃথক বাটী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছেন, তুমিও পৃথক বাটী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে কিন্তু তোমার ভ্রাতৃদ্বয় সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের ও আমার অনুরোধে তাহা বন্ধ করিয়া আমার প্রস্তুত করা ভদ্রাসন বাটীর এক অংশ (যাহার চৌহদ্দী নীচে দেওয়া গেল) মেরামত করিয়া ও তাহাতে নূতন ঘর প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছ। ঐ অংশ…কে আমি…তিনি ঐ অংশ তোমাকে দান পত্রের দ্বারা দান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উহার সদর বাটীর তৃতীয়াংশ তিনি ও পূর্ণচন্দ্র তোমাকে দান করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ভদ্রাসন পিতৃদত্ত নহে বলিয়া তুমি তাহাতে বাস করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্থানান্তরে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। এজন্য আমি তোমাকে লিখিয়া দিতেছি যে, আমার ভদ্রাসনের যে অংশ তোমাকে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা তোমার হক, সন ১২৭২ সালের দানকালে তুমি উহা লইতে ইচ্ছুক হইলে আমি তোমাকেও দান করিতাম। পরে…উহা দান করিয়াছেন, সেও আমার অভিপ্রায় অনুসারে। ঐ দান সিদ্ধ এবং আমার অনুজ্ঞাত, এবং আমার নিজকৃত জ্ঞান করিয়া উহাতে তুমি বসবাস করিতে থাকিবে। ইতি—

চৌহদ্দী—

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে চিঠি ও মুশাবিদাটি উদ্ধৃত করলাম, তাতে কয়েক জায়গায় '...' এই চিহ্ন দিয়েছি। এই চিহ্নিত অংশগুলি বর্তমানে প্রাপ্ত মূল চিঠি ও মুশাবিদায় ছিন্ন ও লুপ্ত। তবে সুখের কথা এই যে, মাত্র অল্প অল্প জায়গা ছিন্ন ও লুপ্ত হওয়ায়, সমস্ত ঘটনাটা জানা থাকলে পড়ার সময় ঐ অংশগুলিতে কি কথা ছিল তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সম্মানার্থে মুশাবিদায় কিছু কথা অন্যভাবে লিখে দিয়েছিলেন। যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি এবং চিঠির সঙ্গে প্রেরিত মুশাবিদাটি পেয়ে যাদবচন্দ্র তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে এই পত্রটি লিখেছিলেন—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপঞ্চ বিশেষ। পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। মধ্যমবাবু বাটী আসিয়াছিলেন। পুনরায় গত রাত্রে যশোহর গিয়াছেন। তোমার বাটী প্রস্তুত করণের আপত্য কি আছে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন যে, আমাদিগের ভ্রাতাগণের জীবনাবধি তাঁহার বাটী প্রস্তুত হওনের কোন বাধা জন্মিবেক না। কি আপত্য...কথা বলিতে পারি...আমি আপন কি জ্যোতিশের নামে লেখাইয়া লইব না। পূর্ণর অদেয় আমাদিগকে কিছুই নাই। কিন্তু আমার বিবেচনা আবশ্যক। এজন্য যদিও আমি নিরাশ্রয় হইয়াছি এবং ঋণ-বিপদে আমার সর্বস্ব যাইবেক, তত্রাচ পূর্ণর বাটী আমি লইব না। পূর্ণ লিখিয়া দিতে সম্মত আছে।

১ম দফা—তোমার বসতবাটী ও গলির পথ ইত্যাদি যাহা আমার দত্ত দানপত্রের দ্বারা লইতে ইচ্ছা কর, তাহা আমি দিতে সম্মত আছি, বরং খসড়া করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু প্রথম দানপত্রের মর্মানুসারে দ্বিতীয় দানপত্র বলবৎ হইবেক না বোধ হয়। অতএব দ্বিতীয় দানপত্রের প্রয়োজন নাই। তুমি যে বাটীতে বাস করিতেছ তাহাতেই বাস কর, বাটী আর বাড়াইয়া খরচপত্র করিবার আবশ্যক নাই। যাহাতে বাস করিতেছ, তাহাতে তোমার অকুলান হইবেক না। কেননা...কন্যাদ্বয় এ বাটীতে থাকিবেক না।... কখন ২ দেখিতে পাইবা কিনা সন্দেহ। জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রতি এ বাটীতে আছে, পশ্চাৎ রাখাল এখানে রাখিবেক না, ইহা নিশ্চয়। এখন তুমি এ কথা বুঝিতে পার বা না পার পশ্চাৎ বুঝিবা। যে হেতুক শ্বশুরালয়ে বাস করা যাহা ঘৃণিত কথা তাহা

কদাচ সহ্য করিবে না, ইহা নিশ্চয়। তোমাকে পুত্র সন্তান দিলেন না তবে কি জন্য খরচ করিয়া বাটী বানাইবা, তাহার আবশ্যক নাই। যে স্থান তোমার আছে, তাহাতে অকুলান হইবেক না। বরং অর্থ সঞ্চয় করা ভাল; যেহেতুক পশ্চাৎ যাহাকে যাহা দিতে হয় দিতে এবং আমার শ্রাদ্ধে খরচ করিতে পারিবা, এবং অর্থেন সর্ববশ। বিশেষ তুমি আমার মুখোজ্জলকারী পুত্র। তোমার নামে আমি নামিত ··তুমি··· না থাকায় এবং···কথা লেখায় আমার বুদ্ধি ধ্বংস হইয়া তোমার জন্য অতি কাতর হইয়াছি। তুমি বাটী আইস যাহাতে আমার তুষ্টি জানিবেক। কাঁটালপাড়ায় থাকিব না একথা ছাড়। তোমার যাহা স্থান আছে যথেষ্ট। যদি বাটী করিবার জন্য অনেক টাকা জমাইতে পার ও নিতান্ত ইচ্ছা হয় বাটী কর তাহা হইলে আমি রমানাথের স্থান লইয়া তোমায় দিব সন্দেহ নাই, তথায় বাটী বানাইবা। ইতি—

এই চিঠির জ্যোতিশ হলেন সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র। সঞ্জীবচন্দ্র তখন যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর রাখাল হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা। চিঠিতে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কন্যাদ্বয়'এর কথা আছে তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বা কনিষ্ঠা কন্যা। রমানাথ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি।

বাড়ি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষোভ ও অভিমানের সময়, এই প্রসঙ্গেই সঞ্জীবচন্দ্র তখন তাঁর পিতা যাদবচন্দ্রকে যে দুটি চিঠি লিখেছিলেন, ছিন্ন হলেও সে চিঠি দুটিও পাওয়া গেছে। সে দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রণামা নিবেদঞ্চ বিশেষ—

আমি আগামী ২৪শে শনিবার প্রাতে বাটী পৌছিব। শনি, রবি দুই দিন কাছারি বন্ধ আছে। সেই সময়ে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাটী সম্বন্ধে যে দলিল বলেন, দস্তখত করিয়া দিব। তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই অন্যায় ব্যবহার করি নাই। আপনি নিরাশ্রয় হইয়া···বাটী লিখিয়া দিয়াছি··· অদৃষ্ট বশত তিনি আমার উপর বাদ···

আমি সে কথায় বিশেষ ক···

এক্ষণে যাহা করিতে বলেন করিব। কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, কেবল নতুন দলিলের দ্বারা নতুন বিরোধ বাধাইবেন না। যে কার্য করিতে হইবে ভবিষ্যৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিবেন। যদি আপনার দানপত্র

কোন কৌশলে অন্যথা করিতে পারেন, তাহা হইলে দাদার প্রাপ্য ভুলিবেন না। কেবল আমার ও বঙ্কিমের…

দাদা একেই উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, আরও বিষম হইয়া উঠিবেন। তৎভিন্ন দানপত্রে লিখিয়া দিয়াছেন যে, এই দানপত্র…কোন প্রকারে অর্থাৎ অন্য দলিলের দ্বারা অন্যথা করেন, তাহা হইলে সে অন্যথা গ্রাহ্য হইবে কিনা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। যদি আপনি কি বঙ্কিম…তথাপি যদ্যপি একান্ত অন্যথার নিমিত্ত আপনার জেদ জমিয়া থাকে…ভাল উকিলকে দেখাইয়া দলিল দস্তখত…

প্রণামা নিবেদঞ্চ বিশেষ।

আগামী শনিবার দশহরা উপলক্ষে বন্ধ আছে, মনে করিয়াছিলাম বাটী যাইব। কিন্তু কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। অতএব অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া যাইব না। বঙ্কিমচন্দ্রের বাটী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার এইমাত্র লিখিবার আছে যে, আমি পূর্ণচন্দ্রের বাটী কদাচ স্বনামে কি বেনামে লইব না। পূর্ণচন্দ্রের দশা আমারই মত। তাহার এক পয়সা দান করিবার ক্ষমতা নাই। তাহার নিকট হইতে‥ দ্রব্য লইতে পারি দ্বিরুক্তি করিবে না।

পূর্ণর নিকট হইতে বাটী লইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে পরামর্শ দিতেছেন, কিন্তু আট দশ বৎসর পূর্বে হইলে বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে সহস্রবার নিষেধ করিতেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বোধাবোধ বড় আশ্চর্য ছিল।

পূর্ণচন্দ্রের বাটী আত্মসাৎ করিতে আপনি স্পষ্ট অনুরোধ করেন নাই, বোধ হয় কখন করিবেন না, করিলেও আমি শুনিব না। যদি বলেন, আমার মহলে পূর্ণচন্দ্রের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব তাহা গ্রহণ করিবার হানি কি? কিন্তু আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছি, পূর্ণচন্দ্রের মহলে পূর্ণর কুলান হয় না।…

তখন এক ভাইকে পৃথক স্থানে বাস করিতে হইবে। তাহাদের যে মহলে আমি আছি, সে মহল থাকিলে আর গোলযোগ হইবে না। তখন আমি ঐ মহলে থাকিলে পূর্ণর মনে হইতে পারে যে ঐ মহল যদি আমার থাকিত তবে এ কষ্ট পাইতে হইত না। পূর্ণর যদি এরূপ মনে না হয় আমার মনে এরূপ হইতে পারে যে, আমি না থাকিলে পূর্ণর এ অকুলান হইত না।…

বঙ্কিমচন্দ্র বাটী করিবেন না বলিয়া কাতর হইবেন না। বঙ্কিম নিশ্চয়

বাটী করিবেন। কোন কথা তাঁহার স্মরণ থাকে না, পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যাহা বলিতেছেন, পরে তাহা ভুলিয়া যাইবেন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পিতাকে লেখা চিঠিতে যে বলেছিলেম পৈতৃক বাটীর অংশ না পেয়ে দাদা উন্মাদের মত ব্যবহার করছেন। তা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ যাদবচন্দ্রকে লেখা শ্যামাচরণের ঐ সময়কার কয়েকটা চিঠি যা পাওয়া গেছে, তা থেকে তাঁর ঐ সময়কার মনোভাব পরিষ্কার জানা যায়। চিঠিগুলি বহু পুরাতন হওয়ায় মাঝে মাঝে ছিন্ন। যাই হোক্ চিঠিগুলি পরে উদ্ধৃত করছি।

আর সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পিতাকে যে লিখেছিলেন—পূর্ণচন্দ্রের মহলে পূর্ণর কুলান হয় না ইত্যাদি—এ সব কথাও বঙ্কিমচন্দ্র জেনেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এ সবেরও উত্তর দিয়ে তাঁর পিতাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটিও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সেটিও উদ্ধৃত করছি।

এখানে এই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাড়ী বা পৈতৃক বিষয় নিয়ে এঁদের গণ্ডগোল অল্পদিনের মধ্যেই মিটে গিয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রদত্ত অংশেই বঙ্কিমচন্দ্র ফিরে এসেছিলেন এবং পূর্ণচন্দ্র তাঁর অংশের কিছুটা সঞ্জীবচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। আর শ্যামাচরণ পৈতৃক বাড়ির অংশ না পেলেও বাড়ির পাশেই পৈতৃক জায়গা পেয়ে তাতে নিজে বেশ বড় বাড়ি করে নিয়েছিলেন।

এখন শ্যামাচরণের চিঠিগুলি এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও চিঠিটি পর পর উদ্ধৃত করছি—

শ্রীশ্রীহরি

সহায়

সেবক শ্রীশ্যাম

প্রণামা শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ।

আজ্ঞাপত্র পাইলাম এবং শিরোধার্য করিলাম। মহাশয়কে কিছু সমাচার লিখি নাই সত্য, কারণ তাহাতে মহাশয়কে লেখা বনে বসে রোদন করা মাত্র। যদি আমি আপনার পুত্র হইতাম কিম্বা দাসীপুত্রের ন্যায় থাকিতে পাইতাম তাহলে পত্র না লেখার জন্য অপরাধী হইতাম বটে।

সমুদ্রের চরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সমুদ্রে যাওনে কি মরণে আমার কি আর ভয় আছে (পুত্র শোক কি দুরন্ত)…শ্রীশ আমার যেখানে গিয়াছে, সেই পথেই আমার…ভাল।…যখন বিনা অপরাধে স্বধর্মে থাকিয়া পিতা-পিতামহের বিষয় হইতে নৈরাশ হইলাম তার জ্বালা যাবজ্জীবন সহ্য করা অপেক্ষা…দেহ ঢালাই ভাল।

শ্রীশ্রীহরি

সহায়

শ্রীচরণ কমলেষু

সেবক শ্রীশ্যাম

শ্রুত হইলাম মহাশয়ের প্রিয়তম পুত্রগণ ঠাকুরপালা করিতে ব্যস্ত আছেন। আমি পালা করিব না বলাতে মহাশয় তাঁহাদের পালা দেন নাই, এ জন্য আমি দোষী হইয়াছি।

আমি পালা না লইবার কারণ…এই জন্য যে যখন পৈতৃক…বিভাগ পাইলাম না…

জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং পত্র লিখিয়াছি যে আমাকে আমার পৈতৃক বাটীর অংশ দিবেন কিনা, যদি না দেন, তবে তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর না দেন যদি, তবে আমার মাথা খাবেন…

শ্রীশ্রীহরি

সহায়

শ্রীচরণ কমলেষু

সেবক শ্রীশ্যামচন্দ্র শর্ম্মণঃ

প্রণামা শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ।

আজ্ঞাপত্র পাইয়া শিরোধার্য করিলাম। ছোট ঠাকুরানী দিদির কাল হইয়াছে, লিখিয়াছেন যে 'পৈতৃক বিষয় পাইলাম আনন্দ হইল।' দেখিলেন যে পৈতৃক বিষয় পাইলে আনন্দ হয় কি না। এই…বয়সে যখন আপনার এই অচিন্ত্যনীয় বিষয় প্রাপ্তে এই আনন্দ, তখন আমি আপন…বঞ্চিত হইলে অন্তরে বেদনা পাইতে পারি কিনা।

এখানে উদ্ধৃত প্রথম চিঠির শ্রীশ হলেন শ্যামাচরণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মারা গেলে শ্যামাচরণবাবু পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন।

শ্যামাচরণবাবুও তাঁর পিতা এবং অপর তিন ভাইএর ন্যায় কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখানে উদ্ধৃত প্রথম চিঠিটিতে যে সমুদ্রের চরে যাওয়ার কথা আছে, তাতে মনে হয় শ্যামাচরণবাবুর কার্য উপলক্ষে সমুদ্রতীরস্থ কোন শহরে চাকরি নিয়ে যাওয়া অথবা সমুদ্রতীরে কোথাও তাঁর বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গ ছিল বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় চিঠিতে যে ঠাকুরপালার কথা আছে সেই ঠাকুর হলেন বঙ্কিমচন্দ্রদের বিখ্যাত গৃহদেবতা রাধাবল্লভ। তৃতীয় চিঠির 'ছোট ঠাকুরানী দিদি' ছিলেন যাদবচন্দ্রের ছোট কাকী। যাদবচন্দ্র এই সম্পত্তি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে দান করেছিলেন। এই জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র বাগানসহ একটি সুন্দর বৈঠকখানা ভবন তৈরি করেছিলেন। এই বৈঠকখানা ভবনেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি স্থাপিত।

পিতাকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি এই—

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্মণঃ

প্রণামা নিবেদঞ্চ বিশেষ।

মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন জন্য কয়দিন হইতে যাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সর্দি, কাশি ও জ্বরের জন্য বাদলে বাহির হইতে পারি নাই! জ্বর আর নাই।

পত্রের উত্তর দিই নাই। কেননা পত্রের উত্তর দেওয়ার কোন ফল নাই। আমি যাহাই বলি না কেন মধ্যমদাদা কিছুতেই সম্মত হইবেন না তাহা জানা আছে। মহাশয়ও দফায় দফায় তাহা দেখিয়াছেন। আমাকে কাঁটালপাড়া হইতে উঠাইয়া দেওয়া পূজার সময় হইতেই স্থির হইয়াছে। ইহা জানি সুতরাং এক্ষণে অধিক পত্রাপত্র লেখা বাহুল্য মনে করি।

পূর্ণচন্দ্রের এক্ষণে উপরে তিনটি কুঠরি। আপনার দুই ঘর তাঁহার পাইবার স্থিরতা আছে। পাঁচটি দুতলা কুঠরি কাহারও নাই—আরও একটি দুতলা কুঠরি করিবার স্থান আছে। পূর্ণচন্দ্রের একটি কন্যা, দুইটি পুত্র বই নহে—কি প্রকারে এত স্থানে পূর্ণচন্দ্রের অকুলান হইল; তাহা জানি না। আমি পুরাতন বাটীতে ৩৫০০ টাকা খরচ করিয়াছি, আর তিন চারি হাজার টাকা খরচ করিলেই দোতলা কুঠরি উঠিত।

পূর্ণচন্দ্রের অকুলান বলিয়া নূতন ওজর তোলা কেবল আমাকে তাড়াইবার ওজর মাত্র। যখন বাড়িতে আমার স্বত্ব নাই বলিয়া আমার রাজ মজুর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন পূর্ণচন্দ্রের অকুলানের কথা ওঠে নাই এবং যে মহলে মধ্যম এখন বাস করেন, যখন আমার নিকট সেই মহলের মূল্য লইবার কথা উঠিয়াছিল, তখনও এ ওজর ছিল না। আমি এখন সকল আপত্তি ত্যাগ করিতেছি, কেবল আপত্তি যে পূর্ণচন্দ্রের কাছে ঐ মহল লিখিয়া লইবার…করিতে…পূর্ণচন্দ্রের কুলাইবে না।

স্থূল কথা যে ঐ বাড়ি পূর্ণচন্দ্রও তৈয়ার করেন নাই,মধ্যমও তৈয়ার করেন নাই। বাড়ি মহাশয়ের। আপনার কথায় যদি পূর্ণচন্দ্র উহা জ্যোতিশকে লিখিয়া দেন, তবেই গোল মিটিল। মধ্যমবাবুর কোন সম্মতির আবশ্যক নাই—তিনি অসম্মত হইলেও লেখাপড়া হইতে পারে। ইহাতেও যদি সম্মতির অপেক্ষা করেন, তবে বুঝিব যে তাঁহার সম্মতি ব্যতীত আমাকে কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে দেওয়া আপনার বা পূর্ণচন্দ্রের ইচ্ছা নহে।

মনুষ্যের অবস্থা সকল দিন সমান থাকে না। আমার এখন বাড়ি করিবার ক্ষমতা আছে—ইহার পর না থাকিতে পারে। বিশেষ কখন কাহার পরমায়ুর শেষ বলা যায় না। পরিবারবর্গের আশ্রয়ের একটা ঠিকানা সকলের করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি কাঁটালপাড়ায় না হইল তবে আপনার অনুমতি পাইলেই অন্যত্র বাড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিব। এ কথার শেষ করার আবশ্যক—যাহা হয় এই পত্রের উত্তরে লিখিবেন। এবং কোন অংশে আমার দোষ ত্রুটি থাকে তাহাও দেখাইয়া দিবেন। আমার ত্রুটি এই যে, মধ্যমের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমি কাঁটালপাড়ার বাড়ির ছয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছি। সে টাকা থাকিলে আর একটা নূতন বাড়ি তৈয়ারি হইত। ইতি—

পুঃ—চুঁচুড়ায় গরু রাখিতে বিস্তর খরচ। বিচালি মহার্ঘ—সেবার লোক নাই। কেহ গোশালে রাখে ভালই নচেৎ বিলাইয়া দিতে হইবে। যখন জিনিষপত্র সকল উঠাইয়া লইয়া আসিব, তখন গরু বিলাইয়া দিয়া আসিব।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র, যাদবচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র, এঁদের তিনজনের উদ্ধৃত চিঠিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র তথা যাদবচন্দ্রের উপরও অনেকটা ক্ষোভ ও অভিমানবশতই চুঁচুড়ায় চলে গিয়েছিলেন। এখন একটা কথা—সাধারণত

অভিমান ও বিরোধের মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। যেমন—একজনের উপর একজনের অভিমান থাকলে অভিমানী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন না কোন কাজ করে দিতেও পারে, কিন্তু ঘোরতর বিরোধ হলে পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্কই থাকে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় গিয়েও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার পূর্ববৎ তত্ত্বাবধান করছেন যখন দেখা যায়, তখন অভিমানই ছিল বলে মনে হয়। তা না হয়ে যদি ঘোরতর ভ্রাতৃবিরোধ হ'ত, তাহলে তিনি কখনই ঐ সময় চুঁচুড়ায় গিয়ে পূর্ববৎ বঙ্গদর্শনের তত্ত্বাবধান করতে পারতেন না।

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় পিতা এবং মেজদার উপর এইরূপ ক্ষোভ ও অভিমান করলেও, কিছুদিন পরেই তাঁর সে ক্ষোভ ও অভিমান চলে যায় এবং তিনি আবার কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ফিরে আসেন।

এবার আমার তৃতীয় প্রশ্ন—বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ সময়ে কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় চলে গিয়েছিলেন?

শচীশবাবু বলেছেন—১২৮৩ সালের প্রথমে। ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবু বলেছেন—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১২৮৩ সালের পৌষ মাঘ মাস নাগাদ।

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন ১২৮৩ সালের কয়েক বছর পরে। কেননা—কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থে দেখা যায়, বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার কয়েক মাস পরে নবীনচন্দ্র একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতেই তাঁর নিকট বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশের কথা উত্থাপন করেছিলেন। ঐদিন অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয়েছিল যে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রকাশিত হবে। বঙ্গদর্শন এক বছর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে কৃষ্ণকান্তের উইলের বাকি অংশ তাতে প্রকাশিত হয়। এর পর কৃষ্ণকান্তের উইল পুস্তকাকারে বার হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট অর্থাৎ ১২৮৫ সালের শ্রাবণে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় পর্যন্তও যে কাঁটাল-পাড়ায় বাস করেছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা লেখা

এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—'বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।···নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছর খানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধানো একখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আমাকে দিলেন। বলিলেন—রেলগাড়িতে এইখানি পড়িও। ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম, তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন।'—নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় বার হয় ১২৮৪ সালের বৈশাখে। এর পর এক বৎসর ধরলে দাঁড়ায় ১২৮৫ সালের বৈশাখ। কিন্তু শাস্ত্রী মশায়ের 'প্রায় বছর খানেক'টা হবে প্রায় বছর দুই। তিনি বহুদিন পরে এ কথা লিখতে গিয়ে সময়ের এই তফাৎটা করেছেন। কেননা, সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ-চন্দ্র তাঁর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ডায়রিতেও লিখেছেন—'তৃতীয় পিতৃব্য (বঙ্কিমচন্দ্র) চুঁচুড়ায় বাস করিতে থাকেন।···বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠের (১২৮৬) কোন শুভদিনে তিনি কাঁটালপাড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।'

অতএব বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় গিয়ে ছিলেন ১২৮৩র প্রথমে বা শেষে নয়। ১২৮৬র প্রথমে।

এখন এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি দুটির এবং অপর চিঠিগুলিরও ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে জানা গেল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে আমি এবং মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র, আমরা দুই ভাইয়ে দুটি কাজ করলাম—আমি জন্মস্থান কাঁটালপাড়া ত্যাগ করলাম, আর মেজদা তাঁর চাকরিটি ছেড়ে দিলেন। পিতা বর্তমান থাকতে আমরা কেউই এই কাজ করতে সাহসী হই নি।

পিতার মৃত্যুর পর সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর যে চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই চাকরিটি ছিল স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি। এর আগে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে একদিন এক সভায় ইংরাজ জজ সাহেবের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে তিনি সেই চাকরিটি খুইয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'সঞ্জীবচন্দ্র খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়। সঞ্জীববাবু তখন প্রবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স এক্ট' পাস হইল। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে। টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে। সঙ্কল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন—'আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, ডটার-ইন-ল'জ লেন বলিতে হইবে।' জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, '৭৫ টাকায় হইবে না, আমি প্রস্তাব করি আরও ৫০০ টাকা দেওয়া দরকার।' জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন? কেন?' সঞ্জীববাবু বলিলেন—'আদালতের সম্পর্কে যত লোক

আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেণ্ড বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন— 'সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।' সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল জজ সাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।'

শাস্ত্রী মশায়ের এই লেখাটায় দু একটা ভুল আছে। যেমন—তিনি বলেছেন—'কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) পাকা হইতে পারেন।' এখানে 'কয়েকটি' হবে না, হবে 'আর একটি'। কারণ, এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন—ডেপুটিগিরিতে তখন দুটি পরীক্ষা দিতে হ'ত। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মার্ক তাঁর হয়েছিল, কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করে ইচ্ছাপূর্বক তাঁর অনিষ্ট করেছিল।

শাস্ত্রী মশায়ের অপর ভুল—১৮৮৪ সালের পর সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি যাওয়ার কথা বলায়।

সঞ্জীবচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি ছেড়ে দেন। এই চাকরি তিনি করেছিলেন প্রায় ১১ বছর। তার আগে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অতএব ১৮৮৪ সালে ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর কোন সভায় রসিকতা করতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে ছিলেন, এটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জেনেছি, ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট পাস হয়েছিল, ১৮৬৮তে। তাহলেই

ঘটনাটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। কারণ, সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি যায় ১৮৭০ এর প্রথম দিক নাগাদ।

যাই হোক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি চলে গেলে, তখন এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেও তিনি সে চাকরি আর পান নি। তবে গবর্নমেণ্ট তাঁর বেতন ঠিক রেখে তাঁকে একটি স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সঞ্জীবচন্দ্র যখন বর্ধমানের স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার তখন গবর্নমেণ্ট তাঁকে আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সমান মাইনে না দিয়ে, মাইনে কমিয়ে দেয় এবং বর্ধমান থেকে যশোহরে বদলি করে দেয়।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে লিখে গেছেন—'বর্ধমানের স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রারের বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহরে যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পর বার্টন নামক একজন নরাধম ইংরাজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর সেই ম্যাজিস্ট্রেট, সেই রেজিস্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন। তাহাই তাঁহার কার্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন।'

সেকালে ইংরাজ জেলা শাসকদের প্রত্যেককেই বাংলা শিখতে হ'ত, তাছাড়া অনেক ইংরাজ বাংলাও জানতেন। তাই বার্টন সম্বন্ধে ঐরূপ লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বেশ সাহসেরই পরিচয়।

সঞ্জীবচন্দ্র এই বার্টন সাহেবের অত্যাচারের জন্যই মূলত চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করতে লাগলেন। এর আগেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। তখন সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এবং পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র এঁরাই প্রধানত বঙ্গদর্শনের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। আর সঞ্জীবচন্দ্র কর্মস্থলে বসে এবং ছুটিতে বাড়িতে এসে নিজে বঙ্গদর্শন দেখতেন। চাকরি ছেড়ে এখন নিজেই কাগজ দেখাশুনা করতে লাগলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় বাড়িতে থেকে তাঁদের পৈত্রিক আমলের দোলদুর্গোৎসব প্রভৃতি বাড়িতে যে বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা ছিল, সে সবেরও তদারক করতেন। এসব কাজের অবশ্য ব্যয় বহন করতেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং কিছুটা

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ ঐ সময় মূল বসত বাড়িতে না থেকে নিকটেই পিতৃদত্ত পৃথক জমিতে বাড়ি করে আলাদা বসবাস করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দুর্গোৎসব ছিল খুব জাঁকালো। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার আমলে বাড়ির দুর্গোৎসব দেখে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং এই আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধের ভাবে ভাবিত হয়ে কিছুদিন পরে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসেই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটিও রচনা করেছিলেন।

কাঁটালপাড়ার বাড়ির এই দুর্গোৎসব নিয়েই সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি পাওয়া গেছে। এই চিঠিগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাগ, মান, অভিমান, উপদেশ, ত্রুটি স্বীকার প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অনেক সংবাদ রয়েছে। এই চিঠিগুলির সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটি চিঠি এখানে দেওয়া গেল—

শ্রীচরণেষু,

পূর্ণচন্দ্রের পত্রে জানিলাম, আপনি কাঠামো করিয়াছেন। আমি যেখানে আছি সেখান হইতে তিন দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর যায়। তিন দিন বিলম্বে কিছু আসিয়া যাইত না। বিশেষ এবার দুই মাস আগে কাঠামো হইয়াছে। যথেষ্ট সময় ছিল। আর কোন কোন বার আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কাঠামো করিয়াছিলেন বটে, আমিও আপনাকে অপ্রতিভ করিব না বলিয়া টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু এবারও সেইরূপ করা আমার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই। যে যেরূপ মনুষ্য ও যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। *** না করিয়া কেহ যদি আমার নাকে দড়ি দিয়া কাজ করাইতে চায়, তবে অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমি যে বিরক্ত হইব বলা বাহুল্য। আপনিও এটুকু বুঝেন তাহা জানি, এই জন্য বুঝাইলাম।

যাই হোক, রাগের বশীভূত হইয়া জানি কোন কার্য করা উচিত নহে। যদি কলিকাতায় পূজা করিতে পারিতাম তাহা হইলে কাঁটালপাড়ার পূজার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিতাম না। যখন তাহা হইয়া উঠিল না, তখন কাঁটাল-পাড়ার পূজায় খরচপত্র কিছু না দেওয়া বা ঐ পূজা বন্ধ করা রাগ বা কার্পণ্যের পরিচয় দিবে। অতএব আমি কাঁটালপাড়ার পূজায় ২৫০ টাকা দিব।

পূর্ণচন্দ্র বোধ করি দেড়শো টাকা দিবেন। চারিশত টাকায় পূজা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

আর বৎসরও ঐরূপ বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু আপনি ৪০০ টাকায় পূজা করিতে পারেন নাই। আমি পূজার পর দিয়াছিলাম। এবার দিব না। আমরা যাহা স্বীকার করিলাম তাহাতে যদি না কুলাইতে পারেন, পূজা করিবেন না। কলিকাতায় পূজা করিলে সেখানে আমি ২৫০-৩০০ টাকায় কর্ম সমাধা করিতে পারিতাম।

যাহা অভিপ্রায় স্থির হয়, উত্তর পাইলে কিছু টাকা পাঠাইব।

আমাদিগের ভাই রাখালের নামে বোধ করি শীঘ্র দেনাভিক্রীর জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। আমি সন্ধান পাইয়া তাহাকে সম্বাদ দিলাম। ধৃত হইলে চাকরি থাকিবে না। আমি তাহার অনেক দেনা দিয়াছি। আর দেওয়া উচিত বিবেচনা করি না। বিশেষ বার রকমের খরচে দেনা করিয়াছে। বোধ করি সে বাটীঘর বিক্রয় জন্য কাঁটালপাড়ায় ***

যদি আমাদের পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে বলিবেন, কলিকাতায় রাখালের নিকট তাঁহার জন্য দুইশত টাকা মজুত আছে। গেলেই পাইবেন। অথবা অপেক্ষা করিলে উমাচরণ লইয়া আসিবে। তাঁহাকেও পত্র লিখিলাম। ইতি—তাং ৫ ভাদ্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ লিং। এই পত্র লেখার পর যতীশের পত্রে তাহার চাকরি হওয়ার সংবাদ পাইলাম। ইহাতে আমার কি পর্যন্ত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে এই বড় কষ্ট ছিল, যে যতীশের আমিই প্রধান অনিষ্টকারী—আমি তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইয়া তাহাকে অকর্মা করিয়া তুলিয়াছিলাম।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন তিনি মেদিনীপুর থেকে এই চিঠিটি সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখেছিলেন। এই চিঠির 'আমাদিগের ভাই রাখাল' হলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের কাকা নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র রাখাল চট্টোপাধ্যায়।

চিঠির শুধু 'রাখাল' হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যার মধ্যে

জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালকে তিনি নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। রাখাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় এই জামাতাকে সম্পাদক করে 'প্রচার' মাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশ বা যতীশ বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থেই প্রতিপালিত হতেন। ১৮৮৭-র আগষ্ট মাসে যখন নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে জ্যোতিশচন্দ্র পুলিস ইন্‌সপেকটরের চাকরি পান, তখন তিনি তিনটি সন্তানের জনক। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশের সংসারের সমস্ত ব্যয়ই বহন করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন জ্যোতিশের সংসার চালাতেন তেমনি এই চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, তিনি খুড়তুতো ভাই রাখালেরও বহু দেনা শোধ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কলকাতায় দুর্গোৎসবের কথা বলেছিলেন, তার কারণ তিনি তখন কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন।

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করবার জন্য ম্যানেজার। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁর 'কার্যকারক'।

চিঠিতে যে কাঠামোর কথা আছে, সে হ'ল বাড়িতে প্রতিমা তৈরির প্রাথমিক কাজ।

শ্রীচরণেষু,

গত রাত্রে রাখাল ও শরৎকুমারী বালক-বালিকাগণ সহিত এখানে পৌঁছিয়াছে। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম উমাচরণের গাফিলতিতে পঞ্চমীর দিনে আপনার নিকট টাকা পৌঁছে নাই। উমাচরণকে আমি পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলাম যে, পঞ্চমীর দিন বাড়ি যাইবার সময়ে আপনার জন্য টাকা লইয়া যাইবে। উমাচরণ তাহা লইয়া যায় নাই। আমাদিগের কাহারও কোন ত্রুটি নাই।

যতীশের এক্ষণে কর্ম্ম হইয়াছে। ভরসা করি যতীশ সংসারের ভার লইতে পারিবে। চাকরিও উত্তম চাকরি।···বিষয়ে তাহাকে বিহিত উপদেশ দিয়াছি। আমি আগামী মাস হইতে আর টাকা পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করিব না। ইতি—তাং ১৪ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিশচন্দ্র মেহেরপুরে পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরি পেয়ে কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে চাকরি করা সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই চিঠিতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ি গিয়েছিলে। এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে। আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। ঐ সাতটি গোল্ডেন রুল বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। ইহার অনুবর্তী হইলে সর্বত্র মঙ্গল ঘটিবে।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি—তাং ১৩ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ উপদেশ

১। প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

২। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

৩। উপরওয়ালাদিগের আজ্ঞাকারিতা। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

৪। আপনার কাজের রুলস এণ্ড লজ বিশেষরূপে অবগত হইবে।

৫। কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তাহা না হইলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

৬। সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

৭। নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই যে উপদেশ দিয়েছিলেন, এই উপদেশ আজও যে কোন পুলিশ কর্মচারীর প্রতি সামনে প্রযোজ্য।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখেন—

শ্রীচরণেষু,

আপনি এক্ষণে কেমন আছেন জানাইবেন। জ্বর সারে নাই কি? জ্বর··· জ্বর। তাহা হইলে সুবিধামত দিন কতক কলিকাতায় আসিয়া থাকিলে সারিয়া যাইতে পারে। আমার বাড়ি খালি পড়িয়া আছে।

টাকার কথাটা পুনঃ পুনঃ আমি লেখার কারণ এই যে আমার লোকজনের কাজ অন্যায় হইয়াছিল। কিরূপ কাজ অন্যায় হইল তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছি। কাজ অন্যায় না হইলে আপনি বেশী লিখিলেও আমি উত্তর দিতাম না।

যতীশের পত্র পাইয়াছি। যতীশ এক্ষণে সংসারের ভার লইতে সম্মত নহে। খরচ কুলায় না। ফর্দ দিয়াছে।···যতীশের যেরূপ প্রকৃতি তাহার কিছু সংশোধন আবশ্যক। ছেলেকে কেবল হাত ধরিয়া হাঁটাইলে সে কখন হাঁটিতে শিখে না। যতীশের সেলফ্-রিলায়েন্স শিক্ষার জন্য এক্ষণে আমার সাহায্য পরিত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক। ছেলে যেমন হাত ছাড়িয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলে দুই একটা আছাড় খায়, তেমনি যতীশের আপাততঃ কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেলফ্-রিলায়েন্স ও পারি·· জন্য তাহা বাঞ্ছনীয়। আপনার নিজের কষ্ট হইলে এখানে আসিতে পারেন।

এ বৎসর আমার প্রস্রাবের পীড়া বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ইহার মহৌষধ পাইয়াছি।···পীড়া এক্ষণে স্থগিত···পারমানেণ্ট··বোধ হয়। আমাকে দু-এক বৎসর মেদিনীপুরে থাকিতে হইবে। এরূপ টান জায়গা ভিন্ন সে ঔষধ আমার সহ্য হইবে না। আপাততঃ দুই এক বৎসর এইখানে থাকাই স্থির করিয়াছি। ইতি—তাং ৭ অক্টোবর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় মেডিকেল কলেজের সামনে ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে বাড়ি করেছিলেন। এই বাড়িতেই এসে থাকবার জন্য তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮৮৭-র মে থেকে ১৮৮৮-র এপ্রিল পর্যন্ত।

১৮৮৭-র ৯ই মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ট্রেনে ৪ মাসের রিটার্ন টিকিট করে দুই অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরেই প্রথমে শ্যামাচরণ, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেও, সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে থেকে যান।

বঙ্কিমচন্দ্র এলাহাবাদে সঞ্জীবচন্দ্রের খরচের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠালেও সঞ্জীবচন্দ্রের নিষেধ থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে কাকেও সঞ্জীবচন্দ্রের এলাহাবাদের ঠিকানা বলেন নি।

এদিকে শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন, অথচ সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ি ফিরলেন না দেখে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জ্যোতিশচন্দ্র কোন রকমে পিতার এলাহাবাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে ছোটকাকা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদে যান।

সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে বসে প্রধানত নিজের সংসারের অভাব অনটনের কারণেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চুল দাড়িও রেখেছিলেন। কিন্তু পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়ে ১৮ই জুলাই তারিখে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রকে এলাহাবাদে এবং তিনি বাড়ি ফিরে এলে তখন আবার তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি দুটিও কিছু কিছু ছিন্ন হলেও এখানে উদ্ধৃত করছি—

শ্রীচরণেষু,

আজ প্রাতে আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছি। তার পর কলিকাতার ডাক আসিল। সেই ডাকে আমার পরিবারের এক পত্র পাইলাম। সেই পত্রে আছে যে, যতীশ ও বিপিন আপনাকে আনিতে গিয়াছে। আনিতে এলাহাবাদ গিয়াছে কি কোথায় গিয়াছে, তাহা লেখা নাই। অতএব তাহাদের জন্য চিন্তিত হইলাম। কেননা তাহাদিগকে আমি ঠিকানা বলি নাই বা কাহাকেও বলি নাই। যদি তাহারা ঠিকানা সঠিক না জানিয়া আন্দাজে গিয়া থাকে, তবে কষ্ট পাইবে।···

আমার এমনও বিশ্বাস আছে যে উমাচরণ প্রভৃতি আপনার ঠিকানা এলাহাবাদ তাহা···যে কেরানী···বঙ্গদর্শন লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি··· কথা প্রকাশ করিয়া গি···। যাই হোক তাহারা পৌছিয়াছে কিনা লিখিবেন। নচেৎ আমি উদ্বিগ্ন থাকিব। না পৌছিয়া···টেলিগ্রাফ করিবেন। আপনার আসা হয় কিনা তাহাও লিখিবেন। ইতি—তাং

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

···আপনি বাড়ি আসিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিবেন তাহা জানিতাম। কেন না আমি দেখিয়াছি;··আপনার মনের রাগ ভিন্ন বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই। রাগ পড়িয়া যায়। বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার ত্যাগ হইতে পারে না। এজন্য আমি যতীশের মাতাকে বলিয়াছিলাম যে, চারিমাস অপেক্ষা কর, কেননা টিকিটের মিয়াদ চার মাস। চারিমাসে না আসেন তখন ব্যস্ত হইও। যাহা হউক, আসিয়া ভালই···

অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। ইহাই প্রমাণ যে বৈরাগ্যের অনেক দেরি। মমতা পরিত্যাগই বৈরাগ্য। যাহা হউক আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। এখন আমার বোধ হইতেছে যে আমাকে আপনার ঠিকানা বলিয়া দিতে নিষেধ না করিলে ভাল হইত, কেননা, আমি ঠিকানা বলিতে অস্বীকৃত হইয়া অনেকের কাছে শত্রু হইয়াছি। অন্ততঃ বড়বাবু ঐরূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন।

চিরণ·· প্রভৃতির অবস্থা তাহাও আমারই দোষ বলিতে হইবে। কেননা, আমি মাসে ত্রিশ টাকা মাত্র দিয়াছি। কিন্তু আমারও দোষ বড় নাই। কেননা আমি আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছি।······

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠির চিরণ হলেন জ্যোতিশচন্দ্রের পুত্র চিরঞ্জীব।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। এখানে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এমন একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি যাতে সঞ্জীবচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিটি এই—

শ্রীচরণেষু

জ্যোতিশের নিজ পরিবার···প্রতিপালন কিন্তু আপনার ভার তাহার উপর আমার দিবার ইচ্ছা নাই। তাহা পূর্বে পত্রে লিখিয়াছিলাম। এবং এক্ষণে সবিস্তার বিবেচনা করিয়া লিখিতেছি-—

স্বর্গীয় কর্তা মহাশয় জীবিত থাকিতে তাঁহার (১) আহার (২) পরিধেয় (৩) চিকিৎসা—এই তিন প্রকারের ব্যয় আমরা নির্বাহ করিতাম। আপনার সম্বন্ধেও আমি তাহাই করিতে চাহি। অতএব ইহার বন্দোবস্ত আমি নিম্নলিখিতভাবে করিলাম—

(১) নিত্য প্রয়োজনীয় ঘৃত, ময়দা কিনিয়া দিয়া আসিবে। দেড় সের দুধ বরাদ্দ থাকিতে পারে, তাহার মূল্য মাস মাস আমি দিব।

(২) বস্ত্র···তা এবং শয্যা গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি যখন যাহা নিজের জন্য প্রয়োজনীয় হইবে, উমাচরণকে বা আমাকে জানাইলে পাঠাইয়া দিব।

(৩) আপনার নিজ চিকিৎসার বিল ডাক্তারকে আমার কাছে পাঠাইতে বলিয়া দিলাম।

৺কর্তার প্রতি যাহা করিতাম আপনার প্রতি তাহা করিতে চাহিতেছি। ইহাতে আপনার অনভিমত হইবে না বিবেচনা করি।

···দ্বারা লেপের খোল পাঠাইয়া দিয়াছি, পৌছন সংবাদ দিবেন। ১৩ পৌষ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবার অন্যান্য কয়েকটা চিঠি—

শ্রীচরণেষু,

পূজার প্রয়োজনীয় সামগ্রীপত্র যাহা চাই তাহার ফর্দ করিয়া আনিবার জন্য আমি উমাচরণকে আপনার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম। আপনি তাহা দেন নাই। এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অন্যান্য বৎসর আপনাকে আগাম টাকা দেওয়া হইত এ বৎসর কেন দেওয়া হইল না, জানিতে চাহিয়াছেন।

যদিই কোন কারণে পূজার টাকা আগাম দিতে অনিচ্ছুক হই এবং পূজায় খরচ স্বহস্তে করিতে ইচ্ছুক হই, তজ্জন্য পূজার ফর্দ আটক করা আপনার অকর্তব্য। কেন না তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্বক দুর্গোৎসবের বিঘ্ন উপস্থিত করা হয়। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের আপনিই প্র * * * থাকেন। * * * ইহাই কি ভাল দেখাইবে?

পূর্বে প্রতি বৎসর আগাম টাকা দিয়া থাকি, আর এ বৎসর টাকা দিই নাই কেন, তাহা যদি আপনি অভিমানের বশীভূত না হইয়া একটু বুঝিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতেন। বুঝাইলেও বুঝিবেন কি না জানিনা, তথাপি অনর্থক মনঃপীড়া না পান, এ জন্য বুঝাইব।

অন্যান্য বৎসর আপনাকে আগাম টাকা পাঠাইয়া ইচ্ছা থাকিলেও স্বহস্তে ব্যয় করিবার উপায় ছিল না। গত বৎসর মেদিনীপুরে ছিলাম, তার পূর্ব বৎসর হাওড়াতে আটক ছিলাম। দুই-এক ঘণ্টার জন্য মাত্র কলিকাতায় আসিতে পাইতাম। একবারও কাঁটালপাড়ায় যাইতে পাই নাই।

তার পূর্ব বৎসর ঝিনাইদহে ছিলাম। এরূপ অবস্থায় আপনাকে টাকা

না পাঠাইয়া * * *। কেন না আপনার দ্বারাই সুচারুরূপে কর্ম নির্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ইহার পূর্বে কয় বৎসর যে পূজা হইয়াছিল তাহা আমার নিতান্ত অনভিপ্রায়ে, অতএব তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি নাই।

এ বৎসর আমি দেশে আছি। পূজা আমার ইচ্ছা মতই হইয়াছে। আপনি পীড়িত, অতএব যতদূর পারি—নিজের তত্ত্বাবধানে পূজার উদ্যোগ সম্পন্ন করাইব। এরূপ ইচ্ছা করা কি এতই অসঙ্গত ব্যাপার?

অসঙ্গত ব্যাপার হইলেও তাহা কয়েকটি কারণে আমার অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। তাহাও আপনাকে বুঝাইতেছি।

(১) আপনার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও অপটু হইয়াছে। এবার আপনার দ্বারা সমস্ত ব্যাপার সুনির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। আপনি ইচ্ছাপূর্বক সকল ভার লইলেও চলে না; কেন না শরীরের বেগতিকে সকল দিক সুনির্বাহ না হইতে পারে, পরের হাতে কাজ যাইতে পারে এবং ঝঞ্ঝাটের জন্য পীড়াও বৃদ্ধি হইতে পারে। * * *

(২) শরীর চলিলেও অন্য আপত্তি আছে। আপনার মানসিক অবস্থা সেরূপ নহে যে আপনি কোন বৃহৎ কার্য সুনির্বাহ করেন। আপনার এক্ষণে কিছুই স্মরণ থাকে না। আজ যাহা করিলেন বা বলিলেন কাল তাহা মনে থাকে না। ইহা আপনি দেখিতে না পান, আমরা দেখিতে পাই। এ অবস্থায় কি আপনার উপর সমস্ত ভার দেওয়া উচিত?

(৩) কেবল স্মৃতি বিভ্রম ঘটিয়াছে এমন নহে, আপনার বিশেষ বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। যেরূপ কাজ কর্তব্য নহে আপনাকে তাহা করিতে দেখিয়া থাকি। আমি স্বচক্ষে এরূপ দেখিয়াছি। পরের মুখে শুনিয়া বলিতেছি না। মাথার পীড়ার জন্য এরূপ করেন, এমন হইতে পারে। ইহার উপর বেশী ভার পড়িলে মাথার পীড়া বাড়িতে পারে। * * *

(৪) শারীরিক পীড়া, মাথার পীড়া এবং মানসিক কষ্টে আপনার মেজাজ বড় খারাপ হইয়াছে, পূজার ঝঞ্ঝাট আপনার ঘাড়ে পড়িলে আরও খারাপ হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে লোকজনের কষ্ট, কাজকর্মের ব্যাঘাত, এবং আপনার মাথার ইরিটেশন বাড়িয়া পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

(৫) আপনি পরিমিত ব্যয় করিতে পারেন না। অতিরিক্ত ব্যয় করেন, ইহা কেবল আমি নিজে চক্ষে দেখিয়াছি, এমন নহে, আপনি নিজেও স্বীকার

করিয়াছেন। গত বৎসরের পূর্ব বৎসরে পূজায় ৫২৫ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেই টাকা দিবার সময়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে,···লোক খাওয়ান হয় না, অথচ এত টাকা কিসে খরচ হয়, তাহাতে আপনি বলিয়াছিলেন যে, আমার দ্বারা কাজ হইলে কিছু বেশী খরচ হইবে। আমি পরিমিত করিয়া করিতে পারি না। * * * নিজে দ্রব্যাদি···বাঁচাইতে পারি কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। এ জন্য এ-ভার আমি নিজে লইব ইচ্ছা করিয়াছি। নিজের টাকা অপরিমিত ব্যয়ে নষ্ট না হয়, ইহা বোধ হয়, আপনি ভিন্ন আর সকল মনুষ্যেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে।

(৬) আমি গত বৎসর আড়াইশ টাকা দিয়া ছিলাম মাত্র। তৎপূর্ব পূর্ব বৎসর ৩৫০।৩২৫ টাকা হিসাবে দিয়াছি। তদ্ভিন্ন পূর্ণচন্দ্র দিয়াছেন। তথাপি আপনি বলিয়া থাকেন, আমার সাক্ষাতেই বলিয়াছেন যে আমি ২৫০ টাকা মাত্র দিই এবং আপনার গুণাগারি লাগিয়া থাকে। আপনার গুণাগারি লাগে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ বৎসর আপনার গুণাগারি দিবার সাধ্য নাই এবং আমার বেশী টাকা দিবার ইচ্ছা নাই। এবং এ রকম কথার ভিতর থাকিতেও ইচ্ছা নাই। অতএব ব্যয়ের ভার নিজে লইব স্থির করিয়াছি।

(৭) আর আসল কথা এই যে, এবার আমার নগদ টাকা নাই। আগষ্ট মাসের বেতন সেপ্টেম্বর মাসে যাহা পাইয়াছি, তাহা সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। এক পয়সা বাঁচে নাই বরং অকুলান পড়িয়াছে। আর অক্টোবর মাসে যে বেতন, তাহা সমস্তই পূর্বাহ্নে খরচ বিলি হইয়া আছে। দুই-একশত টাকা পূজার জন্য রাখিতে পারিব কিনা সন্দেহ। এত টাকা কিসে খরচ হইল তাহা স্বতন্ত্র কথা, যখন জানিতে চাহিবেন তখন বলিব। কিন্তু অক্টোবর মাস হইলে একপয়সাও নগদ দিতে পারিব না বলিয়াই যতীশ যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন যতীশকে বলিয়াছিলাম যে, এক্ষণে প্রতিমা প্রস্তুত করিতে বলিও তদ্ভিন্ন আর কিছুর জন্য এখন টাকাকড়ির প্রয়োজন আছে কি? অমাবস্যার সময়ে আর সকল সংগ্রহ করিয়া দিলে চলিবে, জিজ্ঞাসা করিও। যতীশ বলিয়াছিল যে, এখন প্রতিমা ভিন্ন আর * * * অমাবস্যার সময়ে করিলেই চলিবে। আমি সেই পরামর্শ মতে কাজ করিয়াছি। তাহাতে এত বেশী কথা কেন হইল বুঝিতে পারি না।

পূর্ণচন্দ্র অক্টোবর মাসে একশ টাকা দিবেন বলিয়াছেন। আর একশ কি দেড়শ যাহা অক্টোবর মাসে বেতন হইতে ঋণ লইতে পারি তাহা হইতে

সকলকে কিছু কিছু নগদ দিয়া, অবশিষ্ট ধার রাখিয়া দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিব। তাহা ভিন্ন এবার পূজা হইতে পারিবে না। আমি কলিকাতাতেও ধার পাইব নৈহাটিতে পাইব। আপনার ধার পাইবার তত সুবিধা নাই। ঐরূপ দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিব বলিয়া আপনার নিকট ফর্দ আনিতে পাঠাইয়াছিলাম। আপনার বুদ্ধির এখনকার ধর্মই এই যে বিপরীত ভাবেন। তাই ফর্দ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

এক্ষণে যদি ফর্দ পাঠান মত হয় তবে এই লোক মারফৎ পাঠাইবেন। না মত হয়, তবে···যে ফর্দ···তাহা পাঠাইবেন। ইতি—তাং ৮ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যে রাগের কথা আছে তাহার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না।

উমাচরণ বলিয়াছিল, পূজা আপনার। বস্তুতঃ পূজা আপনারও নহে বা আর কাহারও নহে। পূজা ৺পিতাঠাকুরের। আমরা কেহ অর্থের দ্বারা কেহ শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা, যাহার যেরূপ সাধ্য তাই নির্বাহ করিয়া থাকি আপনি এবার শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম তথাপি আপনার যতদূর সাধ্য আপনি তাহা করিবেন, আমার তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই এবং দিব না।

যতীশ আমাকে বলিয়াছিল যে, এক্ষণে কোন খরচপত্রের প্রয়োজন নাই—অমাবস্যার পর সকল উদ্যোগ করিলেই হইবে। আমিও সেইজন্য সে বিষয়ে মনোযোগী হই নাই। এক্ষণে জানিলাম যে, কিছু কিছু খরচের এক্ষণে প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার নির্বাহ জন্য একুশ টাকা বিপিনের মারফৎ পাঠাইলাম। প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করিবেন। টাকা এক্ষণে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। চাল, ডাল, ছোলা, মটর ধারে কিনিয়া ঝাড়াই বাছাই করিয়া রাখাইবেন। খরচের খাতা ফেরৎ পাঠাইলাম।

ইতি—তাং ১১ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ, রাজকুমার পাল কলিকাতায় আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, আমার

দস্তখতি চিঠি ভিন্ন সে কোন দ্রব্যসামগ্রী দিবে না। এ জন্য আমার দস্তখতি চিঠি পাঠাইলাম, জিনিসপত্র আনাইবেন।

শ্রীচরণেষু,

হালিশহরে আমাদের জন্য কিছু কাসুন্দি করিয়া পাঠাইতে বলিয়াছি। সেখানে গাছে আম আছে। কিন্তু তেঁতুল নেই। যদি আমার তেঁতুল পাড়ানো থাকে তবে আন্দাজ আধ মণ তেঁতুল মুরলীর মারফৎ হালিশহরে পাঠাইয়া দিবেন।

আমি যে আর এক বৎসরের ছুটি চাহিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে ইচ্ছুক নহেন। আমাকে লিখিয়াছেন—যদি ছুটি না লও তবে আপাততঃ আলিপুরে দিতে পারি। আমি অগত্যা স্বীকার করিয়াছি। অতএব বোধ করি আমাকে শীঘ্র রি-জয়েন করিতে হইবে।

কৈলাসকে বলিবেন, আমি কবে কাঁটালপাড়া যাইব, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। বোধ করি গোষ্ঠযাত্রার পর। ইতি—তাং সোমবার।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হালিশহরে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি। তিনি তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বার আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। এখান থেকেই তিনি ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

চিঠির কৈলাস হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্নে কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র একমাত্র কন্যা নন্দরাণী ও জামাতাকে নিজের বসতবাটীর নিকটেই জায়গা দিয়ে বাড়ি করে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের—একটা উৎসব হল গোষ্ঠযাত্রা। আগের ন্যায় এখনও প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে এই উৎসব হয়ে থাকে।

মুরলী বঙ্কিমচন্দ্রের ভৃত্য।

এখানে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই পারিবারিক পত্রগুলি থেকে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ১২৭২ সালে নিজের বিষয় সম্পত্তি উইল করে যখন পুত্রদের পৃথক অন্ন করে দেন, তখন তিনি তাঁর দেনা ও পাওনা দুই-ই চার পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁর পাওনা ছিল ১০৮৯ টাকা, কিন্তু তাঁর দেনা ছিল ৮৪৪৮ টাকা।

জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ এবং তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরা পিতার উইল অনুযায়ী বসতবাটীর অংশ না পেলেও নিজ নিজ অংশের পিতৃঋণের টাকা শোধ করেছিলেন। দ্বিতীয় সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর অভাববশত, এবং কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র তাঁর উপার্জনহীনতা হেতু, পরে আবার অল্প আয়বশত তাঁদের দেয় ঐ ঋণের টাকা শোধ করতে পারেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বাড়ির অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের একটা অংশে বাস করতেন। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের দেয় ঐ ঋণের টাকা শোধ করেছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের দেয় ঋণের টাকা শোধ হয় না দেখে যাদবচন্দ্র মূল উইল করার ৯ বছর পরে ১২৮১ সালে পূর্ণচন্দ্রকে একটি ক্রোড়দানপত্র লিখে দেন। তাতে তিনি বলেন, পূর্ণচন্দ্রের দেয় ২১১২ টাকা আমি আমার পেনসনের ২২৫ টাকা থেকে শোধ করব। না করলে ঐ ঋণের টাকা আমার চার পুত্র সমানভাবে দিয়ে শোধ করবে।

যাদবচন্দ্র তাঁর পেনসনের টাকা থেকে ঋণের একটি পয়সাও শোধ করতে পারেন নি। কারণ তিনি, ধর্মকর্মে ও সাংসারিক ব্যাপারে এত বেশী খরচ করতেন যে তাঁর পেনসনের টাকায় কিছুই হ'ত না। পূর্ণচন্দ্রের ঋণ থেকেই যায়। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাওনাদার নালিশ করলে, একা বঙ্কিমচন্দ্রই ঐ ঋণের টাকা শোধ করেছিলেন। ঋণ শোধের পর বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের যে অংশে বাস করতেন, সেই অংশ সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের নামে এবং বাকি অংশ পূর্ণচন্দ্রের নামে লেখানোর ব্যবস্থা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কর্মস্থলে ছিলেন বলে এ সম্পর্কে ভার দিয়েছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের উপর। সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সময়কার একটি চিঠি হ'ল এই—

শ্রীচরণেষু,

যতীশের নামে বাড়ি লেখাপড়া হইয়াছে ভালই হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের অংশটুকু যত শীঘ্র লেখাপড়া হয় ততই ভাল।

জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে একখানি পত্র পাইয়াছি। তাহা এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম। যাহা উচিৎ বিবেচনা হয়, ঐ ব্যক্তিকে উত্তর লিখিবেন। আমি উহাকে লিখিলাম যে আমি গ্রন্থকার নহি। গ্রন্থকারের নিকট আপনার পত্র পাঠাইয়া দিলাম। আর কিছু নহে। উহাকে উত্তর দেওয়া না দেওয়াও বিবেচনা করিয়া দিবেন।

এ মাসে বাড়ি মেরামতের জন্য কিছু দিতে পারিলাম না। বোধ করি ভাদ্র মাসে দিব। পূর্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কি?

এই পত্র লিখিতে লিখিতে আপনার আর এক পত্র পাইলাম, পূর্ণচন্দ্রকে বিক্রয় কোবালা না লিখিয়া দানপত্র লিখিয়া দিতে হইবে—এই মর্মে যে 'বাটির তোমার অংশ আমার পিতার দেনার জন্য বিক্রয় হওয়ায় আমি তাহা খরিদ করিয়া তোমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম।' আপনার নিজ অংশ যতীশেরই থাকিবে। এবং দানপত্রে উহা স্পষ্ট লেখা থাকিবে যে 'এই অংশ আমার নিজের রহিল।'

অদ্য কমিশনের দ্বারা আমার জবানবন্দী হইল। আসামীর সওয়ালে এমন একটা সওয়াল ছিল যে, তুমি তোমার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি তুমি চুঁচুড়ায় লইয়া গিয়া বেচিয়াছ কিনা? এইরূপ আর আর কদর্য সওয়াল ছিল। ইতি—৩০ শ্রাবণ, শুক্রবার।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিতে যে 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের কথা আছে, সেই 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা একটি বিখ্যাত বই। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করেই এই বইটি লেখা। কালনায় প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়েছে, এইরূপ এক ঘোষণার ১৪ বছর পরে একদিন এক সাধু বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে জানায়—প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। আমিই সেই প্রতাপচাঁদ।

সাধুকে দেখে অনেকেই বলে—এই-ই সেই প্রতাপচাঁদ, আবার কেউ কেউ বলে—না। এই নিয়ে তখন ঐ সাধুর সঙ্গে বর্ধমান মহারাজের পোষ্যপুত্র ও

মহারাজের সম্পত্তির অধিকারীর সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রচুর মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি হয়েছিল। প্রতাপচাঁদের অনেক হিতৈষী এই সাধুর পক্ষ নিয়ে তখন অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধু আদালতের বিচারে জাল প্রতাপচাঁদ বলে ঘোষিত হয়েছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র বহু পরিশ্রম করে সংবাদপত্রাদি থেকে জাল প্রতাপচাঁদের মামলার বিবরণ সংগ্রহ করে এই বইটি লিখেছিলেন। এমন কি তিনি কৌশলে বর্ধমান রাজবাড়ির কর্মচারীদের কাছ থেকেও তাঁর এই গ্রন্থের অনেক তথ্য জেনে নেন। কৌশলে বললাম এইজন্য যে, সঞ্জীবচন্দ্র যখন বর্ধমান রাজবাড়ির কর্মচারীদের কাছে কোন কোন কথা জানতে চান, তখন তিনি তাঁদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্র অনেকদিন বর্ধমানের স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। সেই সময় রাজবাড়ির কোন কোন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের সূত্রেই রাজবাড়ির ঐ কর্মচারীরা সঞ্জীবচন্দ্রকে বহু কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রশ্নসমূহের উত্তরগুলি লিখে পাঠাবার সময় তাঁকে বারবার লিখেছিলেন—আপনি কি বর্ধমান রাজবাড়ির কোন ইতিহাস লিখবেন? যদি তা হয়, তাহলে জানাবেন।

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় এই চিঠিগুলি আজও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে এগুলি সবই দেখেছি।

এই বইটি লিখবার জন্য সঞ্জীবচন্দ্র সত্যই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধে এই বইটি সম্বন্ধে বলেছেন—'জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনা সংস্থান, প্রমাণ-বিচার এবং লিপি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না।'

বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখেছিলেন—জ্যোতিশের নামে বাড়ি লেখাপড়া হওয়ায় ভালই হয়েছে। এর কারণ, সঞ্জীবচন্দ্রের তখন বাজারে বহু টাকা দেনা ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র বরাবরই বিলাসিতায়, দানধ্যানে ও নানা কাজেকর্মে অযথা আড়ম্বরে দেনা করেও ব্যয় করতেন। এই ঋণ করেও আড়ম্বর করার স্বভাবটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। পিতা

যাদবচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্মকর্মে ঋণ করেও জাঁকজমক করতেন।

যাদবচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র এই যে ঋণ করতেন তা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রকেই শোধ করতে হোত। তাই তিনি এঁদের এই ঋণ করে আড়ম্বর করার ব্যাপারে সর্বদাই নিষেধ করতেন। কিন্তু এঁরা সে নিষেধে বড় একটা কর্ণপাত করতেন না।

সঞ্জীবচন্দ্র নিজের এবং পিতারও ইচ্ছায় ঋণ করেই একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের যখন খুব ধুমধাম সহকারে বিয়ে দেবার উদ্যোগ করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ঋণ করতে নিষেধ করেছিলেন। চিঠিটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

১৫ নভেম্বর, ১৮৭৪

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ

প্রণামা শতসহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ—

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি বাঙ্গলায় লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতাঠাকুরকে পত্রটি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত—আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০ ষোলশত টাকা কর্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ পাওয়া আশ্চর্য নহে। আপনি না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ দিবে। কর্জ করিলে আপনার বর্ত্তমান পাঁচ হাজার টাকা ঋণের উপর ৭০০০ টাকা হইবে। ইহা পরিশোধের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ শোধ করিয়া থাকেন। কোন মাসে কুড়ি টাকা, কোন মাসে কিছুই না। অদ্য ২০ বৎসর অবধি আপনি ঋণগ্রস্ত, কখনও ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে, তাহার কি লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না! তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপনি যে ঋণ করিবেন, তাহা পরিশোধের সম্ভাবনা নাই।

যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না মনে জানিতেছেন, তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপনি যদি এখন ১৫০০ টাকা কর্জ করেন, তবে ঋণ গ্রহণ করাকে বঞ্চনা বলিতে হইবে। বরং ভিক্ষাবৃত্তি ভাল,

তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। এরূপ অধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্তব্য।

২। এই ৭ ০০ টাকা ঋণ পরিশোধ হইবে না। ইহার পরিণাম কি হইবে? মহাজন ছাড়িবে না, তাহারা নালিশ করিয়া ডিক্রি করিবে। এমন কোন সম্পত্তি আমাদের নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারিবে। সুতরাং আপনি যে পরিমাণে পরামর্শের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইল কি প্রকারে? এমন সর্বনাশ যাহাতে ঘটিবার সম্ভাবনা, সে ঋণ কেন করিবেন? ইহা জানেন যে, ডিক্রি হইলেই আপনার চাকরিটি যাইবে, এরূপ নিযম হইয়াছে।

৩। আপনি যদি এই ঋণ বৃদ্ধি করেন, তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন, বলা যায না। যতীশ সে সবেরই দায়িক। যেদিন সে প্রথম উপার্জন করিতে শিখিবে, সেইদিন হইতে এই ঋণের ভার তাহার মাথার উপর চাপিবে। আর ইহ জন্মে তাহা নামাইতে পারিবে কি না বলা যায না। আপনাদিগের অবস্থা দেখিযা ভরসা হয না যে কখনও উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে ঋণের ভার চাপে, তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যত টাকা উপার্জন করে, তাহার একটি পযসাও আপনার বলিযা বোধ করিবার অধিকার থাকে না। উদাহরণ আমাকেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ, আর আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী। পিতৃঋণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যদি আর ঋণ বৃদ্ধি করেন, তবে আপনাকে যতীশের শত্রু বিবেচনা করিব। যদি বলেন, ঋণ না করিলে পিতার এই শেষ অবস্থায় অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইবেন। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এই সকল কথা বুঝাইলে, তিনি কদাচ ঋণ করিতে বলিবেন না। তিনি পুত্রবৎসল, অবশ্য আপনার এবং যতীশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। যদি না করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে। পিতার অনুরোধে পুত্রের অনিষ্ট করিলে, আপনি ধর্মে পতিত হইবেন।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আপনাকে ঋণ করিতে দিবেন না। কিন্তু স্বয়ং ঋণ করিয়া যতীশের বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে বিশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা করিতে দিবেন না। তিনি যদি ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি যে ঋণ করিতেছেন, তাহা কে পরিশোধ করিবে? তিনি

বলিবেন যে, আমার ২২৫ টাকা পেন্সন আছে, আমি তাহা হইতে পরিশোধ করিব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মাত্র। আজি নয় বৎসর হইল আমরা পৃথক হইয়াছি। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০০ টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০ টাকা আছে। অতএব এই নয় বৎসরে ৪৪০০ টাকা মাত্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে ঋণ পরিশোধার্থে এই নয় বৎসরে ৪৪০০ টাকা দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেন্সন হইতে একটি পয়সাও কর্জ শোধ করেন নাই। অতএব ভবিষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব তিনি এক্ষণে ঋণ করিলে তাহা পরিশোধ করিবে কে? তিনি বলিবেন—পুত্রগণ। কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পরিশোধ করিতে অশক্ত। পিতৃঋণের এক পয়সাও পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। কনিষ্ঠও তদ্রূপ। তাহার যে আয়, তাহাতে কোন মতে সংসার নির্বাহ হয়, ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ এক পয়সাও দিবেন না। ইহা নিশ্চিত বাকি আমি কেবল একা দায়ে ধরা পড়ি। অতএব তিনি যদি এখন যতীশের বিবাহের জন্য ঋণ করেন, তবে আমার ঘাড়ে ফেলিবার জন্য। উহা আমার প্রতি কত বড় অত্যাচার হইবে, তাহা তাঁহাকে আপনি বুঝাইবেন।

আর একটি কথা যদিও অবক্তব্য, তথাপি এ স্থলে না বলিলে নয়। আমার উপর রাগ করিবেন না, আমার দেহের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমার শরীরে শ্বাস কাশাদির বীজ রোপিত আছে। অন্যান্য উৎকট রোগেরও লক্ষণ আছে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না। কেননা দীর্ঘ জীবন বাসনা করি না। অধিক দিন বাঁচিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয়। এবং প্রতিকারের চেষ্টায় কষ্ট পাইতে হয়। প্রায়ই কোন না কোন ব্যাধিতে আমার শরীর রোগগ্রস্ত।

অতএব কতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত আমাকে আর বাঁচিতে হইবে না। আর কেবল ঋণ পরিশোধের জন্য বাঁচিয়া কি হইবে? যদি ঋণ হইতে মুক্তি না পাই, তবে রোগের কোন চিকিৎসা হইবে না।

যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত এক পয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে বলিবেন, যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া কর্তব্য হয় (কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই), অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চারিশত টাকা পাওনা আছে, সে এখন দিবে না

সত্য বটে, কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে সে দিতে পারে। সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি ২০০ টাকা দিতে পারেন, শ্রীযুক্ত ২০০ টাকা, আমিও দুই শত টাকা দিব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিন। ঋণ করিতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুই তিন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইতে পারে।—প্রণতঃ বঙ্কিম। ৩০ কার্তিক।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃথাই এই নিষেধপত্রটি লিখেছিলেন। কারণ, তাঁর নিষেধ না শুনে যাদবচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়ে মিলে জাঁক করেই মাত্র ১৪ বছরের বালক জ্যোতিশচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতিশের বিয়ে হয়েছিল হাওড়া শহরে সালকিয়ার এক জমিদার বংশে। বিয়ের জাঁকজমক কি রকম হয়েছিল, তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বর বিয়ে করতে গিয়েছিল, সেকালের প্রথা অনুযায়ী পালকি বা জুড়ি গাড়ীতে চেপে নয়। গিয়েছিল রাজকীয়ভাবে হাতীতে চেপে।

সক্ষম সন্তানদের চেয়ে অক্ষম সন্তানদের প্রতি বাপ-মায়ের যেমন একটা স্বাভাবিক টান বা দুর্বলতা থাকে, তেমনি যাদবচন্দ্রেরও ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবচন্দ্রের উপর একটু দুর্বলতা ছিল। এই জন্যই তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সঞ্জীবচন্দ্র যখন তাঁর 'বঙ্গদর্শন' প্রেসের জন্য কলকাতায় মথুরামোহন রায়ের কাছে ১৫০০ টাকা ঋণ করেন, সেই ঋণ করার হ্যাণ্ডনোটে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে যাদবচন্দ্রও একটা সই দিয়েছিলেন। হ্যাণ্ডনোটে যাদবচন্দ্রের সই থাকার ফলে এই হয় যে, যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই পাওনাদার যখন নালিশ করেন, তখন তিনি যাদবচন্দ্রের চারি পুত্রের নামেই নালিশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন থেকে পুরো এক বছর কলকাতার এক প্রেসে এই পত্রিকা ছাপা হয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের শুরুতে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা করেন। তখন থেকে এই প্রেসেই বঙ্গদর্শন পত্রিকা ছাপা হতে থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকা ছাপান বাবদ টাকা অন্যকে না দিয়ে নিজের দাদাকেই দিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র পরে এই বঙ্গদর্শন প্রেসকে আরও বড় করার জন্য কিছু টাকা ঋণ করে প্রেস কাঁটালপাড়া থেকে কলকাতায় তুলে আনেন। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত

প্রেস দেখাশুনা করতেন যাদবচন্দ্র নিজে এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ। সঞ্জীবচন্দ্র তখন চাকরি করতেন। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র ঋণগ্রস্ত থাকলেও সংসারে আয় বাড়াবার জন্য যে কোনও চেষ্টা করেন নি, তা নয়। তিনি কেবল প্রত্যেক কাজে হাত লম্বা করে খরচ করে ও বিলাসিতা করেই ঋণের পর ঋণ করে গেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি করতে করতেই যেমন একটা ছাপাখানা করেছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন চলাকালে তিনি 'ভ্রমর' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বার করেছিলেন এবং নিজেই সম্পাদনা করতেন। ভ্রমর বঙ্গদর্শনের ন্যায়ই উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। এতে সঞ্জীবচন্দ্র নিজে তো লিখতেনই, বঙ্কিমচন্দ্রও লিখতেন। ভ্রমর প্রায় বছর দুই চলেছিল।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বন্ধ করে দিলে, সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক দানপত্র করে সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব দান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ হাতে দানপত্রে এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন—

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্তবাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেষু—

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া কস্য দানপত্র কার্যনাঞ্চাগে আমি বঙ্গদর্শন নামে যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া ছিলাম, অদ্য হইতে তাহাতে আমার যে কিছু স্বত্ব ও অধিকার, তাহা আপনাকে দান করিলাম। অদ্যকার তারিখের পূর্বে উক্ত পত্রে মৎ প্রণীত যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পুনঃপ্রকাশ বা পুনর্মুদ্রিত করিবার যে অধিকার তাহা পূর্ববৎ আমার রহিল। তদ্ভিন্ন উক্ত পত্রের গ্রাহকদিগের কাছে সন ১২৭৯ হইতে সন ১২৮২ সাল পর্যন্ত কয় বৎসরের বাবত যে টাকা পাওনা আছে তাহাতেও আমার হক্ বজায় রহিল। ইহা ভিন্ন বঙ্গদর্শনে আমার আর কোন স্বত্বাধিকার রহিল না। আপনি উহা প্রকাশ করিবেন বা করাইবেন এবং উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। উহা প্রকাশ করিতে বা উহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে আমার কোন দাবিদাওয়া রহিল না। এতদর্থে দানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—তাং ১২ অগ্রহায়ণ, সন ১২৮৩ সাল

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাং কাঁটালপাড়া

সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে পাঁচ বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা

করেছিলেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার প্রথম দিকে তিনি চাকরি করতেন, পরে চাকরি ছেড়ে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনকে নিজের আমলের মতই দেখতেন এবং এতে নিয়মিত লিখতেনও। তাঁর বিখ্যাত আনন্দমঠ উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের ছাপার ব্যাপারেও সঞ্জীবচন্দ্রকে অনেক সময় অর্থ সাহায্য করতেন। এ সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

এবার যখন কোন সুযোগ পাইবে, আমার ঘরের চাবির গোছা পাঠাইয়া দিও। তোমার পিতার আমলের বঙ্গদর্শন তিন বৎসর আমার জন্য বাঁধাইয়া দিও।

আমি এক বেল কাগজ পাঠাইয়াছি, পৌঁছিয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। সংবাদ লিখিবে। রথের সে ১৫ টাকা কি হইল লিখিবে। বড়বাবু দিয়াছেন কি ?

আনন্দমঠ যে সংখ্যায় বাহির হইয়াছে সেই সংখ্যা হইতে এক কপি বঙ্গ-দর্শন অক্ষয় সরকারকে দিও। উইথ বি, সি, চ্যাটার্জীজ কমপ্লিমেনটস্ লিখিয়া দিও। তাহা হইলে তোমাদের দেওয়া বুঝাইবে না। আনন্দমঠ শেষ হইলে দেওয়া বন্ধ করিবে।

আমায় হাওড়ায় পত্র লিখিও। বঙ্গদর্শন অচল হইলে, আমাকে জানাইও। টাকা বা ম্যাটার সম্বন্ধে যাহা উপকার করিতে পারি করিব।

রাধানাথ আমাকে আন্দাজি ৩০ টাকা দিয়াছে। তোমাদের যদি ডেস্‌প্যাচ বন্ধ থাকে তবে লিখিও, আমি টাকা পাঠাইব। ইতি—তাং ১৪ই জুলাই

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পড়ে সঞ্জীবচন্দ্র যেমন সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন, তেমনি তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রও তাঁদের দেখে সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। পূর্ণচন্দ্রের একটি উপন্যাস, কয়েকটি গল্প ও অনেকগুলি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে কিছুটা বেশী শ্রদ্ধাভক্তি করলেও, অপর ভাইদের

প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা বা স্নেহের অভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তিন ভাই-এর প্রত্যেককেই তাঁর একটি করে উপন্যাস উৎসর্গ করেছিলেন। বড়দা শ্যামাচরণকে উৎসর্গ করেন দুর্গেশনন্দিনী, মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন কপালকুণ্ডলা এবং ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রকে দেন চন্দ্রশেখর।

মূলত পিতার দানপত্র ইত্যাদির কারণেই চার ভাই-এর মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কখন কখন মনোমালিন্য দেখা দিলেও, বরাবরই কিন্তু সদ্ভাব ছিল। এমন সদ্ভাব ছিল যে, এঁরা প্রত্যেকেই এঁদের কর্মজীবনে ছুটিতে প্রায়ই একে অন্যের কর্মস্থলে বেড়াতে যেতেন। আর একটা কথা বললে হয়ত অনেকে বিশ্বাসই করবেন না। সেটা এই যে, এঁরা চার ভাই একসঙ্গে বসে তামাক খেতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রদের সদরবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথের দুধারে দুটি বৈঠকখানা ছিল। সে দুটি ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় আজও অবশ্য রয়েছে। এই দুটি বৈঠকখানার মধ্যে একটি আয়তনে বেশ বড়। অপরটি একটু ছোট। বড় বৈঠকখানায় বড়, মেজ ও সেজ বঙ্কিমচন্দ্ররা এই তিন ভাই বসতেন। এখানে বসেই তাঁরা তিন ভাই একসঙ্গে তামাক খেতেন। ছোট বৈঠকখানাটিতে সাধারণত ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র বসতেন। পূর্ণচন্দ্র বড় ভাইদের লুকিয়ে সেখানে বসে কখন কখন তামাক টানতেন। পূর্ণচন্দ্রও তামাক খান, একথা একদিন জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ জানতে পারেন। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র তিন ভাইয়ে একদিন বড় বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় তাঁরা কিভাবে জানতে পারলেন যে, পূর্ণচন্দ্রও তখন ছোট বৈঠকখানা ঘরে লুকিয়ে ধূমপান করছেন। এই শুনেই জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ উঠে গিয়ে ছোট বৈঠকখানার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

পূর্ণচন্দ্র হুঁকা কলকে লুকিয়ে ঘর খুলে দিলেন।

শ্যামাচরণ ঘরে ঢুকেই দেখলেন, ঘর তামাকের ধোঁয়ায় ভর্তি। তারপর তিনি তক্তপোশের নিচে থেকে খুঁজে হুঁকা কলকে বার করলেন। এরপর তিনি পূর্ণচন্দ্রের হাত ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে তাঁকে নিজেদের ঘরে অর্থাৎ বড় বৈঠকখানায় আনলেন।

শ্যামাচরণ পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে ১৮ বছরের বড় ছিলেন। বড়দার কাছে তামাক খাওয়া হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন, না জানি কত বকবেন, এই ভেবে ভয়ে পূর্ণচন্দ্র আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

শ্যামাচরণ পূর্ণচন্দ্রকে নিজেদের মধ্যে এনে একদিকে বসিয়ে বললেন, আজ থেকে এইখানে তোমার আসন হ'ল। এখন থেকে তুমি আমাদের সঙ্গেই একত্রে তামাক টানবে।

পূর্ণচন্দ্র কিন্তু তখনও প্রায় কাঁপছেন। এই প্রসঙ্গেই পরে তিনি লিখে গেছেন, লোকে শুনলে আশ্চর্য হবে যে, আমরা চার ভাই একত্রে বসে ধূমপান করতেম।

ভাইয়ে ভাইয়ে এমনি ছিল এঁদের ভাব ও বন্ধুত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রদের চার ভাই-এর এই সদ্ভাবের নিদর্শনস্বরূপ আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করছি। সেটা হল এই—

এঁরা চার ভাইয়ে মিলে একবার একটি দলিল রেজিস্ট্রি করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল এই যে, চার ভাই-এর মধ্যে কেউ বা তাঁর পরিবারবর্গের কেউ যদি কখন উপার্জনহীন বা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে অন্যরা সকলে তাঁকে সাহায্য করবেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন, বিবাহ দেবেন এবং ছেলেদের ব্যবসা করবার জন্য প্রয়োজন হলে অর্থ দেবেন। আর সে ব্যবসা অন্তত দশ হাজার টাকার কমের মূলধনে যেন না হয়।

এক শ বছর আগের দশ হাজার টাকার মূল্য বোধ করি এখনকার লক্ষাধিক টাকার মূল্যের সমান। অতএব এঁদের এই দলিল থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এঁদের নজর যেমন উঁচু ছিল, তেমনি সামর্থ্যও ছিল।

দলিলের বয়ান ছিল এইরূপ—১। আমাদের মধ্যে কোন এক ভ্রাতার শরীরের ব্যাঘাত হইলে অপর ভ্রাতারা উক্ত ভ্রাতার পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইব।

২। সে প্রতিপালন এই ধারা—যাহার শরীরের ব্যাঘাত হয়, তাহার পুত্র সন্তান থাকিলে ঐ পুত্র সন্তানদিগের উপনয়ন, বিবাহ এবং বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হইবে এবং যতদিন না ঐ পুত্র সন্তানদের মধ্যে কেহ একজন উচিত মত অর্থোপার্জন করে, ততদিন তাহাদিগের সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে। আর অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে ঐ কন্যাদিগের উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিতে হইবেক। আর উক্ত ভ্রাতার স্ত্রী বর্তমান থাকিলে, যতদিন তাহার পুত্র তাহাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম না হয়, ততদিন গ্রাসাচ্ছাদন দিব।

৩। উচিত মত অর্থোপার্জন যে বলা গিয়াছে বা যাইবে তাহা হাই-কোর্টের বা জেলা জজ আদালতের ওকালতি বা ব্যারিস্টারি বা এটর্ণিগিরি

বা ডাক্তারি বা অন্যূন এক শত টাকা বেতনের বা কমিশনের চাকরি বা অন্যূন দশ হাজার টাকার কারবারের দ্বারা যে উপার্জন হইবেক, তাহাকেই বলা যাইবেক। অন্য উপার্জনকে বলা যাইবেক না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দলিলটি বেশ দীর্ঘ। এতে কি কি করা কর্তব্য বলে এই ধরণের ২১ দফা আলোচনা আছে। ৬০ টাকার কোর্ট ফির কাগজে লিখে যথারীতি সাক্ষী-সাবুদ রেখে চার ভাইয়ে স্বাক্ষর করে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এই দলিলটি রেজিস্ট্রি করেছিলেন।

দলিলের প্রথমেই আছে—আমরা এক্ষণে চারি ভ্রাতা পৃথক অন্নে আছি।—এই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৩ সালেরই কিছুদিন আগে যাদবচন্দ্র পুত্রদের পৃথক অন্ন করে দিয়েছিলেন। পৃথক হওয়ার কিছুদিন পরেই এঁরা এই দলিলটি করেছিলেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পৃথক হওয়ার সময় বড় ও সেজ পৈতৃক বসত বাটীর অংশ না পাওয়ায় বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই দলিল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাহ্যত ক্ষুণ্ণ হলেও অন্তরে অন্তরে তখন ভাইয়ে ভাইয়ে যথেষ্ট মিলও ছিল।

১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ হঠাৎ অসুস্থ হন। সেই সময় তাঁর অসুখের সংবাদে বঙ্কিমচন্দ্র খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য কর্মস্থল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তখন সঞ্জীবচন্দ্রকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

শ্রীচরণেষু,

…দাদার পীড়া মারাত্মক নহে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। গোড়ায় হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেণ্ট হইলে ট্যাপ করিবার প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে ইহার ঔষধ আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। যদি আর কখন হয়, তবে প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিলে সহজে আরাম হইবে। যতদিন না নিঃশেষ আরাম হয়েন, ততদিন কলিকাতায় রাখিবেন। বোধ করি তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় তাঁহাকে কিছুই বহন করিতে দেন নাই। সব আমার ব্যয়ে হওয়া কর্তব্য। টাকার প্রয়োজন হইলে উমাচরণকে বলিলে সে সরবরাহ করিবে। দাদার নিঃশেষ আরোগ্য সম্বাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—১০ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

…দাদার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। কিন্তু আমার বেশ ভরসা আছে রক্ষা পাইবেন। তবে কালিকার তারিখে বাড়ির কাহারও পত্র না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। শীঘ্র সম্বাদ লিখিবেন। ইতি—তাং ১৩ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে শ্যামাচরণ তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের অসুখের সংবাদ শুনে তাঁর রীতিমত চিকিৎসার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশকে এবং পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনকে বঙ্কিমচন্দ্র যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, এখানে তার কয়েকটা উদ্ধৃত করছি। জ্যোতিশকে লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পিতা কেমন আছেন? তাহার সম্বাদ লিখিবে। রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। খরচপত্রের অকুলান হইলে আমাকে লিখিবে। পীড়া এ বৎসরের বর্ষ প্রবেশের ফলে হইতেছে। অধিক দিন থাকিবে না। ইতি—তাং ৯ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

৺রাধাবল্লভের দেবত্র বিষয়ের বন্দোবস্তের কথা হইতেছে। আমি তাহাতে সম্মত নহি। কেন সম্মত নহি, তাহা বলিতে আমি বাধ্য নহি।

তোমার পিতা কেমন থাকেন, আমাকে মধ্যে মধ্যে লিখিবে। এবং রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। আমার হাঁপানি সারিয়াছে। ইতি—তাং ১১ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

বিপিনবাবু মাংস দুই চারি দিন দিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, অন্যান্য নারিশিং ফুড দিবে। যথা—অল্প দুধ, মাছের ঝোল ইত্যাদি। একবেলা রুটি দিতে পার; কিন্তু দুইবেলা রুটি দিলে পেটের পীড়া বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। যদি চুঁচুড়ায় ভাল পাউরুটি পাও তবে তাহা দিতে পার। পেটে তিন আউন্স চলিতে পারে, কিন্তু বেশী পড়িলে রক্তস্রাব বাড়িবে, ইহাও বলিতে বলিলেন।

আফিম যে মাত্রায় খাইতেন, সেই মাত্রায় খাওয়াইতে বিশেষ নিষেধ করিলেন। বলিলেন যে, তাহা হইলে পেটের পীড়া সারিয়া যাইবে। আর একটা মুখ যাহা হইয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই—কিন্তু সেটা বড় না হয়।

আমার নিজের ব্যবস্থা এক আধ ডোজ 'চায়না' দিবে। চায়না এই অবস্থায় বলকারক। আমি রবিবার দিন কাঁটালপাড়ায় যাইতে পারি—কাজ আছে। ইতি—তাং বৃহস্পতিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

তোমার তিনখানা পত্র কাল সন্ধ্যার সময় পাইলাম।…

তোমার পিতাকে প্রত্যহ একবার করিয়া হিপার সালফ দিবে। তাহাতে যন্ত্রণার বিশেষ উপকার হইবে। আমি বোধ করি কাল কি পরশু দেখিতে যাইব। ইতি—শুক্রবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের দুটি চিঠি বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা থেকে লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে কিছু কিছু চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা জানতেন তা তাঁর এই চিঠি থেকেই জানা যায়।

মেজদার অসুখ নিয়ে তখন বঙ্কিমচন্দ্র অপর ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনচন্দ্রকেও এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

মেজবাবুর রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। ব্যয় জন্য কুণ্ঠিত হইবে না। আমার কাঁটালপাড়া যাওয়া দুর্ঘট। সুবার্বণ পুলিশ কোর্টের চার্জ আমার নিকট, 'কন্‌ফেশান অর ডাইয়িং ডিক্লারেশান' লিখিতে হয়। এজন্য কোথাও যাইতে বাসনা করি না। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে তখন বিবেচনা করা যাইবে।

ডাক্তার যেরূপ বলিয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হয় না। কোন চিন্তার বিষয় নাই। মেজবাবুর ওরূপ জ্বর হইয়া থাকে। এক্ষণে কেমন থাকে আগামীকালই আমাকে সংবাদ দিবে।

আমার নিজের ব্যবস্থা, এক আধ ডোজ চায়না দিবে। চায়না এই অবস্থায় বলকারক।

পুঃ আমি রবিবার কাঁটালপাড়ায় যাইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র এত চেষ্টা সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্রকে আর সারিয়ে তুলতে পারলেন না। ১৮৮৯ এর ১৮ই এপ্রিল তারিখে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই সময় শ্যামাচরণও আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক ১১ দিন পরে তিনিও মারা যান। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই মৃত্যু হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় একবার কথা হয়েছিল, তিনি জ্যোতিশচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জ্যোতিশ-চন্দ্র তাঁর বাপমায়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে, তা নাকি সম্ভব হয়নি। তবুও বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে পুত্রবৎই স্নেহ করতেন।

জ্যোতিশের অভাবে-অভিযোগে, আপদে-বিপদে, দুঃখে-সুখে সব সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। জ্যোতিশ অন্যায় করলে তাঁকে যেমন তিনি তিরস্কার করেছেন, তেমনি জ্যোতিশের পিতৃঋণ শোধের ব্যাপারে, কন্যার বিবাহের কাজে প্রভৃতিতে তিনি শুধু পরামর্শদাতা হিসাবেই নয়, যথেষ্ট সময় এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন।

জ্যোতিশ চাকরি পাওয়ার আগে যখন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসে এই কাকার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, তখন অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কখন কখন বাড়ির দু একটা কাজের ভার জ্যোতিশের উপর দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় প্রধানত নিজের কর্মস্থলে থাকতেন বলে চিঠি লিখে চিঠিতে উপদেশাদি দিয়ে কাজের কথা জানাতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথবাবু রবিবার দিন প্রাতে কাঁটালপাড়ায় যাইবেন। আমার বৈঠকখানাটি ঝাঁট দিয়া সাফ করাইয়া টেবিল চৌকি পাতিয়া রাখিবা। শয়ন জন্য একখানি ছোট তক্তপোষ পাতিয়া দিবা। রন্ধন জন্য কোন চালা সাফ করাইয়া রাখিবা। রাত্রে শয়নের জন্য আমায় যেরূপ বিছানা দাও, সেইরূপ দিবা। কেদারবাবু বড় ভদ্র লোক, পরম বৈষ্ণব ও শুদ্ধাচার। তাঁহাকে সঙ্গে আনিবার জন্য স্টেশনে ৮।৷টার ট্রেনে লোক উপস্থিত থাকিলে ভাল হয়। ইতি—তাং ১৯মে

পুঃ

প্রাণাধিকেষু,

৺কর্তার সপিণ্ডন সময়ে সমাজ খাওয়ান হয় নাই। আগামী বুধবারে তাহার উদ্যোগ করিবার ইচ্ছা আছে। কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিবে, মঙ্গলবার দিন

বেলা ৪টার মধ্যে দেড় হাজার ভাল খাশ আম্র দিতে পারে কিনা। যদি দিতে পারে তবে কত করিয়া শ লইবে। যদি একটি আম্র টক্ বলিয়া ব্রাহ্মণেরা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার দাম কাটা যাইবে, বিলক্ষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। সানিতা অঞ্চলের কোন ব্যাপারি পাইলে অথবা নৈহাটির ষষ্ঠীতলা হইতে একজনকে ডাকাইয়া ঐরূপ বন্দোবস্ত করা সুবিধা বুঝিলে করিবে। হারাণ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিবে সে দধি ও ক্ষীর কত পরিমাণে ফরমাইস লইতে পারে। পাটপাড়ার কুম্ভকারকে ডাকাইয়া ৩০০ গেলাস ৪০০ কটরা ফরমাইস দিবা, বায়না টাকা আমি সোমবারে দিব। কেদারবাবুকে আনিতে তুমি নিজে গেলে ভাল হয়। তুমি তাঁহার পুত্রকে চেন, তাহার নাম আমি ভুলিতেছি, তাহার একখানা মান্থ্লি ম্যাগাজিন প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি নড়াইলের জয়েণ্ট সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন অথবা অদ্যাপি আছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রদের বসতবাটীতে দুটি বৈঠকখানা থাকা স্বত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির সংলগ্নই পৃথক জমিতে বাগানসহ আলাদা আর একটি সুন্দর বৈঠকখানা তৈরি করেছিলেন। চিঠিতে এই বৈঠকখানার কথাই বলেছেন।

এই বৈঠকখানাটি সম্বন্ধে সেকালের সাহিত্য সমালোচক, বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—'গৃহটি একতালা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে।'—প্রদীপ, ১৩০৫

এই বৈঠকখানা গৃহে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করেছিলেন এবং শেষ দু বছর 'বঙ্গদর্শন'ও সম্পাদনা করেছিলেন। বাগান ও চারখানা কক্ষ বিশিষ্ট এই বৈঠকখানা ভবনেই বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্থাপিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা।'

এই বৈঠকখানার সংলগ্ন বাগানটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী ও আর এক স্নেহভাজন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন—'একটি ছোট্ট

ফুলের বাগান। দু কাঠাও পুরা হইবে না।...বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট চৌকা, হাত খানেক উঁচা। তাহারও মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাত খানেক উঁচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারির মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙ্গিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে শুরকির কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকি জমিতে যুঁই, জাঁতি, কুঁদমল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের শোভা দেখিতেন।' নারায়ণ—বৈশাখ ১৩২২

চিঠিতে যে '৺কর্তার সপিণ্ডন সময়ে সমাজ খাওয়ান হয় নাই' আছে, তার ইতিহাসটা হ'ল এই—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হলে, তখন বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইয়ে মিলে খুব ধুমধামের সঙ্গে পিতার শ্রাদ্ধ করেছিলেন। পিতার শ্রাদ্ধ সমারোহের সঙ্গে হলেও, পিতার সপিণ্ড-করণের সময় কিন্তু তেমন কিছু হয়নি, এমন কি সমাজ খাওয়ান পর্যন্ত হয়নি।

আগেকার দিনে পরস্পর সংলগ্ন কতকগুলি গ্রামের স্বজাতিদের নিয়ে এক একটি 'সমাজ' ছিল। শ্রাদ্ধাদিতে এই সমাজের লোকদের খাওয়ান তখন একটা রীতি ছিল। আজকাল এসব আর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার সপিণ্ডকরণের সময় কেন যে সমাজ খাওয়ান হয়নি, তার একটা কারণ ঘটেছিল। সেই কারণটি হচ্ছে—পিতার সপিণ্ডকরণের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ পীড়িত ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে অসুস্থ শরীরে সপিণ্ডকরণ করা চলে না। এই অবস্থায় তখন ভাটপাড়ার কোন কোন পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে, সঞ্জীবচন্দ্রই এখন সপিণ্ডকরণের অধিকারী এই মত প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে মধ্যম ভ্রাতা পিতার সপিণ্ডকরণ করুন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই সময় ভাটপাড়ার আর এক দল পণ্ডিত কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে বলেন—শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠের অভাবে কনিষ্ঠ সপিণ্ডকরণের অধিকারী, মধ্যম নহেন। তখন পূর্ণচন্দ্রই, সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও পিতার ঐ কাজ করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র ঐ সময় হুগলী আদালতে সামান্য বেতনে কেরাণীর কাজ করতেন। আর্থিক অবস্থা তখন তাঁর আদৌ ভাল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্র পিতার কাজ করেছিলেন বলে, সপিণ্ডকরণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রকে কোন অর্থ সাহায্য করেন নি। পূর্ণচন্দ্রও আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু কোন প্রকারে পিতার কাজ করলেও সমাজ খাওয়াতে পারেন নি।

পূর্ণচন্দ্র সমাজ খাওয়াতে না পারায় বঙ্কিমচন্দ্র মনে ব্যথা পান। তাই সপিণ্ডকরণের কয়েক মাস পরে, সেই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের কাছে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আয়োজনের ভার জ্যোতিশচন্দ্রের উপর দিয়ে কাজের দিন নিজে কাঁটালপাড়ায় উপস্থিত থেকে নিমন্ত্রিত সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে অবশ্য আগেই এ নিয়ে তার মনোমালিন্য মিটে গিয়েছিল।

জ্যোতিশ কোন অন্যায় কাজ করলে, তাঁকে কাছে না পেলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন চিঠি লিখেও তাঁকে কিরূপ তিরস্কার করতেন, এখানে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আসল নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। যখন তিনি মহামহোপাধ্যায় বা শাস্ত্রী কিছুই হননি, সেই সময় একবার তিনি এবং জ্যোতিশচন্দ্র উভয়েই নিজেদের এলাকার নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হয়েছিলেন, কিন্তু কোন কারণে জ্যোতিশচন্দ্র হরপ্রসাদবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করেন। এই সংবাদ শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

প্রাণাধিকেষু,

আমি শুনিলাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্যর নামে দরখাস্ত হইয়াছে, যাহাতে সে অপদস্থ হয়। আরও শুনিলাম তুমিই দরখাস্তের মূল। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কাহারও গ্লানি করা বা কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করা আমাদের বংশের রীতি নহে, আমাদের বংশে কেহ কখন এমন কাজ করে নাই। তুমি কেন এরূপ করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বিশেষ হরপ্রসাদ আমাদের আত্মীয়; আর আমার বিশ্বাস সে ভাল লোক। যদি সে কোন

দোষ করিয়া থাকে তবে যাহার কাছে সে অপরাধ করিয়াছে এবং যে বিচার-কর্তা তাহারাই বুঝিবে। তোমাকে এ বিষয়ের কর্তা কে করিল বলিতে পারি না। এ সকল তোমার অকর্তব্য। ইতি--তাং ১২ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিশ কাকার এই চিঠি পেয়েই হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিলেন।

জ্যোতিশ একশত টাকা মাইনের কর্মচারী। অথচ তাঁর সংসারে স্ত্রী ছাড়া পুত্র কন্যা পাঁচটি। অল্প বেতন হেতু তিনি কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে যেতে পারেন নি। কাঁটালপাড়ার বাড়িতেই তাঁর পরিবার থাকত। ছুটিতে তিনি বাড়ি আসতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ছুটিতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি এলে, আর শেষ বয়সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে যখন কলকাতায় নিজের বাড়িতে থাকতেন, তখন প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় গিয়ে জ্যোতিশের সংসার দেখে আসতেন। কারও অসুখ করলে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতেন এবং প্রয়োজন হলে টাকাও দিতেন। তারপর কাঁটালপাড়া থেকে ফিরে জ্যোতিশকে তাঁর বাড়ির সংবাদ লিখে জানাতেন। এই ধরণের দুটি চিঠি এই—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি গত রবিবার বাড়ি গিয়া চিরণকে দেখিয়া আসিয়াছি। জ্বর অতি সামান্যই আছে। এক শত ডিগ্রির উপর আর ওঠে না।······ঘরে সিদ্ধ করিয়া যে সুরুয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা 'জাগ্‌ড স্যুপ' তুল্য এবং তাহা সে জীর্ণ করিতেছে। চিরণের জন্য কোন চিন্তা নাই।···

ঊর্মিলার পীড়া অতি সামান্য। তাহার জন্য এক বোতল ডি গুপ্ত পাঠাইলাম। মক্কেশ্বর ডাক্তারকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। টাকা কড়ির জন্য আমি তাহার নিকট জামিন আছি।···

তোমার মাতার ও বধূমাতার ও অনিলের কাপড় কিনিয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি—তাং ১৮ জুন

চিঠির চিরণ বা চিরঞ্জীব ছিলেন জ্যোতিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনিল সুন্দরী ও ঊর্মিলা যথাক্রমে জ্যোতিশের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা।

এবার দ্বিতীয় চিঠিটি এই—

কল্যাণবরেষু,

আমি বাড়ি গিয়াছিলাম। কুপথ্য করিয়া চিরণের আবার একটু জ্বর হইয়াছে। তোমার কাছে না থাকিলে পথ্যাপথ্য ঠিক হইবে না। এক্ষণে ভাদ্র মাস, যাওয়া হইতে পারে না। কাজেই পূজার পর।

তোমার ছেলেদের একদিন পীড়া ছাড়া নাই। তাহার কারণ,··· পথ্যাপথ্যের অনিয়ম।

খরচপত্রের হিসাব পশ্চাৎ পাঠাইতেছি। কিন্তু ডাক্তার খরচ না কমাইলে তোমার সংসার চলা অসম্ভব। তোমার পিতার স্বর্গারোহণের পরেও মাসে গড়ে কুড়ি টাকা ডাক্তার খরচ। মক্কেশ্বরের হিসাব আনাইয়া দেখিয়াছি। তুমি যে টাকা পাঠাও তাহা যদি কেবল ডাক্তার খরচ ও চাকরাণ বেতনে যায়, তবে সংসার খরচ কিসে হইবে। যাহা অকুলান পড়ে তাহা এক্ষণে কোনমতে চালাইয়া দিব। কিন্তু আমার যেরূপ টানাটানি হইয়াছে তাহা তুমি আসিলে বুঝাইয়া দিব। তাহার নানা কারণ ঘটিয়াছে।

মাসিক ও সপিণ্ডকরণ সম্বন্ধে যাহা মানস করিয়াছ, তাহা করিতে পার, কিন্তু তোমার ছোট ছেলের এখনও একটু একটু জ্বর হইয়া থাকে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

সুরেশ কলিকাতায় থাকে, নরেশ ছাপরায়, কৈলাস সংসারের কিছু দেখেন না, যোগ অভ্যাস করেন। সুতরাং তোমার সংসার দেখিবার লোক সেখানে কেহ নাই। আর আর কথার উত্তর পশ্চাৎ লিখিব। ইতি—৬ ভাদ্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির কৈলাস হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগিনেয়। যাদবচন্দ্র তাঁর একমাত্র কন্যাকে বাড়ির নিকটে জায়গা দিয়ে বাড়ি করে দিয়েছিলেন। সুরেশ ও নরেশ কৈলাসের দুই পুত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে জ্যোতিশকে অসংখ্য চিঠি লিখে ছিলেন। এমন কি অসুস্থতাবশত যখন নিজে লিখতে পারতেন না, তখন তিনি বলে যেতেন, আর তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী লিখতেন। লেখা হলে সেই চিঠিতে তিনি নাম সই করে দিতেন। কখন বা তাঁর নির্দেশে রাজলক্ষ্মী দেবী নিজেই তাঁর স্বামীর হয়ে জ্যোতিশকে চিঠি লিখতেন। এখানে এই

ধরণের দুটি চিঠি দিচ্ছি। প্রথমটি রাজলক্ষ্মী দেবীর লেখা, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শুধু নাম স্বাক্ষর ছিল, আর দ্বিতীয়টি নাম সহিসহ রাজলক্ষ্মী দেবীরই লেখা—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পিতাকে আর অধিক কুইনাইন খাওয়াইও না। কলিকাতায় যদি যাইতে পারেন, তাহা হইলে সেইখানে কিছুদিন রাখিবে। আমি জ্বরে বড় কষ্ট পাইয়াছি। যশোর হইতে ডাক্তার ও ঔষধ আনাইয়া চিকিৎসা হইয়াছে। কাল রাত্রিতে জ্বর ছাড়িয়াছে। এই পত্রের সহিত তোমাদের সাংসারিক খরচ ১০০ পূজার ১০ ঠাকুর সেবার বাকি ৬ একুনে ১১৬ টাকা পাঠাইলাম। টাকা তোমার পিতার হাতে দিবে। তিনি কেমন আছেন তাহা লিখিবে। ঠাকুর সেবার বাকি টাকা কালাচাঁদ দাসের নিকট হইতে আদায় হয় নাই। ইতি—তাং ২২শে কার্তিক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়া থেকে যশোহর জেলার ঝিনাইদহে বদলি হন। চিঠিটি সেইখান থেকেই লেখা।

এবার দ্বিতীয় চিঠিটি—

বাবা,

তোমার পত্র বাবু পাইয়াছেন। বাবু পীড়িত, এইজন্য তোমার পত্রের উত্তর লিখিতে পারেন নাই। আজ ভাল আছেন। একটু সুস্থ হইলেই তোমার পত্রের উত্তর লিখিবেন। তোমার ছেলে ও মেয়েরা, তোমরা সকলে কেমন আছ, তাহা লিখিবে। ইতি—২০ কার্তিক

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী

জ্যোতিশ পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরি করতেন এবং নিজের কর্মস্থলে থাকতেন। তাই তাঁর কন্যা অনিল সুন্দরীর বিয়ের ব্যাপারে পাত্র ঠিক করা থেকে শুরু করে বিয়ের অধিকাংশ ব্যয় বহন করা পর্যন্ত সমস্তই বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছিল এবং এ নিয়ে তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাটও ভোগ করতে হয়েছিল।

একটা প্রবাদ আছে, লাখ কথায় বিয়ে অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারটা এক কথায় বা সহজে বড় একটা হয় না। অনিলের বিয়ের সময়ও এমনি অনেক দেখাদেখি ও দেনাপাওনা নিয়ে বেশ দরাদরি হয়েছিল। তার কারণ জ্যোতিশের অবস্থা ভাল নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্রই বা কত দেবেন!

এই বিয়ে নিয়েই জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের তখনকার কয়েকটা চিঠি এই—

প্রিয়তমেষু,…অনিলের অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু টাকার অভাবে আমি কথা কহিতে পারিতেছি না। ইতি—তাং ২০ এপ্রিল

কল্যাণবরেষু,…অনিলের সম্বন্ধ যাহা বাঁকিপুরে হইতেছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই কাঁটালপাড়ার নবীন ভট্টাচার্য ভাঙচি দিয়াছে। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণে এলাহাবাদে পুত্রের সম্বন্ধ করিয়াছেন।

অন্যান্য পাত্র যাহা সন্ধান পাইয়াছি, তাহা অর্থ সাপেক্ষ। তবে শুনিতেছি যে কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত। তাহারা বড় টাকার কামড় করিবে না। তুমি একবার কৃষ্ণধনকে লিখিলে ভাল হয়। ইতি—তাং ১৫ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,…তোমার বাড়ি মেরামত নিজ খরচে করিয়াছি। নবীন ভট্টাচার্য বাঁকিপুরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়র নিকট বলিয়াছে যে, মেয়ের একটি আব আছে। সেজন্য সে সম্বন্ধ ঘটিল না।…

কল্যাণবরেষু,…সে পাত্রটির বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। এখন অনিলকে পাঠাইবে না। অন্য সম্বন্ধ শীঘ্র করিব।

অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ দিব। ইতি—তাং ৬ আগষ্ট

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রহায়ণ মাসে অনিলের বিয়ে দেবেন বললেও অগ্রহায়ণে বিয়ে দিতে পারেন নি। বছর প্রায় শেষ হয়ে এল। এমন সময় চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পাত্রের সন্ধান দিলেন। রাখালবাবু তখন মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। রাখালের চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আবার জ্যোতিশকে লিখলেন—

প্রিয়তমেষু,

নীলমণি টাকা পাইয়াছে কিনা লিখিবে। বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। এখন অর্দ্ধেক পেনসন পান। তাহা ছাড়া দুই শত টাকা বেতনের চাকরি করেন। বিষয় আশায় ভূসম্পত্তিও মন্দ নহে। তাঁহারা রুদ্ররাম চক্রবর্তীর সন্তান, তিনি তিন পুরুষে। তাঁহার পুত্র অশ্বিনীকুমারের বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। মেদিনীপুরের কালেকটরিতে অ্যাসিষ্টাণ্ট ট্রেজারার। বেতন ৪০ টাকা। ছেলে আমি বিশেষ জানি—

অতি সচ্চরিত্র। তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আজকাল বিবাহ করিবে। রাখাল তাহার সহিত তোমার কন্যার সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। বিশুবাবু রাজী হইয়াছেন। চৈত্র মাসে কন্যা দেখিতে আসিবেন। বিশেষ কিছু দিতে হইবে না বোধ হয়। তোমার ছোট কাকার তিনি বিশেষ বন্ধু। তাঁহার কথায় সব কম হইতে পারে। তোমার মত কি, তাহা লিখিবে। যদি এ সম্বন্ধে তুমি অসম্মত হও, তবে ইহার অপেক্ষা ভাল কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। ইতি—তাং ১৮ মার্চ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কয়েকদিন পরেই জ্যোতিশকে আবার লিখলেন—

কল্যাণবরেষু,

...বিশ্বেশ্বরবাবু গুড ফ্রাইডের সময়ে আসিয়া অনিলকে দেখিতে যাইবেন। পূর্ণচন্দ্র কি আমি সঙ্গে যাইব।

বিশ্বেশ্বরবাবু খুব সঙ্গতিপন্ন লোক। রুদ্ররাম চক্রবর্তীর সন্তান। তিন পুরুষে। বাড়ি পুঁড়া খোড়াগাছি। বসিরহাটের নিকট। বাড়ি বড় মানুষের মত। ইতি—তাং বুধবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বেশ্বরবাবু মেয়ে দেখতে আসবেন সব ঠিক, কিন্তু হঠাৎ আবার গোল দেখা দিল। রাখালই তখন মেদিনীপুর থেকে জ্যোতিশকে লিখলেন—

জ্যোতিশচন্দ্র,

অনিলের বিবাহের গোল। বিশু বলিতেছেন—'ভুবনো-গাধা' তাঁহাকে ফর্দ দেখায় নাই। এখন ডাকে পাঠাইয়াছে। এখন আর তিনি বেশী চাহিবেন না। নগদ ১০১ এর স্থলে ২০১ এবং আর দুইখানা গহনা—অনন্ত এবং হার পাইলে বিবাহ দিতে পারেন। বিশু চেঁচামেচি অনেক করিতেছেন, মুখভঙ্গীও নানারূপ। মোটামুটি আমি বুঝিয়াছি—১৫১ টাকা নগদ এবং আর একখানা গহনা অনন্ত পাইলে বিবাহ দিতে বিশুবাবু বাধ্য আছেন। শ্বশুর মহাশয়কে লিখিলাম। তুমি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার মত করাইয়া পত্র লেখাইবে। আশীর্বাদ কার্য বন্ধ আছে। এখানকার মঙ্গল।—রাখাল

রাখালের চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বিশ্বেশ্বরবাবুকে চিঠি দিলেন। শেষে গহনা ও টাকার ব্যাপারে রফা হলে, বিশ্বেশ্বরবাবু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে এসে পাত্রী দেখে আশীর্বাদ করে গেলেন।

অনিলের এই বিয়ের খরচ নিয়েই জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটা চিঠি পাওয়া গেছে। সেটিও এখানে উদ্ধৃত করছি। এই সব ঘরোয়া চিঠিগুলি থেকে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের আর একটা দিকের পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিটি এই—

কল্যাণবরেষু,

তুমি ৬০০ টাকার ফর্দ করিয়াছ, তাহাতে কোন মতে হইবে না। দানসামগ্রী ও বরাভরণ ১৫০ টাকায় হইবে না। ২০০ টাকা লাগিবে। আর বালা চীক ইয়াররিং ও মল ২৫০ টাকার কম হইবে না। তুমি দুই শত টাকা মাত্র ধরিয়াছ। তুমি বোধ করি জান না যে এখন গিনি সোনার ভরি ২৫ টাকা করিয়া। তাহা ছাড়া বিবাহের দিন পুরোহিত নাপিত চাকরবাকরকে বিদায় করিতে হইবে এবং ঘটক বিদায়ও কিছু লাগিতে পারে। সেও আরও পঞ্চাশ টাকা। অতএব নয় শত টাকার উপর খরচ পড়িবে। পক্ষান্তরে তোমার ছোট কাকা আর টাকা দিতে পারিবেন কিনা বলিতে পারি না। কেননা ছোট বউমার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ইংরেজ ডাক্তার ও অন্যান্য ডাক্তার ও দাই ও ঔষধ পথ্যে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমিও যে টাকা 'রেজ' করার চেষ্টা করিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহাতে এখনও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। তাহা পাইলেও জমা ছয় শত, খরচ নয় শত এইরূপ দাঁড়াইতেছে। এ বিবাহ যে ঘটিবে এমন বোধ হয় না। তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

গোষ্ঠযাত্রায় ৪০।৪২ টাকা খরচ হয়, কৃষ্ণ ২০।২৫ টাকা খরচ করিতে চাহিতেছে। কৃষ্ণকে কে কর্তা করিল তাহা জানি না। তাহার কথায় ৺রাধাবল্লভের দুর্দশা করিতে হইবে কেন, তাহা বুঝি না। যেমন খরচ হয়, তেমনি হইবে। যে শরিক বলিবে, আমি খরচ দিতে পারিব না, সে যেন আমাকে তাহার অংশ ইজারা দেয়, আমি পর্বাহ ও পালার ব্যয় নির্বাহ করিব। সবিশেষ উপদেশ দিয়া উমাচরণকে কাল পাঠাইব। ইতি—তাং ৩০ চৈত্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের এক পুত্র। ইনি বাড়িতে থেকে ঐ সময় গৃহদেবতা রাধাবল্লভের ১লা বৈশাখের উৎসব গোষ্ঠযাত্রায় ব্যয় সংকোচ করতে চাইলে, বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হয়ে ঐ কথা লিখেছিলেন। এটা শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পরের সময়কার ঘটনা।

অনিলের বিবাহে জ্যোতিশচন্দ্রের ছোট কাকা পূর্ণচন্দ্র ৫০ টাকা, আর জ্যোতিশচন্দ্র নিজে কয়েক শ দেন। বাকি সমস্ত টাকাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রচুর ঋণ থাকায় এবং জ্যোতিশেরও চাকরি হচ্ছে না দেখে, যাদবচন্দ্র উইল করার পরে-পাওয়া নিজের একটা সম্পত্তি জ্যোতিশের নামে লেখাপড়া করে দেন। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পাওনাদাররা স্বল্প বেতনের কর্মী জ্যোতিশের নামে মামলা মোকদ্দমা করতে উদ্যত হলে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তখন পাওনাদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং জ্যোতিশকে তাঁর ঠাকুরদার দেওয়া জমি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে উপদেশ দেন। জ্যোতিশের এক তো নতুন চাকরি ও বিদেশে কর্মস্থলে থাকেন, তার উপর জমি জায়গা বিক্রির ব্যাপারে পাছে খরিদ্দারেরা তাঁকে ঠকায়, এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জ্যোতিশের কাছ থেকে একটা পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি বা বিক্রয় করার অধিকারনামা লিখিয়ে নেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তখন চাকরি করতেন। তাই পরিচিত লোকদের দিয়েই উচিত মূল্যে জ্যোতিশের জমি বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। জমি বিক্রয়ের টাকার সঙ্গে নিজেও কিছু দিয়ে জ্যোতিশকে ঋণমুক্ত করেছিলেন। জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সময়কার কয়েকটা চিঠি এই—

প্রিয়তমেষু,

মুড়াগাছার জমি বিক্রয়ের জন্য রামময় যাইতে প্রস্তুত আছে। তিনি শতকরা ৪ টাকা কমিশন চাহেন। আর ৪৮০০ টাকার উপর অর্থাৎ পূর্বে যে দর পাইয়াছিল তাহার উপর যে মূল্য করিতে পারিবেন তাহার অর্দ্ধেক চান। তিনি বলেন পূর্বে মেজবাবু থাকিয়া এইরূপ কথা হইয়াছিল। এক্ষণে ঐরূপ বন্দোবস্তে তোমার মত আছে কিনা লিখিবে।

রামময় বলেন যে, পূর্বে নীলমণি একটা দর আনিয়া মেজবাবুর কাছে দিয়াছিল। আর রামময় (অথবা তাঁহার প্রেরিত কোন লোক) আর একটা দর আনিয়াছিলেন। সেই রকম কাগজ তোমার কাছে আছে। রামময় তাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। যদি মত হয়, তবে তাহা পাঠাইয়া দিবে।

নীলমণিও আসিয়াছে। নীলমণিকেও পাঠাইতে পারি। কিন্তু সেও

কিছু কমিশন না পাইলে বোধ হয় মন দিয়া একাজ করিবে না। তোমার কি মত হয় লিখিবে।

বলাইবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, ফাল্গুন মাস পর্যন্ত নালিশ স্থগিত থাকিবে। ইহার মধ্যে মুড়াগাছার জমি বিক্রয় করিয়া আমি তাঁহাকে টাকা দিব। তুমি নিজে আসিয়া বিক্রি লেখাপড়া ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিবার সম্ভাবনা নাই। আমার নামে ঐ জমি বিক্রয় করার ও রেজিস্ট্রি করার পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি তুমি সেখান হইতে রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠাইলে আমি সকল কার্য নির্বাহ করিতে পারিব। বলাইবাবু ঐরূপ একখানি পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি দেখিতে চাহেন, নহিলে তাঁহার বিশ্বাস হয় না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠির বলাইবাবু হলেন কলকাতার বৌবাজারের দুর্গাচরণ পিতুরি লেনের পাওনাদার বলাইচাঁদ দত্ত। রামময় হলেন বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পুরোহিত রামময় ভট্টাচার্য। রাধাবল্লভের সেবার জন্য যে ব্রহ্মোত্তর জমিদারী ছিল, তার দেখাশুনা করতেন নীলমণি বা নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রদের আর একজন কর্মচারী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে যে 'পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি'র কথা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে পরে তিনি নিজেই পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি মুশাবিদা করে জ্যোতিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিয়ে তখন তাঁকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

নানা কারণে তোমার পত্রের উত্তর লিখিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে। তোমার পুত্রের চক্ষু এক্ষণে কেমন আছে লিখিবে ও তোমার মধ্যমা কন্যা কেমন আছে লিখিবে।

পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি মুশাবিদা করিয়া পাঠাইলাম। যত শীঘ্র হয় পাঠাইবে। ইহা তোমার মহাজনেরা না দেখিলে নালিশ স্থগিত থাকিবে না। প্রেমচাঁদ আঢ্যের পুত্র এজন্য আমার কাছে আসিয়া ছিলেন। নীলমণি আমাকে না বলিয়াই মুড়াগাছা চলিয়া গিয়াছে। রামময় যে কাগজ চাহিয়া ছিলেন, তাহা তুমি পাঠাও নাই। এজন্য রামময়কে মুড়াগাছায় পাঠান হয় নাই।

কৈলাস তোমার জমি লইল না। কৈলাস এক্ষণে দেশে নাই। কাশী গিয়াছেন। জমি লইবেন না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কীর্তি এক্ষণে তোমার নামে নালিশ করিতে চাহিতেছেন। মিয়াদ অতীত হইল বলিয়াই নালিশ করা। একখানা খত্ লিখিয়া দিলে বা ঐ জমি তাঁহাকে বন্ধক লিখিয়া দিলে বোধ করি স্থগিত রাখিতে পারেন। তুমি যদি বল যে আমি পিতার উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে কিছুই পাই নাই, এ জন্য তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নই। তাহার উত্তর এই যে, ঐ ভূমিটুকু তুমি উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পাইয়াছ। অতএব তাঁহার ঋণের জন্য বিক্রীত হইতে পারিবে। ডিক্রি হইবে। আমার বিবেচনায় ঐ জমি কীর্তির নিকট বন্ধক রাখিলেই ভাল হয়। কীর্তি বোধ করি তোমাকে পত্র লিখিয়াছে। কিরূপ উত্তর দাও আমাকে লিখিবে। ইতি—তাং ২৯ ডিসেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠির কৈলাস হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর কীর্তি হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভাইপো। কীর্তিবাবু ভাগলপুর কোর্টের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন।

জ্যোতিশচন্দ্র কাকার মুশাবিদা অনুযায়ী পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন আবার জ্যোতিশচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

তোমার প্রেরিত আমমোক্তার নামা ও কাগজপত্র পাইলাম। নীলমণিকে আমি বিষয় বিক্রয়ের কথা বলিয়া দিয়াছি এবং সেও দর আনিবে বলিয়া গিয়াছে। তোমার হিস্যার দেবত্রের টাকা সে আমাকে দিয়াছে। ব্রহ্মত্রের কিছু দেয় নাই। তাহার জন্য তাহাকে তাগিদ লিখিলাম। টাকা পাইলে তাহা হইতে কীর্তিকে কিছু সুদ পাঠাইব। একথা কীর্তিকে লিখিলাম।

পরম্পরায় শ্রুত হইলাম তুমি সেখানে দেনা করিতেছ। ইহা কদাচ করিবে না, তাহা হইলে চাকরি থাকিবে না। চাকরি না থাকিলে তোমাদিগের খাইবার আর উপায় নাই। আমার পরমায়ু ফুরাইয়াছে—সে ভরসা আর করিও না।

আমি এমনও শুনিয়াছি যে, তোমার এই দেনা করার জন্যই সাহেব তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব আর দেনা করিবে না। যাহা করিয়াছ, তাহা সত্বরেই পরিশোধ করিবে। বেতন হইতে পরিশোধ না করিতে পার, কত টাকা অকুলান পড়ে, তাহা লিখিবে। তোমার ব্রহ্মত্রের

টাকা আসিলে তাহা হইতে উহা পাঠাইব। কেননা চাকরি রক্ষা করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। নচেৎ অন্ন জুটিবে না।

একশত টাকা বেতনে অনায়াসে চলা উচিত। ইহাতে যে চলে না, ইহা তোমার দোষ ভিন্ন নহে।

তোমার জন্য চাউল পাঠাইতে নীলমণিকে লিখিয়াছি। ইতি—তাং ২৯ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের মুশাবিদা করা সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি বা আমমোক্তার নামাটি ছিল এই—

মহামহিম…

লিখিতং শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া পঃ হাবিলিশহর, পোষ্ট ও সাবরেজিস্ট্রারি নৈহাটি, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারি ২৪ পরগণা কস্য মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিশনের অধীন মুড়াগাছা ও অন্যান্য পরগণার মধ্যে আমার লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর জমি যাহা আমার পিতামহ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার খুড়ি মৃত দিগম্বরী দেবীর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল করত পরে আপন স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে দান করিয়াছেন, ঐ সম্পত্তি সমুদয় আমি অবিবাদে এ যাবৎ ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমার ঋণ পরিশোধার্থে উহা বিক্রয় করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আমি কার্যোপলক্ষে বিদেশে থাকা হেতু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিক্রয়ের কার্য সমাধা করিতে না পারা প্রযুক্ত আমার আমমোক্তার নিযুক্ত করা আবশ্যক। এজন্য জেলা ২৪ পরগণা, সাবরেজিস্ট্রারি নৈহাটি, স্টেশন নৈহাটির অধীন কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী আমার খুল্লতাত, হাল শহর পটলডাঙ্গা ৫ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের গলি নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আপন আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার …আমার পক্ষ হইতে উপযুক্ত লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর ভুমি সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে খরিদ্দার ঠিক করিয়া খরিদ্দারদিগের সহিত দর ধার্য করত বিক্রয়মূল্য গ্রহণান্তর বিক্রয় কোবলা লেখাপড়া করিয়া আমার নাম দস্তখত ও আপন নাম ব-কলম দস্তখত করিয়া রেজিস্ট্রারি জন্য এলাকাধীন রেজিস্ট্রারি আপিসে

দলিল দাখিল ও সভায় জবাব ও···ইত্যাদি ওয়ারিশ গ্রহণ ও দলিলাদি ওয়ারিশ এবং রেজিস্ট্রারি জন্য যে কোন কার্য আবশ্যক হইবেক তাহা ও ফিস্ আদি দাখিল প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবেন তাহা আমার স্থির কৃতের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর, এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি—

জ্যোতিশচন্দ্র তাঁকে লেখা কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিগুলি যেমন যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলেন, তেমনি সেগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আমমোক্তার নামার মুশাবিদাটিও রেখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উদ্যোগী হয়ে জ্যোতিশচন্দ্রের কিছু জমি জায়গা বিক্রি করে সেই টাকার সঙ্গে নিজেও কিছু দিয়ে তাঁকে ঋণমুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতায় নিজের বাড়িতে সপরিবারে বাস করছেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী জ্যোতিশচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন--

বাবা, কাল তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, কাঁটালপাড়ায় যাইব। সকল বিবেচনা করিয়া বলি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম আজ আপিস বন্ধ।

আজ তোমার সেজকাকা আপিসে যাইবেন। সেই সমস্ত বেলা শরৎ একা থাকিবে। এই জন্য আমি আজ যাইতে পারিলাম না। তুমি কিছু মনে করিও না।

এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিত নহে। তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। তোমরা সকলে কেমন আছ লিখিবে। ১ বৈশাখ

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

এই চিঠির শরৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী। শরৎকুমারী দেবী তখন বিবাহিতা হলেও ঐ সময় তাঁর বাবা-মার কাছে ছিলেন। তাঁর স্বামী রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর কর্মস্থল মেদিনীপুর শহরে ছিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী যে ১লা বৈশাখ তারিখে কাঁটালপাড়ায় যাবেন বলেছিলেন তার কারণ, সেখানে ১লা বৈশাখ তাঁদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের গোষ্ঠযাত্রা উৎসব হয়।

রাধাবল্লভ এইদিন মন্দির ছেড়ে কাঁটালপাড়া গ্রাম পরিক্রমা করেন। পুরোহিত রাধাবল্লভ বিগ্রহকে নিয়ে গ্রাম ঘুরে মন্দিরেরই অদূরে গোষ্ঠঘরে এসে সেখানে তাঁকে রাখেন। গোষ্ঠঘরে একটা বেশ বড় গোলাকার বাঁধান জায়গা—যার নাম গোষ্ঠপিঁড়ি—তার উপর সিংহাসনে রাধাবল্লভ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকেন। গোষ্ঠঘরের সামনেই ছোট মাঠের মত অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ঐদিন এই ফাঁকা জায়গায় একটা ছোটখাট মেলা বসে। বিকালে ঐ গোষ্ঠ-ঘরেই রাধাবল্লভকে 'বৈকালী' অর্থাৎ বিকালের ভোগ দেওয়া হয়। এই ভোগে সাধারণত তখনকার গ্রীষ্মকালীন সব রকমের ফল ও মিষ্টান্ন থাকে।

পরে ঐ সব ভোগের ফল ও মিষ্টান্ন সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় রাধাবল্লভ মন্দিরে ফিরে যান।

রাধাবল্লভের এই গোষ্ঠযাত্রা উৎসব আজও আছে। তবে রাধাবল্লভের গ্রাম প্রদক্ষিণটা কমে পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং গোষ্ঠপিঁড়িটা বর্তমান থাকলেও গোষ্ঠঘরটি আজ আর নেই। এছাড়া ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান সবই এখনও চলে আসছে।

রাধাবল্লভের এইরূপ বার মাসে তের পার্বণ হলেও, তাঁর রথযাত্রা উৎসবই হল সব চেয়ে সেরা। এই রথের সময়ও রাধাবল্লভ মন্দির ছেড়ে নিকটস্থ গুঞ্জবাড়িতে গিয়ে আট দিন থাকেন এবং সেখানেই তাঁর ভোগের ব্যবস্থা হয়। ঐ আট দিনের প্রতি দিন তিনি এক এক বেশে, যেমন—কালীয় দমন, গোষ্ঠবিহার প্রভৃতি রূপে বিরাজ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দক্ষিণে গোষ্ঠপিঁড়ি ও গুঞ্জঘরের সামনে যে ফাঁকা জায়গা সেখানে এখনও প্রতি বছর রথের সময় আট দিন বেশ জাঁকজমকের মেলা হয়। এই রথের উৎসব সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন—

'বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি স্টেশন হইতে তাঁহার বাড়ি যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে। খুব জাঁকালো নিত্য ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। রাধাবল্লভের বার মাসে তের পার্বণ। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের বেশ বড়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটি খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়। মেলা আট দিন হয়।

...রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি। একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। ...রথের সময়...পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন।...

এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা। চারিদিক খোলা। গুটি-কতক চোকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে।...এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই-এক দিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জমজমাট থাকিত।'—নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২

এখন রথে জাঁকজমকের মেলা হলেও যাত্রা আর হয় না। পাঁচচালা

ঘরটির জায়গায় এখন একটি ছোট পাকা গুঞ্জঘর হয়েছে। কিন্তু আটচালাটির আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই। আর বর্তমানে রাধাবল্লভের ভোগের চালের বরাদ্দ কমে গেলেও সেদিনের তুলনায় এখনকার দুর্মূল্যের জন্য বাজার খরচের বরাদ্দ কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইয়ে মিলে বাড়িতে পিতাকে দিয়ে যেমন একটি বড় শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ে ছিলেন, তেমনি মায়ের নামে এই রথও করে ছিলেন। মায়ের নামে রথ করায় এই হয়েছিল যে, সিধা রথ ও উল্টোরথ উভয় দিনেই মা আগে রথের রশি স্পর্শ করে দিতেন। তারপরে সাধারণে রথ টান্‌ত। রথের দীর্ঘ রশি অন্তঃপুরে বাড়ির ভিতরে চলে যেত, সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মা রথের রশি স্পর্শ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির কোন বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা রশি স্পর্শ করে দিতেন। ঐ প্রথা আজও চলে আসছে। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র সুনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বাণী দেবী রথের রশি স্পর্শ করে দেন। সুনন্দনবাবুর মৃত্যু হওয়ায় রথের উৎসবের দেখাশুনা করেন তাঁর দুই ছোট ভাই সুনির্মলবাবু ও সুবঙ্কিমবাবু।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু চিঠিপত্রে রাধাবল্লভের উল্লেখ আছে। রাধাবল্লভের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। কিরূপ ভক্তি ছিল, এখানে ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠি উদ্ধৃত করে তার উদাহরণ দিচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

আগামীকাল বুধবার খোকার অন্নপ্রাশন হইবে। তোমার আসা হইবে না ইহাতে দুঃখিত আছি। সম্প্রতি একটা ভুল হইয়াছে। ৺রাধাবল্লভ ঠাকুরের প্রণামী অগ্রে দেওয়া উচিত। তাহা মধ্যমবাবুর মারফৎ আমার পাঠান উচিৎ ছিল। ভুলক্রমে তাহা হয় নাই। এক্ষণে তুমি···ঠাকুরকে কল্য দুই প্রহরের মধ্যে প্রণামী দিবে। মেজবাবু যখন যাইবেন তাঁহার মারফৎ ঐ টাকা আমি পাঠাইব। ইতি—তাং ১৩ কার্তিক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির খোকা হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র, আর মধ্যমবাবু বা মেজবাবু হলেন সঞ্জীবচন্দ্র।

সঞ্জীবচন্দ্র ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে, তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে জ্যোতিশচন্দ্রকে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত করেছিলেন, সে কথা আগে বলেছি। এবার সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ ঋণ সংক্রান্তই একটা অন্য কথা বলছি—

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালে একবার তাঁর এক পাওনাদার পাওনা আদায়ের জন্য কোর্টে নালিশ করে ডিক্রি পান। ডিক্রি পেয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ি ঘর ক্রোক করার ব্যবস্থা করেন। সঞ্জীবচন্দ্র তখন বিভ্রান্ত হয়ে ভাইদের কা'কেও কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে যান।

জ্যোতিশকে লেখা ঐ সময়কার দুটি চিঠি—একটি পূর্ণচন্দ্রের ও একটি বঙ্কিমচন্দ্রের—পাওয়া গেছে। সেই চিঠি দুটি এই—

প্রাণাধিকেষু,

গতকল্য তোমার পিতার পত্র পাইয়া বড় ব্যস্ত হইয়াছি। লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নামে দস্তক বাহির হইয়াছে। সেজন্য তিনি কাঁটালপাড়া হইতে গিয়াছেন। কি অবস্থাতে গিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত কে গিয়াছেন ও কোথায় গিয়াছেন, তাহা অতি সত্বর লিখিবা। কেননা আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি জানিবা।

এই পত্রের উত্তর পোষ্ট কার্ডে কদাচ লিখিবা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বুধবার

প্রিয়তমেষু,

তোমার পিতাকে আসিতে লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার পত্র পাইতেছেন না। ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

অত ভীত হইও না। দ্বার খুলিয়া রাখিও—পিয়াদা অন্দরে যাইতে যায়, আগে স্ত্রীলোকদিগকে সরাইয়া দিও। ইতি—তাং ২৭ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর জাল প্রতাপচাঁদ, কণ্ঠমালা প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাপারে জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিগুলিতে অবশ্য কিছু কিছু অন্য কথাও আছে। যাই হোক, সেই চিঠিগুলি এই—

প্রিয়তমেষু,

নীলমণির দ্বারা জমি বিক্রয় না হওয়ায় রামময় ভট্টাচার্যকে তিন টাকা খরচ দিয়া মুড়াগাছায় পাঠাইয়া ছিলাম। তিনিও কিছু করিতে পারেন নাই। তবে পৌষ মাঘ মাসে পুনর্বার গিয়া কিছু করিতে পারেন, এমন ভরসা দিয়াছেন। এইমাত্র। মহাজনেরা ততদিন থাকে কদাচ। চেষ্টা করিব।

ভুবন সাহার ৪০ টাকা ১২ আনার মধ্যে ছোটবাবু দশ টাকা মাত্র স্বীকার করেন। তাগাদা পাঠাইয়াছেন। আমিও ঐ টাকা ভুবন সাহাদিগকে দিয়াছি। এক্ষণে তাহাদের ১৩ টাকা ১২ আনা মাত্র বাকি রহিল।

তোমার অন্দর মহল কতক কতক মেরামত করিয়াছি। জল আর পড়ে না।

জাল প্রতাপচাঁদ যদি গুরুদাস চাটুয্যাকে না দেওয়া যায়, তবে উহা আউট অব্ ডিমাণ্ড হইয়া যাইবে। কেন না, তুমি যে টাকা খরচ করাইয়া উহা ছাপাইতে পার, এমন সম্ভাবনা নাই। আমারও সাধ্য নাই যে উহা খরচ দিয়া ছাপাই।

তুইশত টাকা খরচ করিয়া কণ্ঠমালা ছাপাইয়া ছিলাম, তাহার এক পয়সা পাই নাই। অতএব গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য বিবেচনা করিলাম। নইলে উহা আউট অব্ ডিমাণ্ড হইবে। গুরুদাস ৬০ টাকার বেশী কিছুতেই দিতে স্বীকৃত হইল না। এজন্য ষাট টাকাতেই এক এডিশন দিয়াছি। টাকা পাইয়াছি এবং তোমার অন্যান্য টাকা আমার হাতে যাহা আসিয়াছিল, তাহার জমা খরচ নিম্নে লিখিতেছি—

জমা—		খরচ—
মুড়াগাছার খাজনা		ভুবন সাহা—২০৲
মাঃ নীলমণি—	২৮৲	রামময়কে মুড়াগাছায়
ঐ বাবত আমার উপর বরাত—	২৫৲	পাঠানো খরচ—৩৲
মাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—	৬০৲	তোমাকে পাঠাইয়াছি—২৫৲
		রাজকুমার পাল—৫৭৲
	১১৩ টাকা	
		১০৫ টাকা

বাকি ৮ টাকা মজুত আছে। উহা কেদারবাবু ও বামা গোয়ালাকে সুধের বাবত দিব। উহাদের সাবেক ও হাল কত পাওনা লিখিবে।

রাজকুমার পাল এখনও ২০ টাকা হাল বাবত পাইবে। তাহাকে আপাতত আমাকে দিতে হইবে।

তোমার বাড়ি মেরামত নিজ খরচে করিয়াছি।...

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার জমি কীর্তি লইবেন না। সারদা লইতে চাহেন। দুই শত টাকা মূল্য দিতে চাহেন। উহা অতি অল্প বলিয়া আমি কোন উত্তর দিই নাই।

কণ্ঠমালা তোমার কথামত ৪ আনা মূল্যে বেচিয়াছি। ৭৩৫ কপি ছিল ১৮৩ টাকা ১২ আনা মূল্য। আমার খরচা বাদে বোধ করি ৫০ টাকা তোমার পাওনা হইবে। হিসাব ঠিক করিয়া তোমাকে লিখিব। টাকা তোমাকে পাঠাইব কি এখানে থাকিবে লিখিও।

আমার কাছে তোমার যে টাকা ছিল, তাহার মধ্যে ছয় টাকা বিপিন মোকদ্দমা খরচা জন্ম লইয়াছে। ইতি—তাং ১৩ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠির কীর্তি হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভাইপো, সে কথা আগে বলেছি। সারদা ছিলেন কীর্তিবাবুর আপন কাকা। ইনিও বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের মত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কণ্ঠমালা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ছোট আকারের উপন্যাস। এর আসল দাম ছিল চার আনার বেশী।

কল্যাণবরেষু,

তোমার কন্যার বিবাহে যে খরচ হইয়াছে, তাহার তোমরা কাঁটালপাড়ায় যে হিসাব করিয়াছিলে, তাহা সমস্তই ভুল। এখানে ঠিক করিয়া হিসাব করায় দেখা গেল ৭০৫ টাকা সাড়ে পাঁচ আনা খরচ হইয়াছে। হিসাব আমার কাছে আছে। যখন এ দিকে আসিবে, দেখিয়া যাইতে পার। না আস, তবে উমাচরণকে লিখিলে সে তোমাকে নকল পাঠাইয়া দিবে।

এই ৭০৫ টাকা সাড়ে পাঁচ আনার মধ্যে আশীর্বাদী ফেরৎ জমা... টাকা বাদ যাইবে। বাকি থাকে ৬৭৯ টাকা সাড়ে দশ আনা অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ আনা কম ৬৮০ টাকা।

উহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে—

মাঃ ছোটবাবু—	৫০৲
মাঃ শিবগোপালবাবু	১৫০৲
মাঃ নিজ—	২০০৲
	৪০০ টাকা

খরচ—	৬৮০৲
জমা—	৪০০৲
বাকি	২৮০ টাকা

এই ২৮০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা শিবগোপাল দিবেন ভরসা করি। বাকি টাকার জন্য যে উপায় করিয়াছি, তাহা আজিকার ডাকে যে বহি পাঠাইলাম তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

ঐ বহিখানির একচেটিয়া লইবার জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আপাতত দুই শত টাকা মাত্র দিয়াছেন। বাকি টাকা বই বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃ দিবেন। সে এখন দুই বৎসর আড়াই বৎসরের কথা।

বই ছাপাইতে ১১×৪=৪৪ টাকা খরচ পড়িয়াছে। আর কাগজেরও ঐ মূল্য অর্থাৎ চুয়াল্লিশ টাকা পড়িয়াছে। ৪৪+৪৪=৮৮ টাকা আমি ঐ দুইশত টাকা হইতে দিয়াছি। বাকি ১১২ টাকা তোমার কন্যার বিবাহের বাজার দেনা শোধ দিতেছি। ২৮০ টাকার ভিতর ঐ ১১২ টাকা বাদ গিয়া থাকিবে ১৬৮ টাকা। শিবগোপাল ৫০ টাকা দিলে বাকি থাকিবে ১১৮ টাকা। তাহা এক্ষণে আমি বাজার দেনা রাখিব। কিন্তু বেশী দিন পারিব না।

ঐ পুস্তক সমস্ত বিক্রয় হইলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার হিসাব দিতেছি।

ছাপা হইয়াছে—১০০০ কপি

বাদ প্রেস কপি— ১

গবর্ণমেণ্ট—১

দপ্তরীর কাছে কম ছিল

হওয়া সম্ভব—৩

যতীশবাবু—১
চন্দ্রনাথবাবু—১
নিজ—১
ছোটবাবু—১
হিন্দু পেট্রিয়ট ফর রিভিউ—১
যতীশকে বিতরণ জন্য
পাঠান যাইবে—৫
নিজ বিতরণ জন্য
রাখিব—১

১৬

বাকি—৯৮৪ কপি
মূল্য বার আনা হিসাবে—৭৩৮ টাকা
বাদ কমিশন ২৫ টাকা হিসাবে ১৮৪॥

৫৫৩॥
আদায়—৩৫৩॥

ইহার মধ্য হইতে লইব বাঁধাই খরচ ১৩০ টাকা। বাকি ২২৩ টাকা আট আনার মধ্যে বিবাহের খরচ যাহা বাজার দেনা আছে, তাহা কাটিয়া লইব। যদি শিবগোপাল আর কিছু না দেয় তাহা হইলে তুমি ২২৩॥ – ১৬৮=৫৫॥ অর্থাৎ ৫৫॥ টাকা মাত্র পাইবে। ইহার ভিতরে কিছু এড্ভারটাইজমেণ্ট খরচ যাইবে। বাকি যাহা কিছু থাকিবে, তাহা বোধ হয় পাইতে তিন বৎসর।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখানে যে বইটির হিসাব দেওয়া আছে, সেই বইটি হল—সঞ্জীবনী সুধা। 'সঞ্জীবনী সুধা'য় আছে—সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ও পালামৌ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ছোট জীবনী।

এই চিঠিগুলি থেকে তখনকার দিনে বই ছাপানোর ব্যয় অর্থাৎ কাগজের দাম, ছাপানোর খরচ, দপ্তরী খরচ কিরূপ ছিল, তার একটা পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায়। আর বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ হিসাবী-মানুষ ছিলেন তাও জানা যায়।

জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা এই সব চিঠি ইত্যাদি জ্যোতিশচন্দ্র সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। কাঁটালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হলে এগুলি তাঁর পুত্র শতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেখানে দান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যেই কিছু চিঠি ইত্যাদি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা গেল। এর মধ্যে কয়েকটা চিঠি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই অপ্রকাশিত। এখনও বেশ কিছু চিঠি অপ্রকাশিত থেকে গেল। তার কারণ, একই বিষয়ের উপর প্রায় একই ধরণের অনেকগুলি করে চিঠি থাকায়, সেগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটা করে নিয়ে এখানে দিয়েছি। জ্যোতিশের চাকরি, কন্যার বিয়ে, জমি বিক্রয়, ঋণশোধ প্রভৃতি নিয়ে আরও চিঠি আছে। সেগুলি থেকে বেছে আরও কিছু চিঠি এই বইয়ের শেষে 'পরিশিষ্টে' দিয়েছি। সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটা অপ্রকাশিত চিঠিও ঐ সঙ্গে পরিশিষ্টে দিয়েছি।

পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাংলায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পারিবারিক চিঠিগুলি ছাড়া বাংলায় লেখা তাঁর আরও গোটাকয়েক চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলি তিনি লিখেছিলেন, বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সাহিত্য সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রবাহ-সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে। এগুলি সবই আগে কোন না কোন পত্রিকায় অথবা বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, কুমার (পরে রাজা) বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালের ২৩শে শ্রাবণের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায়। এটি হিন্দু সমাজ নিয়ে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি। এখানে সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব

আশীর্বাদভাজনেষু—

আপনি আমাকে যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন

হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার ও লোকাচার বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই—ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের ধর্ম। বাঙ্গলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী-সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে। প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জন দিয়াছে, এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (রিলিজিয়াস অ্যাণ্ড মরাল রিজিনিরেশন) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই

সৌভাগ্য। কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ, উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে, 'আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে।' অন্যে একথা বলিলে তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয়, তখন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র (স্কটসম্যান) বলিয়া ছিলেন যে ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত 'এপিক' কাব্যের 'এপিসোড' গুলির সহিত তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছিলেন যে সফোক্লেস প্রণীত এন্টিগণ চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী-চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়া ছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি—১৯ পৌষ ১৩০০ [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির 'সম্মান' হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের সি. আই. ই. উপাধি লাভ।

ভূদেববাবুকে একবার লিখেছিলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

তিনকড়িবাবুর নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুস্তক ধর্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ-পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জিনে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব।...

আর একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে ষ্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং অনুরুদ্ধ না হইয়াও পাড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তকগুলি যেরূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে; ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি এক রকম বাঁধান এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং আবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল, তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।

গীতা পুনশ্চ 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতেছে। যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তবে আমরা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয় দেখিতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূদেববাবুর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি শ্রদ্ধার উদাহরণ দিচ্ছি—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদের জন্য পরিষদের উদ্যোক্তারা বঙ্কিম-চন্দ্রের কাছে অনুরোধ নিয়ে গেলে, তিনি তখন তাঁদের বলেছিলেন—ভূদেববাবু বেঁচে থাকতে ঐ পদে সভাপতি হওয়া তাঁর শোভা পায় না।

হুগলিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় ভূদেববাবুর বাড়ির নিকটেই বাসা ভাড়া করে থাকতেন। ঐ সময় ভূদেববাবুর পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলে, ভূদেববাবুর অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র মুকুন্দদেববাবুকে এজলাসে নিজের কাছে বসিয়ে কাজ শিখিয়েছিলেন।

মুকুন্দদেববাবুর কন্যা লেখিকা অনুরূপা দেবীর যখন বিয়ে হয়, তখন ভূদেববাবু এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই জীবিত ছিলেন। অনুরূপা দেবীর বিয়ের একটা চিঠি দেখেছি। সে চিঠি ছাপা হয়েছিল ভূদেববাবুর নামেই। ভূদেববাবু তখন পৌত্রীর বিবাহে বঙ্কিমচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করতে ভোলেন নি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজেদের বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবেই বিবেচনা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে রাজকৃষ্ণ রায় একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। ইনি কবিতা, উপন্যাস, প্রহসন, নাটক—সব মিলিয়ে প্রায় ৭০ খানি গ্রন্থ রচনা

করেছিলেন। ইনি সংস্কৃত মহাভারতকে সহজ বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড হিসাবে প্রকাশ করতে থাকলে, তখন ঐ অনুবাদ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় এঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটি আগে একবার রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনীতে প্রকাশিত হলেও অনেকেরই অজানা। তাই ঐ চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের তুইখানি অনুবাদ আছে। (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে। উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোক শিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল—ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোক শিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য অতি গুরুতর। আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি—তাং ৭ আগষ্ট ১৮৮৮

কারও রচনা ভাল দেখলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় প্রাণ খুলে যে তাঁর প্রশংসা করতেন, এটা তার একটা বড় উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখার যেমন প্রশংসা করেছিলেন, তেমনি রাজকৃষ্ণবাবুর সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় তাঁর সহকারী এবং তাঁর বীণা প্রেসের তদারককারী কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যেরও শুধু লেখার প্রশংসাই নয়, নানা ভাবে তাঁর উপকারও করেছিলেন। এই স্বর্গত নবকৃষ্ণবাবুর একটি ডায়রি তাঁর পুত্র গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে আছে দেখেছি। ঐ ডায়রিতে দেখেছি, এক জায়গায় নবকৃষ্ণবাবু একাগ্রভাবে প্রার্থনা করে লিখে গেছেন— বঙ্কিমবাবুর উপকার যেন জীবনে বিস্মৃত না হই।

বঙ্কিমচন্দ্র নবকৃষ্ণবাবুকে কয়েকটা ছোট ছোট চিঠি লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর নবকৃষ্ণবাবুর এতটা শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি ঐ চিঠিগুলি একটা বড় খামের মধ্যে রেখে খামের উপরে ভক্তি ভরে লিখে রেখে গেছেন—শ্রীশ্রীবঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষর।

কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নবকৃষ্ণবাবুর পরিচয় হয় এবং কি কি ভাবেই বা তিনি দরিদ্র নবকৃষ্ণবাবুর উপকার করেছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে নবকৃষ্ণবাবু তাঁর ডায়রিতে সে সব কথা লিখে গেছেন। তা থেকেই এখানে কিছু বলছি—

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক হিসাবে সামনে রেখে 'প্রচার' পত্রিকা বার করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে নবকৃষ্ণবাবু এক খণ্ড কিনে পড়েন। পড়ে কয়েক জায়গায় ভুল (সম্ভবত ছাপাখানার) দেখে সেগুলির নীচে দাগ দিয়ে রাখেন।

পূর্বোক্ত রাজকৃষ্ণ রায় একদিন নবকৃষ্ণবাবুর বাসায় এসে ঐ দাগ দেওয়া 'প্রচার' পত্রিকাখানি দেখে, সেটি নিয়ে যান। নিয়ে সম্পাদক রাখালবাবুকে দেখান। রাখালবাবু আবার সেটি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন জামাতাকে বলেন—এমন লোকটিকে কাছে কাছে আমার রাখতে চাই। তুমি কি তাঁকে নিয়ে আসতে পারো?

এরপর রাখালবাবু একদিন নবকৃষ্ণবাবুকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নবকৃষ্ণবাবুর পরিচয় নিয়ে তাঁকে দৌহিত্রদের অর্থাৎ রাখালবাবুর পুত্রদের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'বীণা' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত না। তাই নবকৃষ্ণবাবু ঐ পত্রিকার ও প্রেসের কাজ ছেড়ে দিলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে প্রচারের কাজে এবং নিজের পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করা, কপি তৈরি করা প্রভৃতি কাজেও নিয়োগ করলেন। নবকৃষ্ণবাবুও নিজের চরিত্রগুণে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

নবকৃষ্ণবাবুর কবিতার বই 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' প্রকাশিত হলে, সেটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভাল লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন টেক্স্‌ট বুক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাই তিনি বইটিকে স্কুলপাঠ্য করে চালাবার জন্য চেষ্টা করেন। কমিটিতে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আপত্তি তুললেও বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি বইটি স্কুলপাঠ্য হিসাবে পাস হয়। এই বইটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নবকৃষ্ণবাবুকে একটি অভিমতও লিখে দিয়েছিলেন। সেই লেখাটি এই—

তোমার প্রণীত 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' দেখিয়া প্রীত হইলাম। কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে 'প্রীত হইলাম' বলা সার্থক হয় না। এখনকার শিশুরা রুসিয়ার পিটর বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে। কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে। যাঁহারা বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্বাচন করেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষতি বোধ করেন না। না করুন, কিন্তু রামায়ণে যে উচ্চ নীতি আছে, তাহার শিক্ষায় যে বালকেরা বঞ্চিত হয়, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। ভরসা তোমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে সে অভাব মোচন হইবে। ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে। ইতি—তাং ২৪শে জানুয়ারি ১৮৯১

এইখানেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি শেষ হয়নি। যাতে রামায়ণখানি প্রেসিডেন্সী ডিভিসনে আপার প্রাইমারী স্কুলসমূহে পাঠ্য হয়, তিনি তারও চেষ্টা করেছিলেন। রামায়ণটির ভাষা সম্বন্ধে তিনি নবকৃষ্ণবাবুকে উপদেশ দিয়েছিলেন—কঠিন কথাগুলো পাল্টে দিও। বলো তো না হয় আমিই করে দিই—নিজেও তো তুমি করতে পারো।

নবকৃষ্ণবাবু বইটির পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্দেশ পালন করেছিলেন।

নবকৃষ্ণবাবুর এই বইয়ের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, নবকৃষ্ণবাবুর চাকরির ব্যাপারেও একবার তাঁকে একটি পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই লেখাটি এই—

Certified that I have known Babu Navakrishna Bhattacharya for many years, that he has a fair knowledge in English and Sanskrit, that he is intelligent and industrious, and of excellent moral character.

Bankim Chandra Chatterji

Calcutta

The 18th July 1891

নবকৃষ্ণবাবু চাকরি পেলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্রব ছেড়ে চাকরি করতে যান নি।

বঙ্কিমচন্দ্র নবকৃষ্ণবাবুকে কিরূপ স্নেহ এবং সাহায্যও করতেন, এখানে তার আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের

এনট্রান্স পরীক্ষার বাঙলা সিলেবাস বইখানি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন নবকৃষ্ণবাবুকে নিজের সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বইটি ছাপা শেষ হলে, নবকৃষ্ণবাবু তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথামতই তিনি আবেদনপত্রটি লিখেছিলেন। আবেদনপত্র পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরদিনই লিখে দেন—

Certified that Babu Navakrishna Bhattacharya has done his work carefully and satisfactorily. The sanctioned remuneration may be paid to him.

23rd January, 1893

Bankim Chandra Chatterji

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত পুস্তকগুলিতে ব্যাকরণের ভুল কোথাও কোথাও আছে—এ কথা কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকে শোনাতেন। এ কথা শুনেও সে সব সংশোধনের আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। তবে একদিন এক পণ্ডিতের কথায় উত্ত্যক্ত হয়ে নবকৃষ্ণবাবুকে বলেছিলেন—আর তো আমি পারিনে নবকৃষ্ণ। দেখে শুনে তুমি না হয় একটা ভুলের তালিকা তৈরি করে ফেল। কতগুলো ভুল করে বসেছি—সেগুলো আমি দেখতে চাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশে নবকৃষ্ণবাবু কতকগুলো ভুলের একটা তালিকাও তখন তৈরি করেছিলেন।

এই ভুল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরক্ত করার একটা কাহিনী আমি জানি। সেই কাহিনীটি এখানে বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসে একটি গানে লিখেছেন—'কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।'

একবার এক ব্যক্তি এই লাইনটির কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন—এটা আপনি কেমন করে লিখলেন? মৃণালে কণ্টক নেই। পদ্মের ডাঁটাকে মৃণাল বলে না। নাল বলে। মৃণাল মাটির ভিতরে থাকে।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র মৃদু হেসে তাঁকে বলেছিলেন—মৃণালে কাঁটা থাক, আর

নাই থাক, এবং সেটা কাদার ভিতরেই থাক বা কাদার উপরেই থাক, আমি মৃণালই বলবো। গানের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারবো না। লোকেও বোঝে আমি কোন্ অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেছি।

লোকটি বললেন—তবে আপনার মত অপরেও কি ভুল লিখবে?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—দোষ কি? দাশু রায় গেয়েছেন—

ষড়রিপু হ'লো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।

তাতে তাঁর কি এসে গেছে।

এর পর লোকটি আর কোন উত্তর করলেন না।

(কোদণ্ড মানে ধনু, দাশু রায় করেছেন কোদাল।)

বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকটি যাই বলুন, বিভিন্ন বাংলা অভিধানে কিন্তু দেখা যায়, মৃণাল মানে নাল, আবার নাল মানেও মৃণাল। অর্থাৎ মৃণাল ও নাল, একই করে এদের অর্থ—পদ্মের ডাঁটা বলা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ইহলোকান্তের বদলে পরলোকান্তে থাকায় এটাকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল বলে উল্লেখ করে গেছেন।

পরলোকান্তের বদলে ইহলোকান্তে হওয়াই ঠিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে জানতেন না, তা বলা যায় না। হয়ত এমনও হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উইলে ঐ ভাষাই প্রচলিত ছিল। তাই বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র সেটা জেনে উইলের ক্ষেত্রে ঐ শব্দই ব্যবহার করে গেছেন। আজকাল উইলে সাধারণত দেহান্তে বা মৃত্যুর পরে লেখা হয়। তবে এখনও কোন কোন উইল লেখক পরলোকান্তেও লেখেন। এঁদের মতে, পরলোকান্তের অর্থ পরলোকান্তরিত হওয়ার পর। কোর্টে উইল লেখকদের কাছে খোঁজ নিয়েই আমি একথা বললাম।

'প্রচার' পত্রিকা ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় নবকৃষ্ণবাবুর বহু কবিতা ছাপা হয়। প্রচার বন্ধ হবে শুনে নবকৃষ্ণবাবু তখন বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোকুলে যেমন বিরহ জেগেছিল তেমনি প্রচারের বিরহ-বেদনাকে ধরে রাখবার জন্য নবকৃষ্ণবাবু রূপকের সাহায্যে 'শেষ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের খুবই ভাল লেগেছিল। তাই

তিনি প্রচারে সেটি ছাপবার জন্য জামাতাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। প্রচারের শেষ সংখ্যায় এই 'শেষ' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির আরম্ভ ছিল এইরূপ—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন
(আর) গাহে না পাখি, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাটি পড়ে নবকৃষ্ণবাবুকে বলেছিলেন—তোমার 'শেষ' কবিতাটি বেশ হয়েছে নবকৃষ্ণ। কিন্তু একটা ব্যাকরণ ভুল আছে—গুঞ্জরণ নয় গুঞ্জন।

এবার নবকৃষ্ণবাবুকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ছোট চিঠিগুলি উদ্ধৃত করছি—

কল্যাণবরেষু,

জগদ্ধাত্রী পূজার পর তোমার আসার পক্ষে কোন আপত্তি নাই। ইতি—তাং ৪ কার্তিক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তাহা হইলে বইখানি ছাপান হইবে না। ছেলেদের পরীক্ষা ২রা ডিসেম্বর। যদি এখন না আসিতে পার, তবে আমাকে স্পষ্ট লিখিবে। ইতি—তাং ৪ নভেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবকৃষ্ণবাবুর বাড়ি ছিল, হাওড়া জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত নারিট গ্রামে। তিনি কলকাতায় গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। পূজার সময় বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তখন কলকাতায় ফিরতে পারছিলেন না।

কল্যাণবরেষু,

আজ বিকালে সিধুর বিবাহের আশীর্বাদ হইবে। তুমি উপস্থিত থাকিও। ৪টার সময়ে আশীর্বাদ। রাত্রে আহারাদি করিয়া যাইবে। ইতি—১৫ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সিধু হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর পুত্র। এঁর ভাল নাম দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের

প্রথমেই। পাত্রী পরমা সুন্দরী—উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজেন্দ্রমোহনের (মিশ্রীবাবুর) কন্যা।

কল্যাণবরেষু,

কোন কারণে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। তুমি অদ্য মধ্যাহ্নে এখানে ভোজন করিতে পারিবে কি ? ইতি—তাং

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রদের দেশের বাড়িতে গৃহদেবতা রাধাবল্লভের রথ হয়। এই রথযাত্রা উপলক্ষেই কলকাতার বাড়িতে একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কল্যাণবরেষু,

কালি ছাপাখানা খোলা। সকালে পাঁড়ে প্রুফ আনিতে যাইবে কখন যাইবে বলিয়া দিও। ইতি—শনিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঁড়ে অর্থাৎ শিবরতন পাঁড়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িব দরওয়ান।

কল্যাণবরেষু,

দুই ফর্মা ঝড়-বৃষ্টির জন্য তোমার কাছে পাঠাইতে পারি নাই। তৃতীয় ফর্মা রাত্রিতে না পাইয়া সকালে পাইয়াছিলাম বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। চতুর্থ ফর্মার প্রুফ পাঠাইলাম। ইতি—তাং ৩০মে

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

কল্যাণবরেষু,

অদ্য মধ্যাহ্নে এ বাটীতে আসিয়া ভোজন করিবে। ইতি—তাং ৯ আগষ্ট

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

আমি প্রাতে বাড়ি থাকিব না। তুমিই এই দুইটা ফর্মা অর্ডার দিবে। দুটি প্রুফ ও কাগজ ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিবে। ইতি—তাং ২৬ সেপ্টেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

প্রুফগুলি দেখিয়া দিবে এবং কপিটুকু পড়িয়া দিবে। সোমবার প্রাতে পাইলেও চলিবে। ২৪ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের চিঠি দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে, নবকৃষ্ণবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বই-এর শুধু প্রুফ সংশোধনই করতেন না, তিনি প্রিণ্ট অর্ডারও দিতেন। এমন কি কপিও দেখে দিতেন। শেষের আগের চিঠিটিতে যে হুটুর কথা আছে, তিনি ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর ভাল নাম—পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁর প্রিয় দৌহিত্ররাও নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন।

নবকৃষ্ণবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঘনিষ্টভাবে অনেকদিন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষর আছে দেখলে সামান্য অপ্রয়োজনীয় টুকরো কাগজও তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন। এমনি একটা টুকরো কাগজ সংগ্রহ করে, সেটির সম্বন্ধে নবকৃষ্ণবাবু তাঁর ডায়রিতে লিখে গেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল! তা তাঁর 'কৃষ্ণচরিতে' ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে স্টেটস্ম্যান পত্রিকার অফিস থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটা বিল আসে। সেই বিলের অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে রেখেছিলেন—'ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় জগদীশ্বরায় নমঃ।'

নবকৃষ্ণবাবুর ডায়রি এবং তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিগুলি আজও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই ডায়রি এবং চিঠিগুলি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের আরও মধুর, দরদী, পরোপকারী ও ধার্মিক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যত চিঠি লিখেছিলেন তার সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার। শরৎচন্দ্রের চিঠির সংখ্যা হাজার খানেক। সেই হিসাবে যত দূর জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি মাত্র তিন শ'র মত। এই তিন শ'র মধ্যে প্রায় অর্ধেক হবে তাঁর নিজের বাড়ির লোকদের কাছে লেখা। বাকিগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালে সাহিত্যের প্রধানতম দিকপাল হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা তাঁর চিঠির সংখ্যা এই যে এত কম, তার কারণ, প্রথমত—তাঁর বন্ধু সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

দ্বিতীয়ত—তিনি সহজে বড় একটা কা'কেও পাত্তা দিতেন না।

তৃতীয়ত—তিনি অত্যন্ত রাশভারি প্রকৃতির মানুষ (কারও কারও মতে অহঙ্কারী বা দাম্ভিক) ছিলেন বলে লোকেও সহজে তাঁর কাছে যেতে সাহস করতেন না।

দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু ও জগদীশনাথ রায় এইরূপ মাত্র কয়েকজন ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি যে সহজে কা'কেও বড় একটা পাত্তা দিতেন না বলেছি, সে সম্পর্কে দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পরে যারপর নাই স্নেহ করলেও প্রথমে কিন্তু তাঁকে সমাদর করেন নি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'জীবন-স্মৃতিতে' লিখে গেছেন—'একবার হাওড়ায় যখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে, বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।'

রবীন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র যদি অন্তত কিছুটাও সমাদরের সহিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতেন, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবার সময়, অযাচিতভাবে যাওয়ার জন্য এবং নিজেকে নিতান্ত অর্বাচীন ভেবে, রবীন্দ্রনাথের মনে যে লজ্জা বোধ হয়েছিল, তা আর তাঁর

মনেই আসত না। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যথাসাধ্য চেষ্টাও করতে হয়েছিল।

(২) রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। এঁর সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক লিখেছেন। অথচ এই অক্ষয়বাবুই প্রথম সাক্ষাতের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই প্রয়োজনে একটা কাজ করতে গিয়েও আদৌ পাত্তা পান নি। এ সম্পর্কে অক্ষয়বাবুর নিজের লেখাটাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

"৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সাব রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন। আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ি দেখিয়া শুনিয়া, একটি ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম, জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটা ঠিকা চাকরকেও রাখিয়া দিলাম। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যের গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুতরাং, কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে এই সকল কার্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন। শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র, বি এল পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ি দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল। আমরা তিনজন ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম। বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম। বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া গাড়ি করিয়া তিনি বাসায় গেলেন। আমি গাড়ি করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। হায়রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে এখনও বুক ফাটে। এ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না। অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা কটাক্ষ হইল না।

...কাছারির ফেরতা পিতাপুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা অসুবিধা কত

দূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু 'আসুন' বলিয়া পিতাকে সম্বর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল পিতাকে আসুনের সম্বোধনে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল। বঙ্কিম-বাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল। আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুএক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না …[illegible] সার হল মোর, মাছ ধরা হল না।"—বঙ্কিম প্রসঙ্গ

(৩) দীনেশচন্দ্র সেন [illegible] 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' নামক আত্ম-জীবনীতে লিখে গেছেন—তিনি একবার তাঁর দেশ কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি যাওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুর লেখা একটি পরিচয় পত্রও সঙ্গে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরিচয় পত্রটি দেখেও দীনেশ বাবুকে আদৌ পাত্তা দেন নি। দীনেশবাবু লিখেছেন—'যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে কথা এড়াইয়া ধানাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন।…তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক, সুতরাং লাঙ্গল, ফাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কেউ অহঙ্কারী বা দাম্ভিক বলতেন বলেছি। ওঁদের লেখা থেকেই এ সম্পর্কেও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখানে শুধু একটার কথাই বলছি—

পূর্বোক্ত নবজীবন-সম্পাদক চুঁচুড়া-নিবাসী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়িতে একবার তাঁর বন্ধু হুগলী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কলকাতা হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি যান। সন্ধ্যার সময় এঁদের গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের সখ হ'লে একটা নৌকা ভাড়া করে চুঁচুড়ার কাছে গঙ্গায় বেড়াতে থাকেন। এই সময় নিকটে গঙ্গাবক্ষেই একটা নৌকার মাঝিরা রান্নাবান্না করার জন্য নৌকার খোলে শিলে নোড়া দিয়ে মশলা খেথো করছিল। এতে যে গুম্ গুম্ শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনে অক্ষয়বাবুদের দলের একজন বললেন—কোথা থেকে এই গুম্ গুম্ শব্দ আসছে বলতো?

সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকানাথ মিত্র বলে উঠলেন—ঐ তো চুঁচুড়ার ওপারে নৈহাটী কাঁটালপাড়া। কাঁটালপাড়ার চার ডেপুটি বুট পায়ে গ্যাট্ ম্যাট্ করে গঙ্গার ধারে হাঁটছেন। তারই ঐ শব্দ।

এই কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এঁদের মতে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, তাঁর অপর তিন ভ্রাতাও দাম্ভিক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতারা যখন সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেন, তখন সরকারের শাসন বিভাগে শিক্ষিত বাঙালীর সর্বোচ্চ চাকরি ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা শাসকের চাকরি তখন ইংরাজ ভিন্ন কোন বাঙালী পেতেন না। পরে প্রথম বাঙালী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি এস। বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন বলেও বটে, আর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেও বটে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তাঁর অপর ভাইদের গর্ব হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইদের কথাই বা বলি কেন, তাঁদের পিতা যাদবচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তো বটেই, অপর পুত্রদের জন্যও গর্ব বোধ করতেন। অবশ্য তিনি নিজেও সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায়, বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রথম যে চারজন ভারতীয়কে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাদবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। বিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'নায়ক' পত্রিকার একটা পুরাতন সংখ্যায় পড়েছিলাম, পাঁচকড়িবাবু যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'দক্ষিণ বঙ্গে রায়-বাহাদুর বলিতে একমাত্র যাদব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেই বোঝায়।'

যাদবচন্দ্রের পুত্র-গর্বের একটা গল্প এখানে বলছি—যাদবচন্দ্র তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সেই সময় একবার তিনি কলকাতায় যাওয়ার জন্য বাড়ির নিকটেই নৈহাটী স্টেশনে এসেছেন। ট্রেন এলে একটা কামরায় যাত্রী কম দেখে সেইটায় উঠতে যাবেন কি, এমন সময় ভিতর থেকে একজন ভদ্রবেশী তরুণ বাধা দিয়ে বললেন—এটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের স্পেশাল কামরা। এটায় উঠবেন না।

যাদবচন্দ্র এই শুনে একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—এটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের। তা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বাবাদের কামরা কোন্‌টা বল তো বাবা! তা হলে সেইটায় গিয়ে উঠি।

এই সময় অপর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাদবচন্দ্রকে চিনতে পেরে, সাদরে তাঁকে নিজেদের কামরায় তুলে নিলেন।

গাড়িতে উঠে যাদবচন্দ্র সকলকে বললেন—বঙ্কিমের সঙ্গে তোমাদের কারও পরিচয় থাকলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বাবাদের কামরা যে বলেছি, এ কথা তাকে বলো না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কেন সহজে লোককে পাত্তা দিতেন না, এ সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলতেন—চাকরিতে এক তো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তার উপর প্রতিদিন রাত্রি ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত পড়ি ও লিখি। আমার সময় কোথায় যে লোকের সঙ্গে বসে গল্প করবো? লোককে আমল দিলে, এত লোক আসতে থাকবে যে, আমি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাব না। তার চেয়ে লোকে আমাকে অহঙ্কারী বলে বলুক।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যত চিঠি সংগ্রহ করতে পেরেছি, বা চিঠির হদিস করতে পেরেছি, সেগুলিকে আমি চারটি ভাগে ভাগ করেছি। যথা—বাংলা চিঠি, ইংরাজী চিঠি, পত্রাংশ ও লুপ্ত পত্র। কারও কারও লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন পুরা চিঠি না পেয়ে চিঠির দু চার লাইন বা অংশ বিশেষ করে পেয়েছি। সেগুলি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে প্রসঙ্গ কথা দিয়ে, পত্রাংশ অধ্যায় করেছি। আর অনেকের লেখায় চিঠির অংশ বিশেষও নয়, শুধু কেন বা কি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বা অন্যকে চিঠি লিখেছিলেন তার উল্লেখ মাত্র পাচ্ছি। সে চিঠি আজ আর নেই। কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। এই উল্লেখিত অথচ না পাওয়া চিঠির কাহিনীগুলো নিয়ে করেছি লুপ্ত পত্র অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ইংরাজী চিঠির কথা এখন বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী চিঠির কথা যা জানা যায়, তারও সংখ্যা খুবই কম। বঙ্কিম জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters নামে একটা বই প্রকাশ করেন। তাতে সম্পাদকদ্বয় নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র ১৯টি ইংরাজী চিঠি ছেপেছেন। এই ১৯টির মধ্যে ১৩টি মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে

লেখা, বাকি ৬টির মধ্যে ৩টি কবি নবীন সেনকে, ২টি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে এবং ১টি জগদীশনাথ রায়কে লেখা।

এগুলি ছাড়া হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ৩টি ইংরাজী চিঠি আছে। গ্রন্থকার লিখেছেন—এগুলি রামদাস সেন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা। হেমেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বলে যে চিঠিটি ছেপেছেন, সেটি কিন্তু অক্ষয় সরকারকে লেখা নয়, সেটি নবীন সেনকে লেখা। নবীন সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাঁকে লেখা বলেই এই চিঠিটি ছেপে গেছেন। ব্রজেনবাবুরাও তাঁদের বইয়ে এটিকে নবীন সেনকে লেখা বলেই দিয়েছেন। তা ছাড়া, চিঠিটি পড়লেও বোঝা যাবে যে, এটি নবীন সেনকেই লেখা। চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

Chinsurah
July 15, '80

My dear Nati,

I have read through your delightful poem—and I was detaining it for the purpose of giving it a second perusal. As, however, the publication is being delayed, the second perusal may stand over till it is the property of the public,

The dedication of it would be an honour to any Bengali—and it is an honour which I certainly have done nothing to deserve. But as undeserved honours are the order of the day, I do not see why I should scruple to receive my share. So fire away, and glorify grandeur [? grandpa] to your heart's content.

I am afraid that History is not likely to make much progress. I have, however, got through a few chapters and also through a novel.—so to call it—but I have not the slightest idea when the latter will be ready for publication.

Trusting this will find you all serene,

I remain,
Yours affectionately,
Bankim Ch. Chatterji

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনকে নাতি বলে সম্বোধন করতেন। নবীনচন্দ্র তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্যটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র যখন চট্টগ্রামের কমিশনারের পার্শন্তাল অ্যাসিস্টান্ট, সেই সময় তিনি এই চট্টগ্রামে থাকাকালেই 'রঙ্গমতী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী 'রাঙ্গামাটি'। এরই নামানুসারে তিনি তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন 'রঙ্গমতী'। পাঁচ বৎসর পরে নবীনচন্দ্র মাদারিপুরে থাকার সময় তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির রচনা শেষ করেন। গ্রন্থটি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছিলেন। তাই তিনি কাব্যটির রচনা শেষ করে, এটি উৎসর্গ করলে বঙ্কিমচন্দ্র তাতে সম্মতি দেবেন কিনা জানতে চেয়ে ঐ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং পিতা ও মধ্যম ভ্রাতার উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় গিয়ে বাস করেছিলেন। রঙ্গমতীর পাণ্ডুলিপি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন চুঁচুড়া থেকে নবীনচন্দ্রকে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে জগদীশনাথ রায়কে লেখা যে চিঠিটি ছেপেছেন, সেটি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পুরা চিঠি নয়। একটি চিঠির অংশ বিশেষ। এঁরা এটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু চিঠিটির কোনও প্রসঙ্গ কথা দেননি।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে দুটি ইংরাজী চিঠি ছেপেছেন, সে দুটির সঙ্গেও লেখার হেতু বা প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। শুধু চিঠি দুটি ছেপে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুকে কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন, আর ভূদেববাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে কিরূপ স্নেহ করতেন, সে কথা আগে বলেছি। এখন এই চিঠির প্রসঙ্গেই একটা কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা বই যেমন ভূদেববাবুকে শ্রদ্ধা সহকারে উপহার দিতেন, ভূদেববাবুও তেমনি তাঁর রচিত বই বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার হিসাবে

পাঠিয়ে দিতেন। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বইটি প্রকাশিত হ'লে তখন তিনি ঐ বই একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডাকে এইজন্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় উড়িষ্যার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বইটি পেয়ে তখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কয়েকদিন ছাড়া পর পর দুটি চিঠি লিখে ছিলেন।

১৩৬৩ সালের শারদীয়া দৈনিক বসুমতীতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা বলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি বেশ ভাল করে ছাপা হয়েছে। সম্পাদক বলেছেন—এটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠির অনুবাদ। মূল চিঠিটি পাওয়া যায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পাবিবারিক গ্রন্থাগাবে। চিঠিটি বসুমতীতে এইভাবে ছাপা হয়েছে—

বহরমপুর, ২৭শে মার্চ ১৮৭২

প্রিয় মহাশয়,

আমার পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মত ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে সফলতা যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজী পত্রিকার জন্য আমি আপনাকে উপন্যাস, গল্প, নক্সা সরবরাহ করিতে পারি। আপনার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ও দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কবিতা পর্যন্ত সব কিছুই আমি চালাইতে পারি। লেখা হয়তো ভাল হইবে না, তবে আপনার জন্য আমি যথাসাধ্য করিব। উপন্যাস আমার নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া মনে হয়। কারণ মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত ঘটনাবলী ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য অখণ্ড মনোযোগের দরকার হয়।

পত্রিকাটি মাসিক হইলেই ভাল হয়। বর্ষার পূর্বে কলিকাতা যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইতি—

ভবদীয়

বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি

এই চিঠিটি কিন্তু আদৌ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা নয়। এটি মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা। এই চিঠিটি প্রথমে সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল টীকা সহ Bengal : Past and present-এ ছাপেন, পরে

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস. তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে সঞ্জীবাবুর বই থেকে উদ্ধৃত করেন। এঁদের বইয়ে প্রকাশিত ঐ ইংরাজী চিঠিটি হল এই—

Berhampore
March 27, '72

My dear Sir,

Many thanks for your kind offer of assistance in regard to my journal. Such a coadjutor as yourself would be invaluable, and if men like you took an interest in it, there can be no doubt that I shall succeed.

For the English Magazine, I can undertake to supply you with novels, tales, sketches and squibs. I can also take up political questions, as you wish. Malicious fortune has made me a sort of jack of all trades and I can turn up any kind of work, from transcendental metaphysics to verse-making. The quality of course you can't expect to be superior, but I will do all I can for you. The Novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.

I do not approve of Tara Prasad's suggestion that the Magazine should be a quarterly. I prefer monthly publication.

I don't think of going to Calcutta till the rains, or till at least it is a little cooler and railway travelling becomes possible. When I do go however I will make it a point to call upon you.

Hoping this will find you all serene, I am,

Yours truly,
Bankim Ch. Chatterji

দেখা যাচ্ছে বসুমতীতে শুধু চিঠি প্রাপকের নামেই ওলটপালট হয়নি, অনুবাদেও কিছু ভুল এবং ছাড় হয়েছে।

এই চিঠির তারাপ্রসাদ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু ও বঙ্গদর্শনের লেখক তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। মুখার্জীজ ম্যাগাজিন ঐ সময় মাসিকও ছিল না বা ত্রৈমাসিকও ছিল না। বছরে তখন ১০টি সংখ্যা প্রকাশিত হ'ত। এই পত্রিকার মালিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র দেব মানিক্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে গেলে ১৮৭৬-এর শেষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক বসুমতীর আর এক সালের শারদীয়ায় 'সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী' বলে ৬টি বাংলায় লেখা চিঠি ছাপা হয়েছে। এগুলি কিন্তু আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলায় লেখা চিঠি নয়। এগুলি তাঁর ইংরাজী চিঠিরই বাংলা অনুবাদ। আর এই ৬টি চিঠির মধ্যে ৫টি চিঠি এর আগে অন্তত দুটি বইয়ে Bengal : Past and present এবং সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters-এ টীকা সহ প্রকাশিত হয়েছে।

বাকি একটি চিঠি যা এই শারদীয়ায় ছাপা হয়েছে, সেটি অন্য কোথাও আগে প্রকাশিত হতে দেখিনি। তবে সেটিও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠিরই অনুবাদ করে ছাপা এবং চিঠির প্রথমাংশের অনুবাদটা অন্তত রীতিমতই ভুল অনুবাদ। কেন তা বলছি—

কলকাতার সাদার্ন এভিনিউয়ের বিড়লা মিউজিয়ামে একবার একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কয়েকটি চিঠির পাণ্ডুলিপিও প্রদর্শিত হয়েছিল। ঐ চিঠিগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি অতি ছিন্ন চিঠিও ছিল। আমি প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে ঐ চিঠি দুটি নকল করে এনেছিলাম। আমার ঐ নকল করা একটি চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, বসুমতীর চিঠিটি এরই অনুবাদ। বসুমতীতে চিঠিটি যা প্রকাশিত হয়েছে, তা এই—

৫ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, ২৬ মে

প্রিয় শম্ভুবাবু,

আপনার ১৮ তারিখের পত্রে আমাদের পারিবারিক বিপদে আপনি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার

ভ্রাতা এবং তারাপ্রসাদের (যাহাকে আমার ভ্রাতার ন্যায়ই ভালবাসিয়া আসিয়াছি) তাঁদের উদ্দেশে আপনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষেই সম্ভব।

আমার জীবনে উভয়েই গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। সাহিত্য-জননীর আমি যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে যতটুকু সফলতা অর্জন করিয়াছি, তাহাব মূলে তাঁহাদের স্পর্শ যে কতখানি ছিল তাহা বর্ণনাতীত। সেই সহযোগিতার গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। আমাদের এই শোকের দিনে আপনার ন্যায় খ্যাতনামা এবং হৃদয়ধর্মী বন্ধুর সমবেদনা লাভ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইলাম।

আপনার

বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী

আমি যে বলেছি, এই অনুবাদের প্রথমাংশে রীতিমত ভুল আছে, সেই ভুলটা এবার দেখাচ্ছি। মূল ইংরাজী চিঠির প্রথমাংশটা হল এই—

Accept my sincere acknowledgement for the sympathy and feeling with which you notice my recent domestic misfortune of the 18th instant. The......you pay to the memory of my deceased brother and of Taraprosad, whom I loved as a brother, is worthy of you. Their co-operation was most favourable...

এই ইংরাজী চিঠিতে যে ১৮ তারিখে পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা আছে, তা হ'ল, ঐ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুব কথা। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে। তাই ইংরাজী চিঠিতে 18th instant থাকায় বসুমতীর চিঠির মাথায় যে ২৬শে মে আছে, সেটা ২৬শে এপ্রিল হবে বলেই মনে হয়। আমার নকল করা চিঠিটায় দেখছি, কোন তারিখেরই উল্লেখ নেই। হয় চিঠিটা ছিন্ন হওয়ার জন্য তারিখ পাইনি, নয়তো তারিখটা তুলতে ভুলেছি বা এমন ভাবে প্রদর্শনীতে ছিল যাতে তারিখটা চাপা পড়েছিল। যাই হোক, বসুমতীর চিঠিতে যে আপনার ১৮ তারিখের পত্র আছে, তা সম্পূর্ণ ভুল।

আমি বিড়লা মিউজিয়ামের প্রদর্শনী থেকে আর একটা যে চিঠি নকল করে আনি, সেটা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে ছাপা হয়েছে। তবে মূল চিঠির নকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, সাহিত্য পরিষদের বইয়ে একটা বাক্যে একটু বদল হয়েছে। যেমন— সাহিত্য পরিষদের বইয়ে আছে—

I have had a relapse and am still unable to do my usual amount of work.

এই বাক্যটাই মূল চিঠিতে আছে—

I have had a relapse and am quite unable to do my usual amount of work.

ব্যক্তি বিশেষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটা ইংরাজী চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কলকাতার খিদিরপুরের বিখ্যাত দার্শনিক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা। এগুলি বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর 'বঙ্কিম-প্রতিভা' গ্রন্থে ছেপেছেন। এগুলি ঠিক ব্যক্তিগত চিঠি নয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যোগেন্দ্র বাবুর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধাকারে এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। এগুলির নাম দিয়েছিলেন—Letters on Hinduism।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও চারটি বিখ্যাত ইংরাজী চিঠির কথা জানা যায়। এই চিঠিগুলি কলকাতার জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউটের (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড হেষ্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধে লেখা। এই চিঠি চারটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ব্রজেনবাবু ও সজনীবাবু তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে এই চিঠি ছেপেছেন। এখানে হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ মসীযুদ্ধ বা চিঠি লেখার ইতিহাসটা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলছি—

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার শোভাবাজার রাজ-বাড়িতে ঐ বংশের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের তিন দিন পরে ২০শে সেপ্টেম্বর ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, রাজবাড়ির গৃহদেবতা গোপীনাথজীকে রূপার সিংহাসনে শ্রাদ্ধ সভায় রাখা হয়েছিল।

গোপীনাথজীকে এই শ্রাদ্ধসভায় রাখার কথা পড়েই মূলত রেভারেণ্ড হেষ্টি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ইত্যাদি নিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে ২২ সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যান পত্রিকায চিঠিপত্রের কলমে এক চিঠি প্রকাশ করেন। চিঠির হেডিং বা শিবোনাম দেন, 'The most striking Facts of the Shradh'। পরদিন অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান পত্রিকায় হেষ্টির আবার একটি চিঠি অর্থাৎ দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির হেডিং দেন, 'The supposed necessity of Idolatry'। এর তিন দিন পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর হেষ্টির আবার তৃতীয় চিঠি প্রকাশিত হ'ল। চিঠির নাম দিলেন— 'The Alleged Harmlessness of Idolatry।'

হেষ্টির দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশিত হওযাব পর ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে হেষ্টিব বিরুদ্ধে ও পক্ষে কয়েকটি চিঠি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় উডিষ্যাব কটক জেলার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি জাজপুর থেকে স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'The Modern St. Paul' নামে হেষ্টির চিঠিব বিরুদ্ধে একটি চিঠি দিলে, সেই চিঠি ৬ই অক্টোবব তারিখে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের নাম না দিয়ে 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে চিঠিটি লিখেছিলেন।

রামচন্দ্র অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি প্রকাশিত হওযাব পর দিনই ৭ই অক্টোবর তাবিখে এর উত্তরে হেষ্টিব চিঠি 'The Modern Ramchandra' প্রকাশিত হ'ল। এর আগে হেষ্টি তাঁর কোন প্রতিপক্ষের লেখাব কিন্তু উত্তর দেন নি। কযেক দিন পবে ১৪ই অক্টোবব 'The challenge Renewed' নামে হেষ্টির আর একটি চিঠি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

এবার রামচন্দ্রের দ্বিতীয় চিঠি 'European Versions of Hindu Doctrines' ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই পরদিন ১৭ই তারিখে হেষ্টিব 'রামচন্দ্র রেডিভিভাস' নামে আবার উত্তর প্রকাশিত হ'ল।

এর উত্তরে রামচন্দ্রের তৃতীয় চিঠি 'দি ইনটেলেকচুয়াল সুপিরিযারিটি অব ইউরোপ' প্রকাশিত হয় ২৮শে অক্টোবরের কাগজে। হেষ্টি আবার 'দি ইনটেলেকচুয়াল ইনফিরিয়ারিটি অব ইন্ডিয়া' নামে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এটি ৩০, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বরের স্টেটসম্যানে ছাপা হয়।

এই সময় ১৪ই নভেম্বর তারিখে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"দি রিসেণ্ট কনট্রোভারসি' নামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা কৃষ্ণমোহন এবং হেষ্টিও তাঁর শেষ চিঠি লেখার সময় জানতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, ২২শে নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ চিঠি অর্থাৎ ৪র্থ চিঠি 'দি রিসেণ্ট কনট্রোভারসি' নামে কৃষ্ণমোহনের চিঠির উত্তরে প্রকাশিত হ'ল এবং এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র আর রামচন্দ্র নাম না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী হিসাবেই চিঠির শেষে নাম সই করেছিলেন।

রেভারেণ্ড হেষ্টি বা কৃষ্ণমোহন আর উত্তর দিলেন না। এইভাবে এইখানেই এই মসীযুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

রেভারেণ্ড হেষ্টি ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মসীযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধের ফলে তখন একটা বড় সুফল হয়েছিল এই যে, বহু ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু স্বধর্মে দৃঢ় আস্থা ফিরে পেয়েছিলেন।

চন্দননগরের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্বিক হরিহর শেঠের কাছে একদিন শুনেছিলাম, তাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছোট ইংরাজী চিঠি আছে। তিনি একজনের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেন। সেদিন তিনি চিঠিটি দেখাতে পারেন নি।

শ্রীরামপুরের সাহিত্যিক অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় হরিহরবাবুর কাছ থেকে ঐ চিঠিটি নিয়ে তার একটি প্রতিলিপি নিজের কাছে রেখে দেন। অমিয়বাবু আমাকে ঐ প্রতিলিপিটি দিলেও,চিঠিটি কাকে লেখা বা কি প্রসঙ্গে লেখা তা কিছুই বলতে পারলেন না। হরিহরবাবুও আজ আর নেই। তিনি হয়তো জানতেন।

চিঠিটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে কলকাতার ৯২ নং বৌবাজার স্ট্রীট (বর্ত্তমান নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) থেকে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন এবং আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আলিপুরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ১৮৮২র জানুয়ারিতে। এর আগে তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হিসাবে চার মাস কলকাতায়, তার আগে আট মাস হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হাওড়ায় আসার আগে তিনি হুগলীতে একটানা

কয়েক বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিঠিটি বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী বেড়াতে যাওয়া নিয়েই, ওখানকার তাঁর পরিচিত কোন এক ভুবনবাবুকে লেখা। চিঠিটি এই—

92 Bow Bazar Street
May 31/82

My dear Bhuban Babu,

Excuse my not replying to you earlier. I do not know any thing about my going to Hooghly, though for aught I know the thing may happen.

Trusting you are all well.

I am yours loving
Bankim Ch. Chatterji

৭

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত ইংরাজী চিঠি কলকাতার কুন্তল মজুমদারের কাছে পেয়েছি। চিঠিটি কাকে লেখা এবং কি প্রসঙ্গেই বা লেখা সে সম্বন্ধে কুন্তলবাবু কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোন এক উকিলকে লেখা।

চিঠিটি কোথায় কিভাবে পেলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কুন্তলবাবু বললেন—আমার বাবা উকিল ছিলেন। তিনি সম্ভবত তাঁব কোন আইন ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকাবী হিসাবে আমি এটি পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি যে একজন আইন ব্যবসায়ীকে লেখা, চিঠিটি পড়লেই তা অনুমান করা যায়। আর চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যার কথা থাকায় তাঁর কন্যার সম্পর্কেই যে লেখা তাও বোঝা যায়। তবে কন্যার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কিন্তু নয়। যা নিয়ে চিঠিটি লেখা তার ইতিহাস অতি করুণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরিবাবের সকলেরই দুঃখ ও বেদনা এব সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এ সম্পর্কে যা জানি তা বলছি। তার আগে সমস্ত চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

5 Pratap Ch. Chatterji Lane
Jany. 5/'87

My dear Muralee Babu

I have been in Calcutta since the last few days and will see you shortly.

In the meantime I send you draft of a letter which I wish you to address to the grand-father-in-law of my deceased daughter, if you approve of it. Of course make such alterations as you consider necessary.

Yours Sincerely
Bankim Ch. Chatterji

এবার এ সম্পর্কে যা জানি তা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতার

বাঁশতলা গলির বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের মতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের সময় হয় মতীন্দ্রের পিতা জীবিত ছিলেন না, নয়ত পুত্রের বিয়ের অল্প দিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তবে মতীন্দ্রের পিতামহ দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

পিতৃহীন মতীন্দ্র বৃদ্ধ পিতামহকে গ্রাহ্য না করে বিয়ের পর থেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকে। ঐ সময় বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের দলে মিশে নটীদের সঙ্গে আলাপ জমায়। কোন কোন রাত্রে সে বাড়ি না ফিরে নটীর বাড়িতেই কাটাত।

উৎপলকুমারী এই নিয়ে তাঁর স্বামীকে বহু নিষেধ করেছেন, কান্নাকাটি করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

মতীন্দ্র শুধু দুশ্চরিত্রেরই ছিল না, সে আরও একটা ব্যাপারে সর্বদাই উৎপলকুমারীকে জ্বালাতন করে মারত। সে ব্যাপারটা হল এই—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর হাজার বার টাকার গহনা উৎপলকুমারীর কাছে জমা রেখেছিলেন। এ খবরটা মতীন্দ্র জানত। জেনে ঐ গহনাগুলোর উপর তার লোভ হয় এবং ঐগুলো পাওয়ার জন্য সর্বদাই স্ত্রীর উপর জুলুম করত। কিন্তু কিছুতেই গহনা আদায় হয় না দেখে, এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকেও বাধাহীন করবার জন্য, একবার উৎপলকুমারীর সামান্য অসুখ করলে, ওষুধের নাম করে তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এবং গলায় কাপড় বেঁধে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রেখে সকলকে জানায় উৎপলকুমারী আত্মহত্যা করেছে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে। পরদিন সকালে মতীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে উৎপলকুমারী আত্মহত্যা করেছে ব'লে সংবাদ পাঠায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় ছিলেন না। তিনি তখন সপরিবারে তাঁর কর্মস্থল মেদিনীপুর শহরে ছিলেন। কলকাতার বাড়িতে তাঁর ভৃত্য, দরোয়ান প্রভৃতি কয়জন ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃসংবাদ সঞ্জীবচন্দ্রকে জানাল। সঞ্জীবচন্দ্রও মতীন্দ্রের কথা বিশ্বাস করেই ঐ নিদারুণ সংবাদ নিয়ে তখনই মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলেন।

পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ সময়কার দুটি চিঠি এই—

প্রাণাধিকেষু,

হঠাৎ আমায় মেদিনীপুর আসিতে হইয়াছে। মতীন্দ্রর দুশ্চরিত্রের

বিষয় জানিয়া পলা দুই একবার সহ্য করিয়াছিল। শেষ বার সহ্য করিতে না পারিয়া পরশু রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং আমার এ সময়ে বঙ্কিমের নিকট দুই চারি দিন থাকা প্রয়োজন, তাহাই আসিয়াছি। এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে ফিরিয়া যাইব। তোমার বাটীর সংবাদ লিখিতে বিপিনকে লিখিয়া আসিয়াছি। আমি শেষ রাত্রে চলিয়া আসিয়াছি। কাহাকে কোন কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই।···

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য তোমার পত্র পাই নাই। মেদিনীপুরে আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা এখানে ফেরত আসিয়াছে। তোমার সেজকাকা আশ্চর্য মানসিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বোধ হয় আমি উপস্থিত থাকায়, শোক করিতে পারে নাই। তাহাই আমি সরিয়া আসিয়াছি। তোমার সেজ খুড়ির অবস্থা বড় মন্দ।··

উৎপলকুমারীকে তাঁর বাড়ির সকলেই পলা বলে ডাকতেন। এখানে প্রথম চিঠির বিপিন হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র। দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন মেদিনীপুরে গিয়েই, আর দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিলেন মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ফিরে এসে। জ্যোতিশচন্দ্র ঐ সময় নদীয়া জেলার মেহেরপুরে পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র যেমন পুত্রকে পলার মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিলেন, জ্যোতিশের স্ত্রীও তেমনি তখন জ্যোতিশকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে পলার মৃত্যু সংবাদ ইত্যাদি লিখেছিলেন। এঁর ঐ দীর্ঘ চিঠি থেকে পলার মৃত্যু সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যায়। চিঠিটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আজও আছে। ঐ চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'সেজকাকা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পলার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে জানিতে। তিনি শুক্রবারে গিয়াছেন। ঐদিন বাবা বাড়ি আসিয়াছেন। সেজকাকা আবার শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়াছেন। ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। পলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই। সে মরার পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া তাহাকে কাটিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পর উহার পেটের নাড়ী ও মাথার খুলি কাটিয়া হাসপাতালে লইয়া

যায়। তাহাতে ধরা পড়ে যে, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বিষ কিরূপে খাইল, কে আনিয়া দিল তদারক হয়। তাহাতে ধার্য হইয়াছে যে, উহাদের বাটীর নিকট কে বিনোদ ডাক্তার আছে, তাহার নিকট হইতে মতীন্দ্র বিষ লইয়া যায়। পরে ঔষধ বলিয়া পলাকে খাওয়াইয়া দেয়। পরে যখন দেখিল যে তাহার মৃত্যু উপস্থিত তখন ঐ বৃন্দাবনের কাপড় গলায় বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া দেয়। সেজখুড়ি ১২ হাজার টাকার গহনা পলার নিকট রাখিয়া যান। ঐ সকল গহনা মতীন্দ্র পলার নিকট হইতে চাহিত। সে তাহা দেয় নাই। তজ্জন্য মতীন্দ্র বলিয়াছিল যে, আমার পুত্র হয় নাই। আমি তো সেজবাবুর কিছুই পাইব না। অতএব ঐ সকল গহনা আমাকে দাও। পরে সে পলাকে গহনা দিতে নারাজ দেখিয়া ঐ বন্ধুর চাতুরিতায় পরে পলাকে বিষ খাওয়ায়।

পলা ও মতীন্দ্র মেদিনীপুরে যায়। পবে মতীন্দ্র সেখানে উহাদের বাসার নিকট গৃহস্থের বাড়ি কুচবিত্র দেখায়। ঐ জন্য সেজকাকা উহাকে বাসা হইতে বাহির করিয়া দেন। ঐ সঙ্গে পলাও চলিযা আসে।

কৃষ্ণ বাঁকুড়া হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছে। বাবা মেদিনীপুব হইতে যখন কলিকাতায় আসেন, তখন ঐ সকল গহনা বলাই দত্তেব নিকট রাখিয়া আসেন। ঐ চাবি আনিয়া যে কোথায় ফেলিয়াছেন, তাহা এ পর্যন্ত কোন মতে পাওয়া গেল না। তজ্জন্য যে বাবা কি যন্ত্রণা পাইতেছেন, তাহা বলিবার নহে।'

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, পিতাব শাসন না পাওয়ায় মতীন্দ্র একেবারে উৎসন্নে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র জামাতাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে, মতীন্দ্রের আদেশে নিরুপায় পলাকেও তার সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হতে হয়েছিল। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসেই মতীন্দ্র ঐ কাণ্ড করেছিল।

এই চিঠির কৃষ্ণ হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র। পলার মৃত্যু সংবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সকলেই খুব মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়েও বাড়ি এসেছিলেন।

চিঠিতে যে বলাই দত্তর কথা আছে, তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু। এঁর বাড়ি ছিল কলকাতায় বৌবাজারে দুর্গাচরণ পিতুরি লেনে। চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র পলার মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য কলকাতায় এলে, সেই সময় মতীন্দ্রর পিতামহ পলার নিকট জমাথাখা অলঙ্কারগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসায় ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন। বঙ্কিম-

চন্দ্র মেদিনীপুর যাবার সময় সেই সব অলঙ্কার নিয়ে যান। আবার সেইগুলি সঞ্জীবচন্দ্র চলে আসার সময় তাঁর হাতে পাঠিয়ে দেন।

জ্যোতিশের স্ত্রী জ্যোতিশকে লিখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছ মাসের ছুটি চেয়ে ছ মাসের ছুটি পেয়েছেন। কিন্তু তা নয়। ঐ সময়কার সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায়, কয়েকদিনের ক্যাজুয়াল লীভ্ ছাড়া তিনি ২৭শে ডিসেম্বর (১৮৮৭ খ্রীঃ) থেকে ৩ মাস ২০ দিন বিনা বেতনে ছুটি পেয়েছিলেন। বিনা বেতনে এইজন্য যে, এর আগের বছর অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মাস এবং ব্যক্তিগত কাজে ১৯শে নভেম্বর থেকে ৬ মাস সবেতন ছুটি নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নিয়ে সপরিবারে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। পলার মৃত্যু নিয়ে তখন কলকাতার করোণার কোর্টে বিচার হয়েছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রও আহূত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ভেবেছিলেন, মতীন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে, আদালতের বিচারে তাকে শাস্তি দেওয়াবেন। কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত মতীন্দ্রর প্রাণ রক্ষারই চেষ্টা করেছিলেন। ফলে বিচারে পলার আত্মহত্যাই সাব্যস্ত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য মুরলীবাবুকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটিতে পলার দাদাশ্বশুরের নামে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মুশাবিদা চিঠির কথা আছে, সেটি মনে হয় মতীন্দ্রের এই মামলা সংক্রান্তই। মতীন্দ্রের পিতামহের বিশেষ অনুরোধেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মুশাবিদাটি লিখেছিলেন।

এবার একটি অন্য কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি চিঠি লেখার তারিখ দিয়েছিলেন ৫ই জানুয়ারি ১৮৮৭। এটা তিনি ভুল করে ১৮৮৮র জায়গায় ১৮৮৭ লিখেছিলেন। চিঠির প্রাপক মুরলীবাবু চিঠির শেষ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের ৫।১।৮৮ তারিখের চিঠি ৬।১।৮৮ তারিখে পেলেন বলে লিখে রেখেছিলেন। তাছাড়া জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠি দুটিতে কোনও তারিখ না থাকলেও যেটি পোস্ট কার্ডে লেখা, তাতে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে জানা যায় ২০শে নভেম্বর ১৮৮৭। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ৫ই জানুয়ারির চিঠি হবে ১৮৮৮ সালের।

বঙ্কিমচন্দ্র এক তো কাকেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতেন না, তার উপর

ঐ সময় কন্যার মৃত্যুর জন্য মন মেজাজ খারাপ নিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। নতুন বছরে ৫ই জানুয়ারির আগে বোধ হয় কাকেও কোন চিঠি লেখেন নি। তাই আগের বছরে সারা বছর ধরে চিঠিপত্রে, মামলার রায়ে প্রভৃতিতে ১৮৮৭ লিখে লিখে, সেইটাই অভ্যাসবশত ৫ই জানুয়ারি লেখার সঙ্গে ১৮৮৮ না লিখে ১৮৮৭ লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির শেষ পৃষ্ঠায় চিঠিটি যে উৎপলকুমারী দেবী সংক্রান্ত এ কথাও মুরলীবাবু লিখে রেখেছিলেন।

কন্যার মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তখন অন্তত দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। (১) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বরাবরের যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তা এই সময় থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের যে কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়লেই জানা যায়। কোষ্ঠী বিচারের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাই তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে লিখেছেন, সীতারাম শ্রীকে বলছেন—

'তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন, মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না। কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু বড় সুন্দর বলিয়া আমার মা জিদ্ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়া ছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়িতে একজন দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতাঠাকুরকে শুনাইল। সেইদিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।

শ্রী—কেন?

সীতা—তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী—তাহা হইলে কি হয়?

সীতা—যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। (স্বাধ্বী মন্দস্য প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী)।'

বঙ্কিমচন্দ্র উৎপলকুমারীর বিয়ে দেবার সময় পাত্র-পাত্রী উভয়ের কোষ্ঠী নিজে তো বিচার করেছিলেনই, তাছাড়া ভাল জ্যোতিষীকে দিয়েও বিচার করিয়ে দেখেছিলেন, ঐ বিবাহ শুভ ও মঙ্গলময় হবে। কিন্তু তা না হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। কন্যার মৃত্যুর কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশকে এক চিঠিতে তাই প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপব কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহাব অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে উহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গৃহজামাতা করে বাড়িতে রেখেছিলেন এবং বাখালকে কাজে নিযুক্ত রাখবার জন্য তাঁকে সম্পাদক করে 'প্রচার' পত্রিকা বাব করেছিলেন। পরে বাখাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচাব বন্ধ করে দেন।

কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুব পর বঙ্কিমচন্দ্র আবাব প্রচার প্রকাশ কবেন এবং মনে কিছুটা শান্তি পাবার জন্য প্রচাবে পুনরায় গীতার আলোচনা শুরু করেন।

এই শান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তখন জানুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়াব বাড়িতে গিয়ে পিতার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রীতিমত খরচ করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তখন জ্যোতিশের স্ত্রী জ্যোতিশকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়ার ব্রাহ্মণ খাইয়াছে। সব সমেত দেড়শত ব্রাহ্মণ হইযাছিল। লুচি, ছোলার ডাল, কপি, বেগুন ভাজা, মিষ্টান্ন রসগোল্লা, ছানাবড়া, পান্তুয়া, গুড়ে সন্দেশ, ক্ষীর, বরফি, পাঁপর, ক্ষীর, দধি। ভাটপাড়াব বৈদিকগুলি সমস্তই খাওয়ানো হয়। তাহাদের ছানা ফল ফুলরি প্রভৃতি হয়।'

এই চিঠিতে যে ভাটপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণদের কেবল ছানা ও ফল খাওয়ানোর কথা আছে, তার কারণ, তখনকার দিনে বৈদিক ব্রাহ্মণরা নিজেদের অত্যন্ত গোঁড়া ও সাত্ত্বিক বিবেচনা করতেন বলে, রাঢ়ী শ্রেণীর

ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও ভাত, লুচি, এমন কি পাক করা হয়েছে বলে সন্দেশ, রসগোল্লাও খেতেন না। রাঢ়ীদের বাড়িতেও খেতে হলে এঁরা শুধু ছানা ও ফল খেতেন।

উৎপলকুমারীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদার একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। সেদিন কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুকে বলেছিলেন—'শ্রীশ, কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। সেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার আপন মেয়ে।'

এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত আলিপুর কোর্টের এক উকিল চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন—মশায়, আপনি যে সব বই লিখেছেন, তাতে দেশের কত মঙ্গল হবে!

তাঁকেও উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—ছাই লিখেছি। আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি। আর আমার অদৃষ্টেই, আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও জানতেন, উৎপলকুমারী স্বেচ্ছায় বিষ খায় নি। তাকে না জানিয়েই বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। তবুও যেহেতু আদালতের রায়ে বিষপানে মৃত্যু বলা হয়েছিল, সেইজন্য তিনিও সাধারণত লোকের কাছে কন্যার বিষপানে মৃত্যুর কথাই বলতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী সকলেই জানেন—গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্র দত্ত অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আনলে তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী পিতৃগৃহের দাসীপুত্র তারাচরণের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই কুন্দ বিধবা হয়ে নগেন্দ্রর বাড়িতে ফিরে আসে এবং উভয়ের মধ্যে ক্রমে ভালবাসা জন্মায়। এই দেখে নগেন্দ্রর স্ত্রী সূর্যমুখী অভিমানে তার স্বামীর সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঘটনাক্রমে সূর্যমুখী আবার বাড়ি ফিরে এলে, তখন কুন্দ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নিজের সৃষ্ট কুন্দনন্দিনীর পরিণতির সঙ্গে নিজের কন্যার ভাগ্যেরও কিছুটা মিল দেখে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন এইরূপ দুঃখ করতেন।

উৎপলকুমারীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী আরও বেশী মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। সেটা স্বাভাবিকই। তাই সঞ্জীবচন্দ্রও জ্যোতিশকে লিখেছিলেন—তোমার সেজ খুড়ির অবস্থা বড় মন্দ।

রাজলক্ষ্মী দেবী স্বামীর সঙ্গে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় চলে এসে স্থির করেন—কাঁটালপাড়ায় গিয়ে বাড়িতে থেকে কিছুদিন গৃহদেবতা রাধাবল্লভের সেবা করে কাটাবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এতে কোন আপত্তি না করে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বহু আপন জন থাকায় রাজলক্ষ্মী দেবীকে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে জ্যোতিশের স্ত্রী তখন জ্যোতিশকে চিঠি লিখে যা জানিয়েছিলেন, তা এই—

'সেজখুড়ি কলিকাতায় আসিয়াছেন। পিসিমা গিয়াছিলেন। চলিয়া আসিয়াছেন। সেজখুড়ি বুধবার দিন আসিবেন। তিনি নিজে দুই মাস থাকিয়া রাধাবল্লভের সেবা করিবেন।'

এই চিঠির 'পিসিমা' হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দিদি নন্দরানী দেবী। ইনি পৈতৃক বাস্তুভিটার নিকটেই পিতৃদত্ত বাড়িতে স্বামী ও পুত্রদের নিয়ে বাস করতেন।

গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী উভয়েরই গভীর আস্থা ছিল। তাই রাজলক্ষ্মী দেবী তখন রাধাবল্লভের সেবা করে হয়ত কিছুটা মানসিক শান্তিও লাভ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিগুলি পুরো পাওয়া যায়নি, কিন্তু সেগুলির অংশবিশেষ পাওয়া গেছে, এখন সেই পত্রাংশগুলি নিয়ে কিছু বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্র এঁকে নিজের ছোটভাইয়ের মত দেখতেন।

চন্দ্রনাথবাবুও নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর রচিত 'শকুন্তলা তত্ত্ব' নামক গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।' উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

'বঙ্কিম, তুমি আমাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাস বলিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিতেছি না। তোমার ভারত ভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি বলিয়াই এই গ্রন্থখানি তোমাকে উপহার দিলাম। ইহাতে তোমার ভারতের এবং আমাদের জগতের একখানি অনুপম রত্ন সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা বলিয়াছি।'

—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র স্নেহাস্পদ চন্দ্রনাথকে সময়ে সময়ে যে সব চিঠি লিখতেন, সে সব আজ আর পাওয়া যায় না। মাত্র একটি চিঠির কিয়দংশ চন্দ্রনাথবাবু তাঁর বঙ্কিম-বিষয়ক স্মৃতি-কথায় উদ্ধৃত করে গেছেন। সেই অংশটি এই—

'একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধাবল্লভের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা উল্লেখ করে চন্দ্রনাথবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন—'নবমী পূজার দিন প্রাতে গিয়াছি। সঞ্জীববাবু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন—তা হবে না, রাধাবল্লভকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বোস। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে খুবই ভালবাসিতেন। বলিতেন—উনি আমাদের বংশের সর্ব প্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন।

সব আত্মার রক্ষা করেন। রোগে, শোকে, বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি। উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।—এমন সরল ভাবে, এমন ভক্তিভরে রাধাবল্লভের কথা বলিতেন যে, শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত।'

বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। সেই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা তখন সফল হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টার কিছুদিন পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে 'শিক্ষার হেরফের' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু লোকেন পালিত ঐ সময় রাজসাহীর জেলা জজ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নিজেদের জমিদারী দেখাশুনা করতেন। জমিদারীতে গিয়ে তাঁর প্রিয় 'পদ্মা' বোটে করে ঘুরতে ঘুরতে রাজসাহী গিয়েছিলেন। রাজসাহীতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও থাকতেন। তিনি ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যামোদী ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পড়েছিলেন। পরে এই প্রবন্ধটি ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সাধনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পড়ে তখন রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি পাওয়া না গেলেও সেই চিঠির কিছু অংশ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অংশটি এই—

'বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। ঐ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়া ছিলাম। এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।—কিন্তু কেন যে তাঁহার ক্ষীণ স্বর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মত সভা, 'অসংখ্য বালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্য বলে' কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকরা সকলেই

অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি বা কর্ণভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণচ্ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা দেশীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করতে এবং আন্দোলন পরিচালনা করতেও পারতেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ইংরাজ গভর্নমেণ্ট সরকারী কর্মচারীদের এই অধিকার ক্রমশ হরণ করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় এবং মফঃস্বলে যখন কয়েকটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তখন সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান একরূপ নিষিদ্ধ হয়েই যায়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র সেখান থেকেই তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভার সদস্য হয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভা বিলাতে পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ন্যায় এখানে ইংরাজ সরকারের শাসন ব্যবস্থার আলোচনা করে দোষত্রুটি দেখিয়ে দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনেরও ইঙ্গিত দিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই (১২ ভাদ্র, ১২৮৩) কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাতে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে সভার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তখন সভার উদ্যোক্তাদের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই চিঠিটি সভায় পড়েছিলেন। চিঠির শেষাংশটুকু জানা গেছে। সেই অংশটা এই—

'ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।'—সাধারণী, শ্রাবণ ১২৮৩।

'সাধারণী' ছিল নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত আর একটি পত্রিকা।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দীনবন্ধু তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

অসেচনক শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ

একাত্মবরেষু।

সোদর সদৃশ বঙ্কিম !

তুমি আমাকে ভালবাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমাব 'নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী—বসন-ভূষণবিহীন—সুতরাং জন-সমাজে যদি নবীন তপস্বিনীর সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু নবীন তপস্বিনী সুরূপা হউন, আর কুরূপা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটি তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি—

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন বলে, বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সর্বদা দীনবন্ধুর পুত্রদের সংবাদ নিতেন এবং আবশ্যক হলে সৎ পরামর্শও দিতেন। তিনিই দীনবন্ধুর রচনাগুলি একত্র করে গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করবার জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদের পরামর্শ দেন এবং ঐ সময় দীনবন্ধুর একটি ছোট জীবনীও লিখে দেন। ঐ জীবনীটি দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ জীবনীটিকে পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাবার জন্য দীনবন্ধুর পুত্রদের বলেন এবং গ্রন্থের উপস্বত্বও প্রথম থেকেই তাঁদের দান করেন।

দীনবন্ধুর ঐ জীবনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মত দীনবন্ধুর পুত্ররা পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর ২য় সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদের একটা ইংরাজীতে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির আরম্ভ অংশের কিছুটা মাত্র পাওয়া গেছে। বাকি অংশটা পাওয়া যায় নি। চিঠির আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'I owe it to the memory of your father, that I should give a critical estimate of his writings.'

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর পুত্রদের এই লেখার কথা বিজ্ঞাপনে প্রচার করতেও

তখন বলেছিলেন। এবং এই চিঠির কথা অনুযায়ী 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' নামক প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ছিলেন—

'কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতিঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেই অসাধারণ মানুষ কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।'

কলকাতার এক জ্যোতিষী এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মুখাবয়ব দেখে, আর এক বার তাঁর হাতের রেখা দেখে গণনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দু বারই জ্যোতিষীর নির্ভুল গণনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দুখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি দুটির মধ্যে প্রথমটির মাত্র এক লাইন এবং দ্বিতীয়টির কয়েক লাইন, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করে গেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, কিন্তু হস্তাঙ্ক গণনায় তাঁর অবিশ্বাস, শচীশবাবুর এই মন্তব্য সহ উক্ত পত্রাংশ দুটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

'কলিকাতায় অবস্থান কালে মধ্য বয়সে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন তাঁহার শিক্ষাগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু হস্ত-গণনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদা তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বন্ধু সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সেক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন —'(You) succeeded to an extent which surprised me.'

তার কিছুকাল পরে জ্যোতিষী মহাশয় আহুত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স

সাতচল্লিশ বৎসর। জ্যোতিষী মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটি অপরিচিত ভদ্রলোক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোকদিগের পরিচয় তিনি পরে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা পুরুষ। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার বৈবাহিক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয় ললাট দেখিয়া গণনা করেন নাই। হস্তাঙ্ক দৃষ্টে গণনা করিয়াছিলেন। ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন—

'You (Jyotishi) were correct in what you said of me in regard to certain matters which I am certain are not known to any one but myself.

I state what happened once must not be understood as having yet proved any decided opinion on the subject of Palmistry. What I am convinced of is that you are possessed of either a science or certain powers of mind which I do not yet understand.

জ্যোতিষী গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তবু তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, হস্তরেখা দৃষ্টে ভাগ্য গণনা সম্ভবপর।'

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষ করে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বহু পড়াশুনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Sayings'-এ লিখে গেছেন—

'বরাহমিহির, খনা এবং অন্যান্য গ্রন্থপাঠ এবং ইংরাজী Napoleon, Laplace প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তিনি জ্যোতিষে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। নিজেই সব পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিখিয়া ফেলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে পড়েন।

একদিন ভৃত্য সংবাদ দিল, তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ির গাভীটি একটি কৃষ্ণবর্ণ বৎস প্রসব করিয়াছে। অমনি পঞ্জিকা খুলিয়া জন্ম-সময় ইত্যাদি দেখিয়া নিরূপণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার গণনায়

স্থির হইল যে, গৃহস্বামীর (সঞ্জীবের) খুবই অমঙ্গল হইবে। অবশ্য কি অমঙ্গল হইবে, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। অল্পদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃণালিনী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে জ্যোতিষ গণনার কথা লিখেছেন। এ সব ক্ষেত্রে তিনি জ্যোতিষের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই বলে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর অবশ্য কিছুদিন তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাসহীন হয়েছিলেন।

জ্যোতিষের উপর দীর্ঘকাল ধরে অগাধ আস্থা থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজন মত জ্যোতিষকে বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রনমিকে বিচারের সময়ও কাজে লাগাতেন। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় একবার এক মোকদ্দমায় বাদী বলে—অমুক দিন রাত্রে অমুক সময়ে আসামী লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে এবং প্রহার করে। রাত্রের পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় সে আসামীকে চিনতে পারে।

বাদীর অভিযোগের উত্তরে আসামী জানায়—হুজুর, ঐদিন শুধু রাত্রে কেন সমস্ত দিনে-রাতেই আমি বাড়িতে ছিলাম না। অভিযোগকারী আমাকে জব্দ করবার জন্য অহেতুক আমার নামে এই নালিশ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাদী এবং আসামী উভয়ের কথা শোনা ছাড়াও উভয়ের সাক্ষীদের কথা থেকেও বুঝেছিলেন—মামলাটি মিথ্যা মামলা। তবুও তিনি নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য এই মামলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়েও বিচার করেছিলেন।

বাদী যে সময়ের উল্লেখ করে বলেছিল, আসামী তাকে লাঠি মারলে সে চাঁদের আলোয় আসামীকে চিনতে পেরেছিল, সেই দিনটা কৃষ্ণপক্ষের অথবা শুক্লপক্ষের প্রায় মাঝামাঝিতে পড়ায় তখন আকাশে চাঁদ ওঠা সম্ভব কিনা, এটা বঙ্কিমচন্দ্র গণনা করে দেখেছিলেন। গণনায় তিনি দেখেন, তখন আকাশে চাঁদ উঠতেই পারে না। সে রাত্রে আরও কিছু পরে চাঁদ ওঠে। এই দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করে দেখেছিলেন, বাদীর কথা মিথ্যা।

ঐ সময় আলিপুর কোর্টে হেমেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক উকিল ছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মামলার রায় দেওয়ার আগে একদিন হেমেন্দ্রবাবুকে বলেন—আপনি তো অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।

অমুক দিন অমুক সময় আকাশে চাঁদ থাকা সম্ভব ছিল কিনা আমাকে জানাবেন তো।

হেমেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে একটা ঠিক করে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখালে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—না হেমেন্দ্রবাবু, ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। এখন আমার গণনাটা ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন!

হেমেন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গণনা দেখে নিজের ভুলটা ধরতে পারলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গণনাকেই ঠিক বা অ্যাকিউরেট বললেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মামলাটি মিথ্যা মামলা বলে আসামীকে বেকসুর খালাশ দিলে, বাদী ধনী ব্যক্তি থাকায় জেদের বসে আবার হাইকোর্টে আপীল করে এবং তখনকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবকে মামলা লড়বার জন্য নিয়োগ করে।

মামলার শুনানীর সময় জ্যাকসন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের উপর কটাক্ষ করে হেসে বিচারককে বলেছিলেন—এই মামলার বিচার হয়েছে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নয়, জ্যোতিষতত্ত্বের উপরে—নট অন লিগ্যাল এভিডেন্স, বাট অন অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ক্যালকুলেশন।

হাইকোর্টের জজ অবশ্য সকল দিক বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ই বহাল রেখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই অনেক সময় এইরূপ ছোটখাট মামলা ও চুরির কেস উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে সহজেই বিচার করতেন এবং চোরও ধরতেন। এ সম্পর্কে বহু কাহিনী আছে। এখানে শুধু প্রসঙ্গত একটা ঘটনা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৮৮৬র মে পর্যন্ত যশোহর জেলার ঝিনাইদহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাঝে অবশ্য অসুস্থতার জন্য একবার তিন মাস ছুটি নিয়ে ছিলেন।

এই ঝিনাইদহে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র একবার সেখানকার এক ব্যক্তির অনুরোধে তার বাগানের কলা-চোরকে ধরে দিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত চোর ধরার জন্য নিজেই ঘটনাস্থলে চলে যেতেন। এক্ষেত্রেও অভিযোগকারীর অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র তার কলাবাগানে প্রথমে যান। গিয়ে তিনি দেখলেন, যে কলার কাঁদি কেটেছে, সে নীচে থেকে বাঁ হাত দিয়ে কাটারির কোপ বসিয়ে কেটেছে।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই চুরির ব্যাপারে কোন লোককে তোমার সন্দেহ হয় কি ?

অভিযোগকারী একজনের নাম করলে, বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের ভিতরে এসে চৌকিদার দিয়ে সেই লোকটকে ডাকালেন। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেক মাতব্বর ব্যক্তিও সেখানে এসে গেলেন।

চৌকিদার লোকটিকে নিয়ে এলে, সে ন্যাটা কিনা বঙ্কিমচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি সকলের সামনে নিজেকে ন্যাটা বলেই স্বীকার করল।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র লোকটিকে বললেন—ওর কলার কাঁদি বাঁ হাতে কোপ দিয়ে কাটা। নিশ্চয় তুমিই ওর কলার কাঁদি নিয়ে এসেছ।

লোকটি প্রথমে থতমত খেয়ে একটু অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও শেষে সে-ই চুরি করেছে বলে স্বীকার করল।

বঙ্কিমচন্দ্র চুরির মাল আনিয়ে, মালিককে ফেরৎ দিইয়ে আসামীর সামান্য দণ্ড দিলেন। তারপর তাকে আর ঐরূপ চুরি না করার উপদেশ দিয়ে ফিরে এলেন।

এরপর থেকে ঐ অঞ্চলে এই ধরণের ছোটখাটো চুরি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

এখন আবার বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাংশের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্—

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করার অভিলাষ জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নবীনচন্দ্রের ঐ চিঠির উত্তরে তিনি তখন ১৫-৭-১৮৮০ তারিখে নবীনচন্দ্রকে যে ইংরাজী চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে প্রসঙ্গত বলেছিলেন, তিনি একটা উপন্যাস শুরু করেছেন।

নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন—'কি বিষয়ে নূতন নভেল (উপন্যাস) লিখিতেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি এবং বারবার যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম, এবারও লিখি যে, তিনি যেন দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভক্তি, প্রেম—যাহা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ—লইয়া নূতন উপন্যাস রচনা করেন। তিনি তদুত্তরে লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। এই নূতন উপন্যাসটি ঠিক রঙ্গমতীর পথে যাইতেছে।

...it follows exactly the lines of your Rangamati.

নবীনচন্দ্রের লেখা থেকে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটির মাত্র একটি ছোট বাক্য পাওয়া গেল।

এখানে একটি বাক্য হলেও, নবীনচন্দ্র তাঁর ঐ 'আমার জীবনে'ই অন্যত্র তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি দীর্ঘ ইংরাজী চিঠির বেশ অনেকটাই উদ্ধৃত করেছেন। এবার সে সম্বন্ধে বলছি—

নবীনচন্দ্র কাব্যাকারে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপনের মানসে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই তিনখানি কাব্যের প্রস্তাবনা লেখেন। রৈবতকের তিন সর্গ লিখে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে এক চিঠিতে তাঁর মনোভাব জানান।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের চিঠি পেয়ে রৈবতকের লেখা তিন সর্গ এবং প্রস্তাবনাটি দেখতে চান। তখন নবীনচন্দ্র ঐগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবীনচন্দ্রের এই লেখা দেখতে চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সে চিঠি আজ আর নেই। তবে নবীনচন্দ্রের লেখা পেয়ে কয়েক মাস পরে ১৮৮৩-র ১০ই জানুয়ারি তারিখে লেখাগুলি ফিরিয়ে দেবার সময় ঐ সঙ্গে নবীনচন্দ্রকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কটকের জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দীর্ঘ চিঠিটির কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে নবীনচন্দ্রের মন্তব্য সহ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পত্রাংশটির কিছুটা এখানে দিচ্ছি—

প্রথমে লেখেন you have planned a new 'Mahabharat' indeed—an excedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ। It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you excecute with the same grandeur as you have planned, you will perfectly justify your-self. Properly executed the poem of course take its rank as the greatest in the language.

I warn you, however not to be too confident of success of popularity. I cannot promise you much. If executed adequa-

tely, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century.

এরূপে কার্যটি বড় কঠিন বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে উহা আগাগোড়া লিখিতে নিষেধ করেন—

Blank verse is recognised as proper to Epic poetry in English—but it is certainly very unsuited to Bengali Epics. M. S. Dutta alone has been able to make something of it—but even his success has been achieved at a lamantable sacrifice of grammer, idiom and perspicuity. Even in English, it gives to even such a poem as the 'Paradise Lost' a weary uninformity which makes it a very dismal reading...If you continue the poem, my advice is that you should change the ছন্দ at every chapter, and let it generally be rhyme.

প্রথম তিন সর্গ ভিন্ন আর সমস্ত সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা আমারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার পর কাব্যের দীর্ঘতা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া লেখেন—এই বলে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দীর্ঘ চিঠির আবার কিছুটা উদ্ধৃত করেন।

এছাড়া নবীনচন্দ্র আরও লেখেন—'তাহার পর অভিমন্যুর মৃত্যু লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য লিখিতে নিষেধ করেন।' পত্রের উপসংহারে লেখেন বলেও নবীনচন্দ্র চিঠি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করেন।

নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উপদেশগুলি তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সে সব উপদেশ আর এখানে দিলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরাজী জানা বন্ধুদের, যেমন—মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে সাধারণত বাঙ্গলায় না লিখে ইংরাজীতেই চিঠি লিখতেন।

সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদার একবার বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিনের কথা প্রসঙ্গে শ্রীশবাবু লিখেছেন—'তারপর তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) ইংরাজী লেখার কথা হইল। বলিলেন, বরাবর বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।'

ইংরাজী সহজসাধ্য হবে ভেবেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরাজীতে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং Rajmohan's wife উপন্যাসটি লিখেছিলেন। পরে হয়ত মাইকেলের মত নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইংরাজী ছেড়ে মাতৃভাষাতেই সাহিত্যের সেবা করতে প্রবৃত্ত হন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে আদিপর্বে অর্থাৎ ছাত্রজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' বাঙ্গলায় অনেক কবিতা লিখে ছিলেন। এই সময় তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বেশ কিছুদিন কাব্যচর্চা করলেও পরে ঐ মাইকেল মধুসূদন দত্তর কারণেই এ পথ ত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বিখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখে গেছেন—

'সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্য রচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্য রচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিল। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত Essays and Letters : Bankim Chandra Chatterji নামক গ্রন্থে জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠির কিছুটা অংশ মুদ্রিত করেছেন। এঁরা এই পত্রাংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে ঐ চিঠির অংশটুকু উদ্ধৃত করলেও বঙ্কিমচন্দ্র কেন বা কি প্রসঙ্গে চিঠিটি লিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। অথচ শচীশবাবু তাঁর বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চিঠিটি লেখার হেতু এবং তিনি কেনই বা তাঁর বইয়ে ঐ পত্রাংশটি উদ্ধৃত করেছেন, যে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছেন। এখানে শচীশবাবুর মন্তব্যসহ সেই পত্রাংশটি উদ্ধৃত করছি। শচীশবাবু লিখেছেন—

'মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিতাও লিখিতে হইত। সেটা ইচ্ছাপূর্বক নয়—দায়ে পড়িয়া। একবার কলেজ রি-ইউনিয়ন মিলন সভায় পাঠোপযোগী একটি কবিতা লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনুরোধ করিয়াছিলেন জগদীশবাবু।... বঙ্কিমচন্দ্র তখন মালদহে। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, জানাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধৃত করিবার আরও একটু কারণ আছে—বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে লিখিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পত্রখানি শেষ করিয়াছিলেন। উপদেশটুকু মূল্যবান। পত্রখানি ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল। আমি অনুবাদ না করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

Malda
The 30th December

My dear Jagadish,

You write that you would be glad, if I sent something for the Re-union. As I would do anything to make you glad, I immediately got down to write a poem for you. I received your note on the evening of the 28th, the post having been

accidentally delayed for a few hours, I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning...

If I send it by to-morrow post you won't get it in time. So I think I must give up the idea of contributing to your pleasure.

But it strikes me that it may be some compensation to you for this and contretemps of khani had an opportunity of reading his unfinished novel before the assembled friends at the Re-union. And I therefore post back his manuscript to-day. Khani must, in my opinion chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetoric and ornament. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should rewrite his book with reference to these remarks...

Yours affly

Bankim Chandra Chatterji

এই চিঠির খনি হলেন জগদীশবাবুর পুত্র খগেন্দ্রনাথ রায়। তিনিও কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে কলেজ রি-ইউনিয়নের সভায় যোগ দিতেন।

শচীশবাবুর বই থেকে জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে পত্রাংশটি এখানে উদ্ধৃত করলাম, এই পত্রাংশেরও আবার তৃতীয় প্যারার But it strikes থেকে post back his manuscript to-day পর্যন্ত দুটি বাক্য ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে বাদ দিয়েছেন।

মনে হয় ব্রজেনবাবুরা ভেবে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে লিখলেন, I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning, পরে আবার লিখলেন—I therefore post back his manuscript to-day.

অতএব রাত্রে ঘুম আসায় পরের দিন সকালের জন্য কবিতা লেখাই যখন রেখে দিলেন, তখন ঐদিন খনির উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার পাঠালেন কখন? কিন্তু তিনি তো ২৮শে সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর চিঠি পেয়েছিলেন এবং ৩০শে রাত্রে কবিতা লিখতে বসেছিলেন। ঐ ৩০শে তারিখে সেদিন রাত্রে তিনি চিঠিটিও লিখেছিলেন, সেইদিনই সারাদিনের কোন এক সময়ে খনির পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন।

শচীশবাবুর বইয়ে উদ্ধৃত চিঠিটিতে প্রথম প্যারার পর··· চিহ্ন দিয়ে মূল চিঠির যে অনুদ্ধৃত অংশের কথা আছে, মনে হয় ঐ অংশে চিঠি পেয়েই কেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লিখতে আরম্ভ করতে পারেন নি, কাজের চাপে বা অন্য কারণে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কথা ছিল।

যাক্, যে কোন কারণেই হোক্, ব্রজেনবাবুরা কিন্তু তাঁদের বইয়ে ঐ দুটি বাক্য বাদ দেওয়ায় তাঁদের উদ্ধৃতিটা কিছুটা খাপছাড়া হয়ে গেছে এবং রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশটাও হঠাৎ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ব্রজেনবাবুদের বড় বইয়ে দু লাইন স্থান সংকোচ করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

লেখার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের উপদেশ দেওয়ার আর একটা কাহিনী এখানে বলছি। বঙ্কিম রচনাবলীতে নূতন লেখকদের প্রতি তাঁর যে উপদেশ আছে, এটা কিন্তু তা নয়। সে লেখা সকলেই পড়েছেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা মৌখিক উপদেশ দেওয়ার ঘটনা বলছি। বলছি, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা কাহিনী থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র কেদারবাবুকেই উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল, তা এই—

কনিষ্ঠা বা তৃতীয়া কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন। এর পর থেকে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার উপর স্বভাবতই তাঁর স্নেহ আরও অধিক বেড়ে যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যা কখন কখন তাঁর স্বামীর কর্মস্থলে থাকলেও অধিকাংশ সময়ই পিত্রালয়ে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের বিখ্যাত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের খুড়তুতো ভাই সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথও চরিত্রবান, ভদ্র ও বেশ গুণী ছিলেন। আর নীলাব্জকুমারীরও শ্বশুর বাড়ীতে খুব আদর ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতার নিকটে বলে প্রায়ই দ্বিতীয়া কন্যা ও জামাতাকে দেখতে যেতেন।

এইরূপ একবার গিয়ে ফেরার সময় ট্রেন ফেল করে বালী স্টেশনে যখন পায়চারি করছিলেন, তখন পূর্বোক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কেদারবাবুর বাড়ি বালী স্টেশনের নিকটেই এড়িয়াদহ গ্রামে। তিনি সেদিন ঘটনাক্রমে সেই সময় বালী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কেদারবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে আগে দেখেছিলেন। তাই চিনতে পারলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের কিছুটা পরিচয় দিয়ে সাহিত্য-রচনা সম্পর্কে তাঁর উপদেশ চাইলেন। কেদারবাবু তখন নবীন যুবক এবং সেই সবে সাহিত্য সেবা শুরু করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন উপদেশ হিসাবে কেদারবাবুকে বলেছিলেন—ও ইচ্ছা যদি থাকে খুব পড়, পুঁজি বাড়াও। এরপর বিতরণ সহজ হবে। spectator পড়েছ কি? এডিসন, স্টিল, সুইফট এঁদের লেখা দেখো। সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো বোঝো তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে লিখো না। এক কাজ করো, নিজের গ্রামের আর আশপাশের পরিচয়—গল্প হোক্, কাহিনী হোক যতটা পার সংগ্রহ করে লেখবার চেষ্টা ক'রো। আগে সেইটা কর দেখি। দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না। নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না। *স্টাইল? স্টাইল* শেখাতে হয় না। যা নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোমার স্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেও না। তাতে দুকূল যাবে, আমাদের সাহেব হবার মত। ভাল শোনাবে বলে বেশী বিশেষণ ব্যবহার ক'রো না। ঠিক বাছাই চাই। একটিই যথেষ্ট।

জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে, কলেজ রি-ইউনিয়নে পড়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি কবিতার কয়েক স্তবক লিখে ছিলেন। পরে তিনি সেই কবিতাটি সম্পূর্ণ করেছিলেন কিনা জানা না গেলেও, তাঁর লেখা সেই কয়েক স্তবকও আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সে লেখা নষ্ট হয়ে গেছে।

আর একটা কথা, ঐবার কলেজ রি-ইউনিয়ন সভার জন্য কবিতা লিখে

পাঠাতে না পারলেও, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়েই যখন কলকাতার আশেপাশে বা অদূরে থাকতেন, তখন কিন্তু তিনি নিজেই ঐ রি-ইউনিয়নে যোগ দিতেন। এইরূপ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলেজ রি-ইউনিয়নে এলে, সেইবারেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৫, আর বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৩৮। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রথম দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখে গেছেন।

মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি খণ্ডিত ইংরাজী চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিটি শুধু খণ্ডিতই নয়, মাঝে মাঝে ছিন্নও। এটি আগে একজন তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করলেও, চিঠির প্রসঙ্গ-কথা হিসাবে প্রায় কিছুই বলেন নি। তাই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করে কয়েকটা কথা বলছি। পত্রাংশটি এই—

Jajpur, Aug. 8, 1882

My dear brother,

I sent you a chit. Upto Balasore (144 miles south) I was comfortable. Between Balasore and Jajpur, I had to suffer a great deal...palm land...clothes thoroughly soaked, I could get nothing except Biscuits. The minu has superannuated and is discharging pus. The pain...severe but it has been miraculously relieved. Jajpur is a wretched place—no food of any kind except fowls, rice, flour...no.

Thieves are watching us.......

He always says that father had attained to a high sphere of spiritual wish.

Yours

Bankim Chandra Chatterji

এই চিঠির ইতিহাসটা হচ্ছে এই—বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে উড়িষ্যায় কটক জেলার জাজপুর মহকুমায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। এ সম্পর্কে তখন ২রা আগষ্ট তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল তা হল—

Appointed temporarily to have charge of Jajpur Sub-Division during the absence of leave of Babu Dwarka Nath Roy or until further orders.

বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুর গিয়ে কয়েক দিন পরে সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠিটি লিখে ছিলেন। চিঠিটি ছিন্ন এবং খণ্ডিত হলেও পড়ে দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুর যাওয়ার সময় পথে বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। জাজপুরে তখন ভাল খাদ্যের অভাব এবং চোরেরও উপদ্রব ছিল। আর কোন এক ব্যক্তি সর্বদাই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর পিতার অর্থাৎ যাদবচন্দ্রের উচ্চ ধর্মভাবের কথা বলতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় সপরিবারে বাসায় থেকে যখন আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়েই তাঁকে ঐ দুর্গম ও কষ্টবহুল জাজপুরে বদলি করা হয়েছিল। এই বদলি হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন—এটা একটা সেলাম লঙ্ঘনের ফল। সেই সেলাম লঙ্ঘনের ব্যাপারটা এই--

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার জেম্‌স মনরো-ও তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন। মনরো বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনতেন। তিনি দেখলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে দেখেও সামনে এসে সেলাম করলেন না। ইচ্ছা করেই বাগানের অন্যদিকে বেড়াতে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মনরোর নির্দেশেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে বদলি হন। জাজপুরে পাঠাবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়েছিল, সেখানে ২।১ মাস থাকবেন, কিন্তু তাঁকে সেখানে থাকতে হয়েছিল ৭ মাস।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ খণ্ডিত ইংরাজী চিঠিটিতে কোন এক ব্যক্তির কাছে তাঁর পিতার উচ্চ ধর্মভাবের কথা শোনার যে প্রসঙ্গ আছে, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এই জাজপুরেই এক তিব্বতী সাধুর কৃপায় প্রাণ হারিয়েও প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি তখন ঐ সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ১৮ বছর বয়স থেকে মৃত্যুর সময় ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত পরম ধার্মিকভাবে জীবন কাটিয়ে ছিলেন। যাদবচন্দ্রের ঐ প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশ্চর্য কাহিনীটি নিয়ে একাধিক ব্যক্তি, যেমন—যাদবচন্দ্রেরই কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্র, যাদবচন্দ্রের পৌত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র,

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন। যাদবচন্দ্রের জীবনের ঐ আশ্চর্য কাহিনীটি এই—

যাদবচন্দ্রের বয়স তখন ১৫।১৬। সেই সময় একদিন তিনি অশুচি বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে ঢুকলে তাঁর পিতা শিবনারায়ণ তাঁকে খুব তিরস্কার করেন। এতে যাদবচন্দ্র পিতার উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে এই জাজপুরে অগ্রজ কাশীনাথের কাছে চলে আসেন। কাশীনাথ তখন এখানে নিমকীর দারোগার কাজ করতেন।

কাশীনাথ সেকালের রাজদরবারের ভাষা পারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। যাদবচন্দ্র দাদার কাছ থেকে ভালভাবে পারসি শিখলেন এবং এইখানেই কিছু কিছু ইংরাজীও পড়লেন। যাদবচন্দ্র জাজপুরে দু-তিন বছর রইলেন।

এই সময় যাদবচন্দ্রের একবার কঠিন অসুখ করে। অসুখ আদৌ সারল না। শেষে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে,—মৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন লক্ষ্য করে, মৃতদেহ বৈতরণী তীরে শ্মশানে নিয়ে আসেন। চিতায় মৃতদেহ তুলবেন, এমন সময় তাঁর শ্মশান-বন্ধুরা দেখতে পেলেন, বৈতরণীতে একটি নৌকা দ্রুতগতিতে তাঁদের দিকে আসছে। নৌকা তাঁদের কাছে এলে, নৌকা থেকে এক জটাজুট-ধারী সাধু নেমে মৃতদেহের কাছে এসে বললেন—এ মরে নি।—এই বলে কি এক আশ্চর্য বলে যাদবচন্দ্রকে উঠিয়ে বসালেন।

যাদবচন্দ্র প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, দেখে সকলেই মহা আনন্দে তাঁকে বাসায় নিয়ে এলেন। সকলের অনুরোধে সাধুও সঙ্গে এলেন। কিছুক্ষণ পরে সাধু যখন চলে যাবেন, এমন সময় যাদবচন্দ্র সাধুকে বললেন—আমাকে যখন প্রাণই দিলেন, তখন দয়া করে আমায় দীক্ষাও দিন।

এরপর সাধু যাদবচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান—তোমার চারটি পুত্র হবে। তাঁরা সকলেই উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হবেন। তাঁদের মধ্যে একজন তোমার বংশকে অমর করবেন।

বলা বাহুল্য যে, সাধুর কথিত ঐ বংশ অমরকারীই হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় দামোদর মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি উপন্যাস, নাটক ও ধর্মগ্রন্থ সব মিলিয়ে ২৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দামোদরবাবুর 'মৃণ্ময়ী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের

উপসংহার ভাগ নিয়ে লেখা। আর তাঁর 'নবাব নন্দিনী' উপন্যাসটি বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র অনুসরণে রচিত।

তিনি 'প্রবাহ' মাসিক, 'অনুসন্ধান' পাক্ষিক এবং ইংরাজী 'নিউজ অব দি ডে' নামক দৈনিক পত্রেরও কিছুদিন করে সম্পাদক ছিলেন।

দামোদরবাবু, সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক হতেন। তাঁর একমাত্র কন্যার (একমাত্র সন্তানও বটে) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দামোদরবাবুর প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটি বলছি—দামোদরবাবু তখন বহরমপুর কলেজে এফ-এ পড়েন। সেই সময়েই তিনি তাঁর 'মৃণ্ময়ী' উপন্যাসটি লেখেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের এক ব্যক্তি দামোদর-বাবুর কোন সহপাঠীর মুখ থেকে এ কথা শুনে উপন্যাসটি পড়তে চান এবং পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি দামোদরবাবুকে বলেন—পাণ্ডুলিপিটা এখন আমার কাছে থাক। আমি এটা নিয়ে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাব।

এরপর তিনি একদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেন—ওটা রেখে যান। আমি পড়ে দেখব। আগামী সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবেন।

পরের সপ্তাহে ঐ ব্যক্তি গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেন—লেখাটা ভালই হয়েছে। তারপর যখন শুনলেন—লেখক একজন দরিদ্রের সন্তান, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—সে যদি এ বই ছাপাতে চায় তো বলবেন, আমিই সমস্ত টাকা দিয়ে দোব।

পরে এক সময় দামোদরবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়ে টাকা এনে 'মৃণ্ময়ী' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। সেই থেকে ক্রমে নানা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দামোদরবাবুর সাক্ষাৎ হয়। এবং শেষে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়।

দামোদরবাবুর 'শান্তি' উপন্যাসটির প্রথমার্ধ ১২৯৩-৯৫ সালের 'প্রচার' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। পরে এটি সম্পূর্ণ আকারে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। দামোদরবাবু তাঁর এই 'শান্তি' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর, স্বদেশ বৎসলগণের গৌরবস্থল, কবিকুল-পুঙ্গব শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপবিত্র ও সমাদৃত

নামে তদীয় একান্ত গুণপক্ষপাতী গ্রন্থকার কর্তৃক আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

বই বেরুলে দামোদরবাবু এই বই একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। বই পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন দামোদরবাবুকে লিখেছিলেন—

'...শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি তাহাতে দামোদর আমায় বঞ্চিত করিবেন না।'

এখানে বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠির এই দামোদর হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সব চিঠি কোনদিন প্রকাশিত হয়নি, অথচ আজ আর পাওয়াও যাচ্ছে না, চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেছে, এমন কিছু চিঠির হদিস পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গ-কথা সহ সেগুলির সম্বন্ধে কিছু বলছি—

বাঙ্গলা গদ্য রচনার তখনও কোন স্থির ও সুষ্ঠু পদ্ধতি নির্ধারিত হয়নি। তখন একদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় গ্রন্থ রচনা করছেন, অপরদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ কথ্য ও গ্রাম্যভাষায় যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখে কথ্যভাষা প্রচলনের চেষ্টা করছেন।

এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখা গ্রন্থগুলির ভাষাকেই সংস্কৃতবহুল হলেও কেহ কেহ তখন গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করেন।

এমনি সময়ে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে এসে এই দুই পন্থার অর্থাৎ পণ্ডিতীভাষা ও আলালীভাষার মধ্য পথ ধরে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকেও সংস্কৃতবহুল বলে বিবেচনা করলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে একদিন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে বলেছিলেন—'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' (পুরাতন-প্রসঙ্গ)

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা নিয়ে এইভাবে শুধু মুখে অপরের সঙ্গে আলোচনাই করতেন না, বাঙ্গলা গদ্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি একবার বিদ্যাসাগর মশায়কে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে এই চিঠির কথা উল্লেখ করে গেছেন। বিহারীবাবু এই চিঠিটির কথা বিদ্যাসাগর মশায়ের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্নের কাছে শুনেছিলেন। এ সম্পর্কে বিহারীবাবু লিখেছেন—

'নারায়ণবাবু বলেন, বাঙ্গলাভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে পত্র পাওয়া যায় নাই।'

বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবিতকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবার বিদ্যাসাগর মশায়ের

লেখা নিয়ে তাঁর বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় কটাক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনের ঐ লেখা গ্রন্থভুক্ত করবার সময় অবশ্য কটাক্ষগুলি বাদ দিয়েছিলেন।

লেখা বা সমাজসংস্কারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটু আধটু মতানৈক্য থাকলেও, তিনি বিদ্যাসাগর মশায়কে একজন প্রকৃত মহাত্মা ব্যক্তি ভেবে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। এ সম্পর্কে প্রসঙ্গত একটা ঘটনা এখানে বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র যে শচীশচন্দ্রের লেখা আমার প্রবন্ধে বার বার উদ্ধৃত করছি, সেই শচীশচন্দ্রের বিয়ের সময়কার একটা কাহিনী মনে পড়ছে। কাহিনীটি শচীশবাবু নিজেই তাঁর পুত্রসম স্নেহভাজন নাট্য-গবেষক অমল মিত্রের কাছে একদিন বলেছিলেন। এ কাহিনী আমি অমলবাবুর কাছে এবং তাঁর ভাই নির্মলবাবুর কাছেও শুনেছি।

কাহিনীটি বলার আগে পাঠক-পাঠিকাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শচীশবাবুর পিতা শ্যামাচরণবাবুও একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর শচীশবাবুর বিয়ে হয়েছিল ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার সঙ্গে।

এবার কাহিনীটি বলছি—

শচীশবাবুর পিতা ও পিতৃব্যদের সঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজ-বাড়ির কর্তাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। শ্যামাচরণবাবু এই সূত্রেই পুত্রের বিবাহের সময় পাইকপাড়ার রাজবাড়ির বরদের জন্য তৈরি করানো মখমলের দামী পোষাক, জরির টুপি, মণিমুক্তার মালা প্রভৃতি, এমন কি সুন্দর ল্যাণ্ডো জুড়ি গাড়ীটিও আনিয়ে ছিলেন। এদিকে দামোদরবাবুও আর কোন পুত্রকন্যা না থাকায়, একমাত্র কন্যার বিবাহে মহা আড়ম্বর ও আয়োজন করেছিলেন। কন্যার বিবাহে তিনি তাঁর পরিচিত গণ্য-মান্য ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব ও বহু আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বিয়ের রাত্রে বর শচীশচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজাদের মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে রাজকীয় বেশে রাজাদের দামী গাড়িতে করে পাত্রীর বাড়িতে গেলেন। বর গেলে বিছানার সাদা চাদরের ন্যায় ঐরূপ একটা সাধারণ চাদর গায়ে এক বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে গাড়ি থেকে বরকে নামাতে গেলেন।

শচীশ দেখলেন, বৃদ্ধের পোষাক যেমন অতি সাধারণ, চেহারাতেও তেমনি কোন জৌলুষ নেই। তাই পাছে রাজাদের দামী মখমলের পোষাকে

বৃদ্ধের হাত লাগে, এই ভেবে তিনি বাঁ হাত দিয়ে বৃদ্ধের বাড়ানো হাতটা সরিয়ে দিলেন এবং নিজেই গাড়ি থেকে নামলেন।

শচীশ দেখেন নি যে, তাঁর সেজকাকা বঙ্কিমচন্দ্রও সেখানে অনেকের সঙ্গে পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। শচীশ গাড়ি থেকে নামলে, বঙ্কিমচন্দ্র গম্ভীর স্বরে ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন—শচীশ প্রণাম কর। উনি বিদ্যাসাগর মশায়।

বিদ্যাসাগর মশায় নাম শুনেই শচীশ চমকে উঠলেন। লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। তিনি তাঁর সেই হেঁট মাথা বিদ্যাসাগর মশায়ের পায়ের উপর রেখে মনে মনে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর মশায় শচীশকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই যে কাহিনীটি এখানে বললাম, এতে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন ইঙ্গিতে তিরস্কার, অপরদিকে তেমনি বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধারও পরিচয় পাওয়া গেল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তখন তিনি সম্ভবত বিদ্যাসাগর মশায়ের পুত্রের কাছেই একটি শোকসূচক পত্রও লিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখে গেছেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর বঙ্কিমবাবু একখানি সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রও পাওয়া যায় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কতগুলি চিঠি লিখেছিলেন সে সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। শুধু রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ৩ বার ৩টি চিঠি লিখেছিলেন। একটি চিঠির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ১২৯৯ সালে চৈত্রের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। অপর দুটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ নিজেই হারিয়ে ফেলেন এবং এজন্য পরে দুঃখও প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লুপ্ত চিঠি দুটির কাহিনী এখন বলছি—

রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮-৮৯ সালে। বইটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন বইটি পড়ে স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে একটি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসাসূচক পত্রটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন—

'সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে, তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম। সেটি ইংরেজী ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোন বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা, তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে নিন্দে করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করাল। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল, সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।'

এই চিঠিটির কথায় রানী চন্দ তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ বললেন—তখন সবে বৌ-ঠাকুরানীর হাট লিখেছি। এখন মনে হয় কত কাঁচা লেখা ছিল তখনকার কালে। কিন্তু বৌ-ঠাকুরানীর হাট পড়ে বঙ্কিম তখন আমাকে একটা চিঠি লিখলেন, আমার লেখার প্রশংসা করে ও আমার ভবিষ্যতের সাফল্য অনুমান করে। সেই চিঠিখানা আমাদের কোনো আত্মীয়ের এক বন্ধুর হাতে যায়। তারপরে সেই চিঠির অন্তর্ধান। আমি আর দ্বিতীয়বার তা দেখলুম না।

. .

এবার রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে লুপ্ত চিঠিটির কথা বলছি, সেই চিঠিটি হারিয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একে দুর্ভাগ্য বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ঐ চিঠিটি লেখার যে কারণ ঘটেছিল, তার একটু বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথা বলা প্রয়োজন। ব্যাপারটা ছিল এই—

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রচারের এই প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে দুটি হিন্দুর তুলনা করেছিলেন—একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্মপরায়ণ। আর একজন আচারপরায়ণ কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমোক্ত হিন্দুটির সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—ঐ লোকটি কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা বলেন।

প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, এর চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এক সভায় 'একটি পুরাতন কথা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেটি ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে লেখেন—'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে, নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।···কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি ঐ অগ্রহায়ণ মাসে প্রচারে প্রকাশ করেন। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে।···কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশি প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষত তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে এই যে কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।···

প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তায় মাসে একটি।···

কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন। ভাবিতে ছিলেন, অর্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জুন আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা! অর্জুন বলিলেন—না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া অর্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন।

কাজেই এক্ষণে সত্য রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে সত্যচ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন। মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই ধর্ম হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না।...এক্ষণে রবিবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ প্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরাপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল?'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখার পর রবীন্দ্রনাথ পৌষের ভারতীতে আবার এক দীর্ঘ কৈফিয়ত লিখলেন। এবার অবশ্য তিনি তাঁর লেখায় খুব বিনয় প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন উত্তর দিলেন না। তবে এই সময় তিনি তাঁর উপযুক্ত আর একটি কাজ করেছিলেন। তিনি ২৩ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একটি ক্ষমাসুন্দর পত্র লিখে নিজেদের মধ্যেকার ক্ষণিকের বাদানুবাদের ধূলিমলিনতা মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক পত্রটি রবীন্দ্রনাথই কিভাবে কখন হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্পবয়সের চাপল্য হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই বাদানুবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর পত্রটি প্রসঙ্গে পরে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন—

'ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।...এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি ছাড়া কারও কারও লেখা থেকেও অনুমান হয়, বঙ্কিমচন্দ্র কখন কখন রবীন্দ্রনাথকে আরও চিঠি লিখেছিলেন। যেমন, নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—

'আমি বেহার হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটা দ্বিতল গৃহে ছিলেন। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। আনন্দমঠ তখন বাহির হইয়াছে।....

বঙ্কিমবাবু সেদিন সান্ধ্য-আহারের জন্য আমায় আমন্ত্রণ করিলেন এবং আরও কয়েকটি বন্ধুকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিবেন বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—রবি ঠাকুরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?

আমি বলিলাম—যৎ সামান্য এবং বহুদিনের।

তিনি বলিলেন—তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত। He is a talented young man.

সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হেমবাবু ও আরও কয়েকজন নিমন্ত্রিত উপস্থিত। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—রবি কোনও কারণে আসিতে পারেন নাই।

বড় আনন্দে নানাবিধ সাহিত্যালাপে সন্ধ্যাটি কাটাইলাম।'

নবীনচন্দ্রের এই লেখা পড়ে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন রবীন্দ্রনাথকে চিঠির দ্বারাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র থাকতেন বৌবাজারে আর রবীন্দ্রনাথ থাকতেন জোড়াসাঁকোয়—অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল তফাতে। তখন টেলিফোনও ছিল না। তাই মনে হয়, তিনি তাঁর কোন কর্মচারী অথবা নিকটজন মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চিঠি ঠিক রবীন্দ্রনাথকে লেখা না হলেও অপরকে লেখা সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও থেকেছে। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উভয়ে মিলে এক সময় বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী সংগ্রহ করে 'পদরত্নাবলী' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশবাবুর মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছিল। সে সম্বন্ধে চিঠি লিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুকে লেখা এক চিঠিতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশবাবু ১৩০৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রিকায় লিখেছেন—

'১৮৮৫-র পূজার পূর্বে 'প্রচার'পত্রে কৃষ্ণচরিত্রের যে অংশ অর্থাৎ কৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি সম্রাট নও, মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট, তাহাকে জয় না করিলে, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না' প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল। পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত, যুদ্ধ প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারী অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।' ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইয়াছিল এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিংসাবৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক, অথচ হিংসার মত সমাজ-বিরোধী (এন্টি-সোস্যাল) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সে সময়ে রবীন্দ্রবাবু ও আমার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' মুদ্রিত হইয়াছিল। এবং আমি উহার একখণ্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম।'

শ্রীশবাবুর চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরি চিরস্থায়ী হইবে।

'পদরত্নাবলী' পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি, আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। (যথা—William the Silent)। ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্য চরিত্র। ঈশ্বর লোক-হিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে। ইতি—তাং ২৫শে আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেই সময় তিনি এক খণ্ড 'কৃষ্ণচরিত্র' রবীন্দ্রনাথের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন, তাঁর ঠিকানা জানতেন না বলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তিনজনের জন্য তিনখানি 'কৃষ্ণচরিত্র' দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছেই পাঠিয়ে ছিলেন। সেই সময় ঐ সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তা এই—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

তিনখানি 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিঃ ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না। এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—তাং ১০ই আগষ্ট

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তেমনি দ্বিজেন্দ্র-নাথকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে সমানই শ্রদ্ধা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়ির সাহিত্যিক সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ তো আসতেনই, রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত

আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।'

পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপে রবীন্দ্রনাথের সংকোচ কেটে যায় এবং তিনি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার জন্য লেখা চাইতেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। হিতবাদী ও সাধনার জন্য লেখা চাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১২৯৮, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) থেকে কয়েক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। হিতবাদী প্রকাশিত হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এ সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজী হয়েছেন।'

সাধনা কাগজের জন্যও লেখা চাইতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। সাধনা ১২৯৯—১৩০২ সাল পর্যন্ত চার বছর চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ৪র্থ বৎসরে সাধনার সম্পাদক ছিলেন, প্রথম তিন বৎসর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক হিসাবে থাকলেও আসলে তিনিই সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে যেতেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখা দিতে পারেন নি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য ঐ সময়েই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে গেলে বমিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—অন্তত চারটি প্রবন্ধ না লিখলে হয় না। তা পেরে উঠছি না। তোমাকে একটা দিলে তো চলবে না। স্বর্ণকুমারী রয়েছেন। আমার নাতিদের জন্য খেলনা দিয়ে গেছেন, আমি তো বুঝি। তাঁর 'ভারতী' আছে। রবি আসেন। তাঁর 'সাধনা' আছে। তারপর এক আছেন, আমার বেহাই দামোদরবাবু। তিনি 'নব্যভারতে'র জন্য ধরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিদি স্বর্ণকুমারী যেমন আসতেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতেন। যেমন—

১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন সমাগম সভার ৭ম বার্ষিক উৎসবে সভার আহ্বায়ক দ্বিজেন্দ্রনাথের

আমন্ত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন গিয়েছিলেন। সেদিন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের রচনা কৌশল এবং ঐ নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সেদিন ছিল ১১ই মাঘ। দ্বিজেন্দ্রনাথের নির্দেশে ঐদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাঘোৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়া ১২৮৯ সালে বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীদের নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে যে সারস্বত সমাজ স্থাপিত হয়, তাতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—রাজেন্দ্র-লাল মিত্র, সহ-সভাপতি হয়েছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সম্পাদক হয়েছিলেন—কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সহ-সভাপতি করা হলেও তিনি সময়ের অভাববশত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারেন নি। তবুও একথা ঠিক যে সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিশ্চই হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এতটা ঘনিষ্ঠতা থাকায় সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত কোন না কোন সূত্রে এঁদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে আরও চিঠি লিখেছিলেন। তবে সে চিঠির আজ আর হদিস্ মিলছে না।

কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ মজুমদারকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটি আগে উদ্ধৃত করেছি, সেটি ছাড়া তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দু-একটি চিঠির কথা শ্রীশবাবুর নিজের লেখা থেকেই জানা যায়। যেমন, শ্রীশবাবু তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'রাখালের (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা) হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়। বঙ্কিমবাবু নিজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় পদ্ধতি মতেই চিকিৎসা করিতে পারিতেন। স্বয়ং সচরাচর ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া লইতেন। সে যাহা হউক,

অন্যান্য চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন রাত্রে আমায় চিঠি লিখিলেন, যেন প্রাতে আমার আত্মীয় সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন খুড়া মহাশয়কে লইয়া যাই। তিনি হোমিওপ্যাথির মত ছোট শিশিতে ঔষধ রাখিতেন। দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—এ যে ঠিক হোমিওপ্যাথির মত।

আমি বলিলাম—উনি দুই তিনটা ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়া চিকিৎসা করেন। তাহাতে বেশ উপকার হয়। এটা বেশ উন্নত পদ্ধতি।

„বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—হোমিওপ্যাথিতে প্রত্যেক ঔষধ পৃথক ব্যবহার করা উচিত। তাহাতে উপকার হইতেছে। সে পরীক্ষার পর ইহাকে উন্নতি বলিতে পারি না।

যাহা হউক, প্রশংসিত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার উপরে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল।'

এবার শ্রীশ মজুমদারকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটা চিঠির কথা বলি—শ্রীশবাবু লিখেছেন—

'১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।···সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সে সৌম্যমূর্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, আর কখনও সেরূপ দেখিয়াছি মনে হয় না।···কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'এখন আর ইংরাজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরাজী ভাষাটা ভারি ইন্‌সিন্‌সিয়ার বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন—'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।'

প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম—'ইদানিন্তনকালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্বপ্রধান সংস্কারক। তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।'

এখন 'মাসিক সমালোচকে' প্রকাশিত শ্রীশবাবুর লেখাটা সম্বন্ধে একটু বলছি। শ্রীশবাবুর এই লেখাটি 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক' নামে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচকে'র ৭ম-৮ম যুগ্ম সংখ্যায়

(কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৬) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় লেখককে আহ্বান করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রীশবাবুকে বলেছিলেন 'এর আগে আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল' এ থেকেই মনে হয়, আগে চিঠি লিখতে না পারলেও এখন এই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে চিঠি লিখেই আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং চিঠিটি বাঙ্গলাতেই লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর সঞ্জীবচন্দ্র ৫ বছর 'বঙ্গদর্শন' চালিয়ে বন্ধ করে দেন। তখন এই শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতি নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এ-ব্যাপারে শ্রীশবাবুর প্রধান উৎসাহ-দাতা ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীশবাবু লিখেছেন—'আমার 'বঙ্গদর্শন'-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করবে, হবে না।…আর আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজদাও খান।…সেবারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নিচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।'

শ্রীশবাবুর পরিচালনায় বঙ্গদর্শনের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৮৩)। প্রকাশক ছিলেন বৌবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট। এই বঙ্গদর্শনের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি-সম্বাদ' প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি তখন বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করে দেবার জন্য মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু নইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি—
তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র তখনও পর্যন্ত বঙ্গদর্শনের উপর কর্তৃত্ব করতেন এবং তাঁরই নির্দেশে শ্রীশ মজুমদার পরিচালিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।

এজন্য শ্রীশবাবুর মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভ দূরীকরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর (সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু আগেই হয়েছিল) শ্রীশবাবু আবার বঙ্গদর্শন বার করার উদ্যোগ করেন। এবার তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ-চন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব গ্রহণ করে ১৩০৮ সালের বৈশাখে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন। সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ।

এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে 'নিবেদনে' শ্রীশবাবু লিখেছিলেন—

'বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য-সংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সহৃদয়তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।...'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন যে কয়েক বৎসর প্রকাশিত হয়েছে, ততদিন বরাবরই সেই প্রাচীন বঙ্গদর্শনের সুনাম ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে কয়েকবার বিভিন্ন ব্যক্তির অনুরোধে তাঁদের অর্থ সাহায্য করবার জন্য ওখানকার কাশিম-বাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীকে চিঠি দিলে মহারানী ঐ ব্যক্তিদের টাকা দিয়েছিলেন। এইরূপ একবারকার কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন কোন পত্রিকা-সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য তাহা আমি জানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা কৃতকার্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মহারানী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিলেন। রানী তদ্দণ্ডে চারিশত টাকা প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় চারিশত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারিশত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।—(বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সংকলিত।)

সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল। তিনি সেই পত্রিকা স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙ্গলায় লিখিত হইত। বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু 'রজনী'র হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।'

শচীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা থেকে সংগ্রহ করে এই যে লিখেছেন, উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল এবং শেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।—এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কলকাতার

ঐ সম্পাদকের সঙ্গে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কয়েকটা চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল এবং সম্পাদকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হয়ত কোন সূত্রে পরিচয়ও ছিল।

শচীশবাবু তাঁর লেখায় সম্পাদকের নাম অথবা সম্পাদকের কাগজের নাম, কিছুই উল্লেখ করেন নি। তাই এতকাল পরে সে সব খুঁজে বার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে ঠিক ঐ সময়কারই একটা বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বিলাত আপীলের চান্দা' 'কবি মাইকেলের নিরাশ্রয় পুত্রদ্বয়ের সাহায্যার্থ চান্দা' শিরোনামায় চাঁদা আদায়ের কয়েক বারের বিবরণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকবার তীব্রভাবে আক্রান্ত হতে দেখছি। কাগজটির নাম 'মধ্যস্থ'। কাগজে সম্পাদকের নাম নেই। শুধু আছে—এই পত্র কলিকাতা সিমুলিয়া কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ২০১ নং ভবনে মধ্যস্থ যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাগজে সম্পাদকের নাম না থাকলেও জানা গেছে, 'মধ্যস্থ'র সম্পাদক ছিলেন, সেকালের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোমোহন বসু। মনোমোহন-বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও ছেলে-বেলায় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-বছর বহরমপুর থেকে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' বার করেন, সেই বছরই অর্থাৎ ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে মনোমোহনবাবুও তাঁর সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চার বছর বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। মনোমোহনবাবুও তাঁর মধ্যস্থ ঐ চার বছরের মতই সম্পাদনা করেছিলেন। মধ্যস্থ প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে হয় মাসিক। ১২৮০ সালের পুরা মধ্যস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থ ২য় ভাগ খণ্ডটি আমার কাছে আছে। মধ্যস্থ আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। তাই অনেকেই হয়ত এ পত্রিকা দেখেন নি। কেউ কেউ হয়ত এর নামও শোনেন নি। আমার এক বন্ধু জ্যোতিপ্রসন্ন সেনের বাড়ির পুরাতন গ্রন্থাগার থেকে এটি পাই। এতে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে, তা তিনি জানতেনই না।

আগেই বলেছি, কলকাতার কোন্ কাগজের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, তা আজ খুঁজে বার করা অত্যন্ত কষ্টকর। কে জানি না, তবুও চাঁদা আদায়, বার বার আক্রমণ এবং সর্বোপরি সময়ের সঙ্গে ঠিক মিলে যাওয়ায়, এই মধ্যস্থ থেকেই কিছুটা প্রসঙ্গ-কথা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকটা আক্রমণ একেবারে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হুবহু এইজন্য যে, পাঠক-

পাঠিকারা দেখবেন আক্রমণ কী তীব্র ছিল। তাই এর মধ্যে আর নিজের কোন কথা দিলাম না এবং উদ্ধৃতিও ছোট করলাম না।

প্রথম বছরের বঙ্গদর্শন কলকাতার ভবানীপুরের একটা ছাপাখানা থেকে ছেপে প্রকাশিত হলেও, দ্বিতীয় বছর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেসে ছেপে সেখান হতেই প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকা ও প্রেস দেখাশুনা করবার জন্য কর্মচারী ছিলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রও দেখাশুনা করতেন।

দ্বিতীয় বছরের অর্থাৎ ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'গর্দভ' নামে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এই প্রবন্ধটিকে তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। লোকরহস্যের প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখে গেছেন—

'বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্য মাত্র গালি, গালি ভিন্ন রহস্য নাই। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।...সামাজিক যে সকল দোষ তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ...এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।'

'গর্দভ' প্রবন্ধ ছাড়া অন্যান্য কারণেও মধ্যস্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত শ্রীঅঃ (অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র সরকার) লিখিত 'তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধের জন্য লেখকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকাও আক্রান্ত হয়েছিল। ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যস্থে একজন লিখেছিলেন—

রাগিণী—একা বাহাদুর
তাল—গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল
যে লেখা লাগে নজরে
সে কলম কজনে ধরে
কাকের ছানা, বকের ছানা
হ্যাদুর দেবতা খ্যাড় মাটি।

ভুষিমাল ময়লা ধরা
ভেতরেতে গর্দা ভরা।
এখন গ্রন্থকর্ত্তা ঘরে ঘরে
এডিটার বহু নরে
(কিন্তু) কলম যে কিরূপে ধরে,
তা অনেকে জানে না।
একখানা বিকোয় না দেশে,
মশলা বাঁধে অবশেষে।
তবু কত সর্বনেশে কলম ধরতে ছাড়ে না।

এইভাবে ঐ দীর্ঘ কবিতায় গালি দিয়ে কবিতার শেষে কবি লেখেন—'এবার অতি অল্প হইল।' অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন—পরে আরও বেশী আক্রমণ হবে। অবশ্য এই 'তুলনায় সমালোচন' নিয়ে মধ্যস্থ-র কয়েক সংখ্যায় আরও আক্রমণ চলেছিল।

এবার 'গর্দভ' প্রবন্ধটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কীভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলছি। আক্রমণের হেতুটা জানবার জন্য 'গর্দভ' প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'...হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা আছে। কেননা, আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।...

হে গর্দভ, কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র! যেখানে সেখানে তোমারই বড় বড় পদ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া মহাকর্ণদ্বয় ইতস্তত সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া উকিল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তি সুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া তুমি দয়াময় হইয়া

অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্বস্ব কানাইকে দাও। তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখন দেখিয়াছি, তুমি লাঙুল সংগোপনপূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সরস্বতী মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভ-লোকপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে 'প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল' বলিয়া মহা গর্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠী মধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈল-নিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া তুলট হস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।...

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব-পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন?

তুমি নানারূপে নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।...

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত; বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর; বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি, ঘাস খাইয়া সুখী কর।'

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই গর্দভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, তখন ১৮ই শ্রাবণ তারিখের মধ্যস্থে চিঠিপত্রের আকারে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল—

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় একখানি ভদ্রগোচ সংবাদপত্রের সম্পাদক। সুতরাং নানা রকমের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র দেখিতে পান। কাঁঠালপাড়ার বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ মাসের সংখ্যা আপনার হস্তগত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তৎসন্নিবিষ্ট

'গর্দভ' নামক প্রবন্ধটিও পাঠ করিয়া থাকিবেন। আপনার সরল হৃদয় পাঠক মনে করিতে পারেন, বঙ্গদর্শনের লেখক একজন সভ্য লোক, তিনি কি কখনো ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত ছলে কথা কহেন? এটি কেবল গর্দভেরই স্তব হইবেক, পাঠকের এই বিবেচনা অযৌক্তিক নহে।

আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করণের পূর্বে আত্মপরিচয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। আমি বঙ্গদর্শনের সেই আরাধ্য দেবতা। আপনার নিকট পরিচিত হইলাম। এক্ষণে একটি উপকার করুন। আমার প্রিয়দর্শন বঙ্গদর্শনের সহিত আমার মাসান্তে দেখা হয়। আপনি প্রতি শুক্রবার লেখকের বাটীতে গিয়া দেখা করেন। আপনার নিকট আমার এই অনুরোধ, আগামী শুক্রবার যখন দর্শন সম্পাদকের বাটীতে যাইবেন, আমার এই আশীর্বাদী পত্রখানি আমার সেই প্রিয় ভক্তকে দিয়া আসিবেন, তাহাতে বড় বাধিত হইব।

প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক ভক্তবরেষু।

বাছা! বরংবৃণু! বরংবৃণু! কেননা এতদিনের পর জানিলাম বঙ্গদেশে আমার মহিমা বুঝে এমন ব্যক্তি আছে। তোমার বুদ্ধি বলে তোমার অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মধ্যে আর যে তাচ্ছিল্যভাজন হইব না, এতদিনের পর সে আশা জন্মিল। তাঁহারা অনায়াসে বুঝিবেন, যখন কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট আমার অবতার মাত্র হইয়া পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখন আমি স্বয়ং বা কেন উপেক্ষিত হইব। অদ্য তোমার উপর যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অগ্রসর হইলাম।

হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! আমি অনেকবার অনেক ভার বহন করিয়াছি। কিন্তু এখন যে কতকগুলো আনাড়ী লোকে আমার পৃষ্ঠে, ইংরাজী গ্রন্থাপহারিত ভাবপূর্ণ বাঙ্গলা পুস্তকের বোঝা অর্পণ করে, তাহার ভার আর সহ্য করিতে পারি না। যা হউক, বাপু। তুমি একজন সুলেখক, তুমি একটু চেষ্টা করিয়া আমার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুরুভারও লাঘব কর। আশীর্বাদ করি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বক্রগ্রীবের ন্যায় গর্বিত-প্রধান হও।

আমার ভক্ষ্যের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গলা গ্রন্থকারের মাথা বড় সুখাদ্য, যেহেতু উহাতে বিলাতি-পনিরের গন্ধ পাওয়া যায়। হে সূক্ষ্মদর্শিন! অদ্য জানিতে পারিলাম, দ্বাপরে যে পুচ্ছ আমার মস্তক শোভিত করিয়া ভক্তজনের মনোরঞ্জন করিত, এই কলিতে তাহা দোলমান সুগোল রূপ ধারণ করিয়া তোমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি আমার ভক্তের মধ্যে প্রধান।

হে ভক্তপ্রবর! আমার এই গর্দভ অবতারের আদ্যন্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। একদিন আমি বিষ্ণুলোকে বসিয়া অবসরক্রমে একখানা মাসিক পুস্তক পড়িতে ছিলাম। এমন সময় বীণাপাণির দুহিতা বঙ্গভাষা সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—'হে চতুর্ভুজ। আপনি দস্যু-দলন বলিয়া ত্রিভুবন খ্যাত, অতএব আমাকে নিরাপদ করিয়া আপনার নামের আধুনিক সার্থকতা সম্পাদন করুন। আমি বাঙ্গলা গ্রন্থকারস্বরূপ দস্যুদিগের অত্যাচার আর সহ্য করতে পার্রি না। অবগত আছেন, আমি বহুদিন হইতে উপযুক্ত ভক্তদিগের বিরহে দিন দিন 'দীনা, ক্ষীণা, মলিনা' হইতেছি। বিদ্যাসাগর নামে একটি প্রিয় ভক্ত আছে, তাহার উপর আবার যত বিলাতী সভ্যতা-প্রাপ্ত ষণ্ডতে প'ড়ে দস্যুর আচরণ করিতেছে। আবার আমাকে (এই দেখুন বলিয়া অঙ্গে বন্ধন চিহ্ন দেখাইয়া বলিল) বিলাতী রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া, মাসে মাসে, বৎসর বৎসর যখন তখন—কখনো বা বিজাতীয়দিগের উচ্ছিষ্ট কাব্যরস, কখনো দেশী ঝাল মিশ্রিত আচার [তাও আবার অধিক পরিমাণে] খাওয়াইয়া মারিতে উদ্যত। জানেন আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত, মধুপানে শরীর কোমল, তাতে আবার শোকে এখন শীর্ণ হইয়াছে, তবে কি করিয়া মদ্যপায়ী প্রিয় দ্রব্য আমার স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। এখন আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।

বাপু! শুনিলে—বঙ্গভাষার এই দূরবস্থা কাতরোক্ত বচনে দস্যুদলন মানসে, গর্দভরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। অচিরাৎ গর্জন দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব। তুমি আমার বরপুত্র-রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। সুতরাং সর্বাগ্রেই আমার পূজা সর্বত্র উত্তমরূপে প্রচার করিতেছ ও করিতে থাক। তোমার প্রথম পূজাতেই প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি—কিছুকাল ধনে মানে মর্ত্যসুখ ভোগ কর, পরে কাল পূর্ণ হইলে, বিষ্ণুর পরম ভক্ত যেমন অন্তে চতুর্ভুজ দেহপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারে আমার চরণ প্রসাদে তুমিও আমার এই চতুষ্পদ মূর্তি ধারণের যোগ্য হইবে—সাধনা কর—এইরূপে আর দিনকতক সাধনা কর, সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি — আশীর্বাদক

৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার — শ্রীগর্দভ

১৮ই শ্রাবণের মধ্যস্থ পত্রিকায় শ্রীগর্দভের চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার দু

সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৩২শে শ্রাবণের মধ্যস্থয় একেবারে প্রথমেই 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে প্রকৃত বা ছদ্ম কোন নামই কারও নেই। তাই এটি স্বয়ং সম্পাদকের লেখা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধের মাথায় সম্পাদক শুধু ভণিতা হিসাবে লেখেন— আমরা অনেকের অনুরোধে এই প্রস্তাবটি এস্থলে প্রকটন করিতে বাধ্য হইলাম।

এখন ঐ 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' প্রবন্ধটি সবই এখানে উদ্ধৃত করছি—

'এক গর্দভের কথায় সুসভ্য বঙ্গীয় নরমণ্ডলে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এ সং বড় মন্দ দেওয়া হয় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি আমোদ-কাংলা বাংলা দেশে লোকের মনোরঞ্জনার্থ কত কত মহাশয় কত রং, কত ঢং ও কত সং-বিশিষ্ট কত পত্র, কত পুস্তক, কত নাটক, কত ছড়া, কত গীত, কত কি প্রচার ও গান করিলেন, তাহা গণিয়া উঠা ভার; কিন্তু সে সকলের টেক্কা স্বরূপ প্রিয়দর্শন বঙ্গদর্শন আজকাল সকলের মনোহরণ করিতেছেন। বিশেষত বৃহল্লাঙ্গুল এবং গর্দভাদি-লেখক মহাশয়দিগের প্রতিভার আভা এত তেজস্বী যে, বঙ্গীয় যুবকগণের পক্ষে তত্তাবৎ সম্মোহন-বাণ বিশেষ হইয়া উঠিতেছে। দুঃখের মধ্যে তাঁহাদের সুকোমল দর্শনেন্দ্রিয় তত সহ্য করিতে না পারিয়া এককালে অন্ধবৎ হইয়া পড়িতেছে।

তাহা হউক, তথাপি আমোদের এক শেষ হইল! এতদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য আসরে একদল উত্তম গায়ক যে নামিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় নাই। ইঁহারা যখন প্রথমে তানপুরাদি যন্ত্রের সুর বাঁধিলেন, তখন বোধ হইল 'কালোয়াতি গান' হইবে। গৌরচন্দ্রিকাতে বোধ হইল কীর্তন, হালকা গানে বোধ হইল ঢব্, সমালোচনের ছড়া শ্রবণে বোধ হইল পাঁচালি, দুই একটা তুক্‌কা শুনিয়া বোধ হইল কালীয় দমন যাত্রা, এখন গর্দভাদির সং দেখিয়া বোধ হইতেছে 'কেরপারামের আম যাত্তারাই' বা হয়! এত দূর হইয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহারই বা নিশ্চয় কি? এক একদল যাত্রাওয়ালা আছে, তাহারা খোল, করতাল, তবলা, ঢোল, নূপুর, ঘুমুর, চামর, মন্দিরা, পুতুল, তার প্রভৃতি সকলই সঙ্গে রাখে। যখন যেমন জুটে যায়, তখন তাহাই করে। কৃষ্ণযাত্রা, তবলার যাত্রা, ঢবের গান, গাছ রামায়ণ এবং পুতুলবাজি পর্যন্ত কিছুই ছাড়ে না। ইহারাও সেইরূপ সর্বতোমুখ ও সর্বপোষক হওয়ায় শেষে ছায়াবাজী পর্যন্ত না দেখাইয়া কি ছাড়িবেন?

কেহ কেহ বলেন, ইহারা তাহা করুন মানা করি না, কিন্তু গরীব বেচারা সেকেলে মরা মানুষগুলোকে ধরিয়া আনিয়া এত নাস্তাখাস্তা কেন করেন? হিন্দুজাতির দেবাবতার ও দেবতুল্য পরম পূজ্য পুরুষগণকে তাঁহাদের আপনাদের আরাধ্য গর্দভদেবের সাজে সাজাইয়া কি সুখ পান, তাহাতো বুঝিতে পারি না।

কেহবা বলেন, যদি মৃত জীবিত সকল নরদেহী জীবই গাধা হইল, তবে তাঁহারা জনকতক মানুষ হইয়া এতবড় বিশাল ভূমণ্ডলে কিরূপে ও কিসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন? যাঁহাদিগকে লোকে চিরকাল বীরশ্রেষ্ঠ ও ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ও নরপাল বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা হইলেন গাধা! যদি এত গাধা হইল, তবে এই গাধার জগতে যে বিধাতা দুই চারি জন মনুষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে গাধার সহিত সহবাস ও আলাপজনিত ঘোর ক্লেশে নিক্ষেপ করিলেন, সেই বিধাতাও কি গাধার ন্যায় আক্কেলবান নহেন?

উপরের এই তর্কটি শুনিয়া একজন রসিক পুরুষ (অথবা রসিক গাধা) সেদিন এই গল্পটি করিলেন—

বাউনাড়া গাঁয়ে বড়াইরাম নামে এক যুবা পুরুষ বড় সুখে বাস করিত। তাহার অসুখের দুইটি প্রধান কারণ ছিল। তাহার প্রথম এই যে, সে ভাবিত, আমি রূপে, গুণে, বিদ্যা, সাধ্যে সবার চেয়ে এত বড়, (পুকুরের পাড়ের চেয়ে হিমালয় যত বড়, তত বড়!) এবং সকলেরি ভুল-ভ্রান্তি দেখিতে পাই, আমার তা মোটে নাই—সকলেই কম বুঝে, আমি সব বুঝি; তবু আশ্চর্য এই, আমি যা বলি লোকে তা শুনে না; আমি যা করি লোকে তা করে না; আমি কোথায়ও গেলে লোকে উঠে দাঁড়ায় না, আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না (তা তো করবেই না!) তারাও আমাকে গ্রাহ্য করে না।

অসুখের দ্বিতীয় কারণ, সে আপনার সমযোগ্য মানব, কি সমযোগ্যা মানবী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কাহারো সহিত বন্ধুত্ব করিতে পাইল না। অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রণয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইল না!

কিছুকাল এইরূপে যায়, বড় অসুখ। ক্রমে লোকালয় আর ভাল লাগে না, সমস্ত নরনারী যেন কীটপতঙ্গ—সকলেই যেন দুচক্ষের বালি! অবশেষে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অসামান্য তেজভরে একদিকে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রান্তর মধ্যে এক বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া মহা আস্ফালনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আত্মমাহাত্ম্য ও আর সকলের হেয়ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই গাছে এক মায়াচারী ব্রহ্মদৈত্য বাসা করিয়াছিল। সে দেখিল, এ ব্যক্তির নিকটে দ্বিতীয় মনুষ্য নাই, অথচ 'আমি এমন তেমন, আমাকে বেটারা মানে না, এত বড় স্পর্ধা' ইত্যাদি গর্বিত বাক্যে বায়ুর সহিত প্রবল পরাক্রমে বিতণ্ডা করিতেছে। ব্রহ্মদৈত্য তাহার ভাব দেখিয়াই বুঝিল, এ ব্যক্তি অহঙ্কারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

মায়াচারী তৎক্ষণাৎ এক ক্ষেমঙ্করী রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উড়িয়া আসিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়া বড়াইরাম ভাবিল স্বয়ং ভগবতী আমার দুঃখ দূর করিতে আইলেন। অমনি প্রণিপাতপূর্বক আত্মমনোবেদনা সমস্তই সুগোচর করিয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'মা! আমাকে মানুষ দেখাইয়া দাও!'

ক্ষেমঙ্করী স্বীয় দেহ হইতে একটি পক্ষ উৎপাটন করিয়া বলিল, 'যাও বৎস! এই পালকটি কর্ণে দিয়া হট্টে যাও, যাহাকে মানুষ দেখিবে, তাহার সহিত প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হও, তাহাকে ছাড়িও না।' যেমন বলা অমনি পক্ষীর অন্তর্ধান হওয়া।

বড়াইরাম পালক লইয়া মহাহর্ষে ও মহাদর্পে পুনর্বার লোকালয় চলিল। এক হট্টে গিয়া উপস্থিত হইল। কানে পালক দিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করে, মানুষ দেখিতে পায় না। যাহারা হাট-বাজার করিতেছে সকলেই শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, শকুনী, গৃধিনী, শালিক, গাধা ইত্যাদি! তাহারা যে যাহা বলিতেছে, সব যেন শিয়াল কুকুরাদির ডাক। দেখিতে অতি ভীষণ!—মনুষ্য হইয়া এককালে সহস্র সহস্র ইতর প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করা কত বড় বিভীষিকাময় ব্যাপার তাহা বঙ্গদর্শনের লেখক মহাশয়েরা বিলক্ষণ ভুগিতেছেন।

বড়াইরাম সেই বিস্তৃত হট্টে এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে একমাত্র নরদেহ দেখিতে ও সেই দেহের মুখ হইতে একমাত্র মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে দেহ একটি স্ত্রীলোকের। তাহার বর্ণ ঠিক জাম্রবর্ণ, তাহার আয়তন দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিশাল, তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, তাহার কেশ যেন তারের চোঁচ, তাহার চর্ম অতি কঠোর, তাহার গাত্রে মলাপুঞ্জ স্থানে স্থানে যেন দ্বীপপুঞ্জ; তাহার চাহনি প্রাণহারিণী (মনোহারিণী নহে!), তাহার স্বর ঋষভ-নিন্দিত কি বায়স-

কুজিত নিনাদ অপেক্ষাও সুমধুর। সে কয়গাছি খেংরা বিক্রয় করিতেছিল, তাহা হইল; পরে সে এক পয়সার শুঁটকী মৎস্য, আধ পয়সার প্যাঁজ, আধ পয়সার মূলো, আর এক পয়সার মিসি ফিসি হ্যানত্যান কিনিয়া সায়ংকালে বাটী চলিল। বড়াইরাম ক্ষেমঙ্করীর উপদেশানুসারে তাহারই পশ্চাৎ লইল।

মাঠের মধ্যে যখন স্ত্রীলোকটি দেখিল, একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে, সে ভয় পাইল [যদি অমন দেহে ভয় বাসা পায়]। যাহা হউক নিদান তাহার সন্দেহ হইল। সে ছল করিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।—তখন তাহার আরও সন্দেহ বাড়িল, সে আবার চলিল। বড়াইও চলিতে লাগিল। সে দৌড়িল, বড়াইরামও দৌড়িল। সে বসিয়া পড়িল, বড়াইরামও বসিল। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে গা? উত্তর হইল—আমি তোমারই। সে কহিল, 'মর বেটা, তোর ঘরে মা-মাসী কেউকি নেই?' উত্তর 'তুমিই আমার সব।' মেয়েমানুষ ছুটিল। বড়াইও তাই করিল। সে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, 'ওগো দাদাগো! ওগো শিগ্‌গির করে এসো গো! এক মিনসে্ আমায় মারে গো!'

তাহার দাদা এক লাঠি হাতে ছুটিয়া আইল। আসিয়া বলিল—'থাকী কিরা?' থাকি দেখাইল—'ঐ যে।'

থাকী বাটী প্রবেশ করিল, বড়াইরামও সঙ্গে সঙ্গে যায়, এমন সময় ঘাড়ে এক ঘা লাঠি পড়িল। 'বাবারে' বলিয়া চীৎকার। কিন্তু মনের এ ক্ষিদে, তৎক্ষণাৎ উঠিয়াই থাকীর পশ্চাতে ধাবিত হইল। সেবারে থাকীর দাদা আসিয়া বড়াইকে ধরিল। বড়াই বলিল—ছেড়ে দাও তুমি শিয়াল, আমি মানুষ, আর ঐ আমার মেয়েমানুষ। তুমি আমায় ধর কেন?

থাকীর দাদা বুঝিল, এ পাগল। তাহাকে লইয়া ঘরের হাতিনায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমাকে ভদ্রলোক দেখিতেছি, তুমি এমন কেন হইলে?

বড়াইরামের কানে পালক থাকাতে ঐ কথাগুলি যেন ঘেউ ঘেউ শব্দের মত শুনিতে পাইল। সুতরাং কোন উত্তর করিল না। সেটি ডোমের বাড়ি। পাড়াসুদ্ধ ডোম জড়ো হইয়া যে যাহা বলে, বড়াইরাম সকলই ইতরপ্রাণীর বুলি শুনেন এবং তাহাদিগকে ইতর প্রাণী দেখেন। কিন্তু যেই মাত্র থাকী আবার আইল, অমনি মহাপ্রফুল্ল হইয়া তাহার নিকট যাইতে চায়। থাকী যেই মাত্র কথা কহিল, অমনি বুঝিতে পারিয়া যথোচিত উত্তর দিতে লাগিল।

থাকী বুঝাইল—তুমি ভদ্রলোক, আমরা ইতর লোক, আমাদের বাটীতে রাত্রে থাকিলে তোমার জাতি যাইবে, অতএব বাটী যাও, ইত্যাদি।

সেকথা কে শুনে? তদুত্তরে কেবলই প্রেমের কথা। তৎশ্রবণে থাকী ডোমনীর দাদা সহ্য করিতে না পারিয়া আবার মারিতে লাগিল এবং টানিয়া-হিঁচড়িয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। এই দৌরাত্ম্যে বড়াইরামের কানের পালক পড়িয়া গেল। ভ্রম দূর হইল। সকলকেই আবার মানুষ দেখিল। বিশেষ লজ্জা পাইল, প্রহারের যাতনায় অভিভূত হইল। তখন বিস্তর বিনয় করিয়া কহিল—আমার আর চলিবার শক্তি নাই। একে সমস্ত দিবস অনাহার, তাহাতে এই প্রহার, তোমরা কৃপা করিয়া আমায় থাকিতে দাও।

তাহাদের দয়া হইল। তাহার এখনকার কথা শুনিয়া বোধ হইল, এ পাগল নয়, সুতরাং থাকিতে দিল। ডোমগণ ও থাকীর দাদা কর্মান্তরে বাহিরে গেল। বড়াইরাম আবার পালক লইয়া কর্ণে পরিল। আবার সেই ভাব দাঁড়াইল। আবার থাকী ডুমনীর সহিত মিত্রতা করিতে ব্যগ্র হইল। এবারে থাকীর মন ভিজিল। ভদ্রলোক এতটা অনুনয়, বিনয়, স্তব, আরাধনা, প্রেমোক্তি করিতেছে, ইতর স্ত্রীলোক কতক্ষণ কঠিন থাকিতে পারে? বিশেষতঃ বড়াইরাম দেখিতে কুপুরুষ নয়, অতএব থাকী ডুমনীর মন ভিজিল। কিন্তু তাহার প্রকৃতি, ব্যবহার ও বাক্য এত মধুর যে, যখন মনটা ভিজিয়া গেল, তখন সেই আর্দ্র মনের প্রতিরূপ বা প্রতিধ্বনিস্বরূপ এই কয়টি মধুমাখা কথা মুখ হইতে নির্গত হইল। যথা—

তবে এস, এখানে আর মর কেন? চল তবে ঐ চুলোয় তোমায় গুঁজড়ে রেখে আসি গে!—ইত্যাদি রূপ প্রেমের ভাষার অজস্র স্রোত বহিতে লাগিল, তাহা আমরা সকল বলিতে চাহি না। ঐ প্রেমলাপ হইতে বড়াইরামকে থাকী আপনার পর্ণ-মন্দিরে লইয়া গেল। তাহার এক পার্শ্বে দুটি শুকর ও একটি বাচ্ছা, অপর পার্শ্বে এক অজরাজের সপরিবারে অবস্থান। মধ্যস্থলে একটা নেলের মাদুর পাতা। মরি মরি! সেই মাদুর কিবা তৈলাক্ত, কিবা পালিত পাশ্বাবলীর খুরভ্রষ্ট সুকর্দমাক্ত, কিবা অজ্ঞাতপূর্ব সদাঘ্রাত!

যাহা হউক, থাকীর আদেশ মাত্র বড়াইরাম তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। থাকী কতকগুলো ভাজা পোড়া প্রভৃতি আনিয়া দিল, পথশ্রান্ত ও প্রহারাহত নায়ক তাহাই ভোজন করিলেন। থাকী জল আনিয়া দিল, তিনি ঢক্ ঢক্

করিয়া এক নিঃশ্বাসে খাইয়া ফেলিলেন। থাকী বাহিরে যায় দেখিয়া বড়াইরাম বলিলেন—'কোথায় যাও'। থাকী বলিল—'মুয়ে আগুন, যেখানে যাই না, তোর কি?' বড়াইরাম বলিলেন—'আমি তোমা ছাড়া থাকিতে পারিব না, যেখানে যাইবে সেখানেই সঙ্গে যাইব।' থাকী বড় বিপদে পড়িল। তাহার দাদার আসিবার পূর্বেই দুই জনে এত ঘনিষ্ঠতা ও এত ঝগড়াঝাটি হইল যে, সেই রাত্রেই বড়াইরামকে থাকীর শতমুখীর আস্বাদন পাইতে হইয়াছিল।

পরদিন, থাকী আপন দাদার কাছে বড়াইরামের সহিত তাহার বে দিতে বলিল। তার দাদা এই কথায় রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ঘা কতক বসাইয়া দিল। তাহার কারণ সে অব্যক্ত রাখিল না। অর্থাৎ তবে আমার উপায় কি হইবে? আমার আজও বে হয়নি, তুই কি বলিয়া বে করিবি এবং কে আমায় রেঁধে বেড়ে দিবে,—কে আমার সেবা করিবে?

কিন্তু থাকী কিছুতেই আইবুড়ো থাকিতে সম্মত হইল না। বলিল—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর ফিরিবে না। বরং তোমার যা যা করতেম, তাও করবো।

পাড়ার পাঁচজনে থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল। বড়াইরামের সহিত থাকীর বিবাহ হইল। কিন্তু কোন উচ্চজাতি ডোম হইলে তাহার যে যে প্রকরণ নিরূপিত আছে, তাহার অন্যথা হইল না। তন্মধ্যে প্রধান এই—এক মাচা বাঁধা হইল, তাহার উপর থাকী বসিল, মাচার নীচে বড়াইরাম বসিলেন (কানে সেই পালক আছে), উপরে থাকী পা ধুইতে লাগিল—সেই পাদোদক বড়াইরামের মস্তকে পড়িল এবং তাঁহাকে সেই জল লেহন করিয়া পান করিতে হইল।

এইরূপে কিছুদিন কাটায়। প্রত্যহ পাঁচ-ছয় বার করিয়া থাকীর পদাঘাত ও তিন-চার বার করিয়া থাকীর খ্যাংরা খাইতে হয়। তৎবাদে ঝুড়ি, চুপড়ি বুনিতে ও শূকরাদি চরাইতে বাধিত হইতে হইল। কিন্তু থাকী সঙ্গে না থাকিলে মারিয়া ফেলিলেও বড়াইরাম এসব কিছুই করেন না।

একদিন সেই ক্ষেমঙ্করী দেখা দিল। বড়াইরাম প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী আর একটি পালক দিয়া বলিল—'এইটি তোমার প্রেয়সীর কর্ণে দিও।' বড়াইরাম পরমানন্দে তাহাই করিলেন। ওমা! থাকী কানে পালকটি দিবা মাত্র বড়াইরামকে আর মানুষ দেখে না, একটা গাধার মত আকার দেখিতে পাইল। অমনি দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বড়াইরাম একবার যান, একবার আসেন। যতবার আসেন, ততবারই খ্যাংরা। ভাগ্যক্রমে থাকীর কানের পালকটি বেশীক্ষণ থাকিতে না থাকিতে এক প্রবল বাতাসে তাহা উড়িয়া দূরে গেল। থাকী পুনর্বার বড়াইরামকে মানুষ দেখিল। কিন্তু অপূর্ব পালক তাহার কর্ণাভরণ হইয়াছিল, এক্ষণে পালকের জন্য আবদার ধরিল। দেখে, বড়াইরামের কর্ণে একটি সেইরূপ পালক রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহা কাড়িয়া লইয়া আপন কর্ণে পরিল। অমনি আবার পতিকে গাধা দেখিল। বড়াইরাম পালকের কুহক হইতে মুক্ত হওয়াতে থাকীতে যৎ-কুৎসিতা রমণী বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার নীচ জাতিত্ব ও অন্যান্য নীচত্ব সকলই স্মরণ পথে উদিত হইল। এবার থাকী তাড়াইতে না তাড়াইতে বড়াইরাম আপনিই পলাইল। এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যের মাঠে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা ভগবতী। আমায় এমন পালক দাও, যাহাতে যথার্থ মানুষ চিনিতে পারি।

ব্রহ্মদৈত্য এবারে ক্ষেমঙ্করী না হইয়া অদৃষ্ট থাকিয়া নরাঙ্কিতে ডাকিয়া উপদেশ দিল—'যাও বৎস! স্বদেশ যাও, সকলেই মানুষ; দোষ-গুণ সকলেরই আছে; আমি বড়, একথা কদাচ মনে করিও না। তোমার যেমন দশটা গুণ আছে, তেমন পাঁচটা দোষও আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপ দোষ-গুণ দুই আছে। কেও এক বিষয়ে, কেহ অন্য বিষয়ে গুণী। অতএব কাহাকেও অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিও না। নম্রভাবে সকলের সঙ্গেই সদ্ভাবে গিয়া থাক। দেখিবে পরম সুখ পাইবে। তোমার মনের রোগ দেখিয়া আমি তোমাকে পালক দিয়াছিলাম। সে পালক আর কিছুই না, অহঙ্কার। অহঙ্কারের বশে লোকে আপনাকেই মানুষ দেখে, আর সকলকে গাধা, শিয়াল, কুকুরবৎ দেখিতে পায়। এমন কাজ আর কখনও করিও না। কাহাকেও নীচ জ্ঞান করিও না।'

এইখানেই 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' প্রবন্ধ বা কাহিনী শেষ হয়েছে। এর পর পাদটীকা বা মন্তব্য হিসাবে লেখা হয়েছে—

'মধ্যস্থ মহাশয়! আমার কথাটি ফুরাইল। এখন ভাবিয়া দেখুন, গর্দভ লেখক কানে পালক দিয়েছেন কিনা? এবং তাঁহারা কেহ কেহ বড়াইরাম ও থাকীর মতন আর সকলকে গাধা দেখিয়া আপনা আপনি পরস্পরকে বড় হন ও বড় করেন কি-না? যদি তাহা হয়, তবে তাঁহাদের ভাগ্যে বড়াইরামের

ন্যায় পরিণাম ফল তোলা আছে কি-না? যাহাতে এ রোগের প্রতিকার হয়, এই বেলা আপনারা তাহার চেষ্টা করুন। অলমিতি বিস্তরেণ।'

৩২শে শ্রাবণ তারিখের মধ্যস্থয় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর, এর পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই ভাদ্র তারিখের মধ্যস্থয় এই বড়াইরামের কাহিনীরই জের টেনে 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ পরিশিষ্ট' নামে আরও একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সে লেখার একটি লাইনও আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না। ৩২শে শ্রাবণের কাগজ থেকে বড়াইরামের ঐ জঘন্য কাহিনীটি উদ্ধৃত করবার সময়েই বার বার ভেবেছি, এটাকে সংক্ষেপ করে নিজের ভাষায় কিছুটা ভদ্রস্থ করেই না হয় বলি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও ভেবেছি, তাহলে মধ্যস্থর আক্রমণের তীব্রতা বা ঝাঁঝটা তো আর লোকে জানতে পারবেন না। আর এ কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা নিজেরা পড়েও নিতে পারবেন না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর সমসাময়িক লেখকদের দ্বারা কিরূপ নির্মমভাবে যে আক্রান্ত হতেন, সেটা দেখাবার জন্যই ঐ লেখাটা হুবহু উদ্ধৃত করেছি।

এখন ঐ বড়াইরামের কাহিনীটি সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত—লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করেই বড়াইরাম বলেছেন, তাতে কারও সন্দেহই নেই। তাই এখানে বড়াইরামের সঙ্গে থাকীর কাহিনী আনায় সেটা একদিকে যেমন অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও অসঙ্গত হয়েছে, তেমনি অন্যায়ও হয়েছে।

দ্বিতীয়ত—অহঙ্কারী বলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কারও কারও ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অহঙ্কারী মোটেই ছিলেন না। আমি আগেই বলেছি—বঙ্কিমচন্দ্র দিনে চাকরিতে হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রতিদিন রাত্রে আটটা থেকে দুটা আড়াইটা পর্যন্ত নিয়মিত পড়তেন ও লিখতেন। তাই কারও সঙ্গে বসে অহেতুক গল্প করে সময় নষ্ট করার মত সময় তাঁর ছিল না। তবুও তিনি যেটুকু সময় পেতেন, তারই মধ্যে পরিচিত ও অপরিচিতদের সঙ্গে কথাবার্তায়, এমন কি হাসি ঠাট্টায়ও কাটাতেন। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রনাথ বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যেটুকু করে সম্পর্কের কথা আগে বলেছি, তাতেই পাঠক-পাঠিকারা দেখেছেন, তিনি কিরূপ পরোপকারী, দরদী, বন্ধুবৎসল, রসিক ও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। কথাবার্তায়

এবং ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র যে, অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, একথা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু লেখকের বঙ্কিম-স্মৃতি বিষয়ক লেখা থেকেও জানা যায়। শেষে আর একটা কথা, বঙ্কিমচন্দ্র যদি অহঙ্কারীই হতেন, তাহলে রমেশ দত্তর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে তিনি নিজের গলার মালা নিয়ে তখনকার অখ্যাত তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় কখনোই পরিয়ে দিতে পারতেন না। তাই আমার বক্তব্য, তিনি রাসভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কারী ছিলেন না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে 'কর্মযোগী' বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ সাহিত্যিক দ্বারা অহেতুক আক্রান্ত হতেন ব'লে, প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাই এ সম্পর্কে লিখে গেছেন—

'...তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।'

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে ঢাকার বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠির কিছুটা ছেপেছেন। পুরা চিঠিটি আজও কোথাও ছাপা হয়নি। হেমেন্দ্রবাবু কোথায় চিঠিটা দেখেছিলেন জানি না, তবে তিনি তাঁর বইয়ে চিঠির যেটুকু ছেপেছেন, সেটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি—

'আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার বদলি সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছে, তাহা মোটেই বিশ্বাস করিবেন না, স্টেটসম্যান যাহা লিখিয়াছে তাহাই সত্য। সম্পাদক মনে করিয়াছে যে, 'রজনী'তে আমি হীরালালরূপে সম্পাদককে আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপ অনুমান খুবই আশ্চর্যজনক। আমার পক্ষে ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনও সম্ভব নহে।'

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বদলির ব্যাপারটা হ'ল, তাঁকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে অর্থ দপ্তরের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে সরিয়ে পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে উড়িষ্যার জাজপুরে বদলি করা। হেমেন্দ্রবাবু যে পত্রাংশটুকু ছেপেছেন তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তিনি একজনকে আড়াল করবার জন্য এতে নিজের কলম চালিয়েছেন। কারণ, উপরে উদ্ধৃত চিঠির প্রথম বাক্য 'আপনার পত্র পাইয়াছি' দেখে মনে হয়, এই অংশটা মূল চিঠির প্রথম দিকের অংশ। তাই চিঠির প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ 'সম্পাদক যাহা লিখিয়াছে' বা সম্পাদক মনে করিয়াছে, এ কথা কখনই লিখতে পারেন না। বন্ধুর কাছে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি নিশ্চয়ই সম্পাদকের নাম, অন্তত তাঁর কাগজের নাম উল্লেখ করে ছিলেন। বিশেষ করে চিঠিতে যখন স্টেটস-ম্যান পত্রিকার নাম করে ছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ে এই চিঠির প্রসঙ্গে আরও যা যা বলেছেন সে সব ক্ষেত্রেও পত্রিকার বা পত্রিকার সম্পাদকের নাম করেন নি। শুধু বলেছেন— জনৈক পত্রিকা সম্পাদক। এই সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন উক্ত সম্পাদকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছিল। অতঃপর 'রজনী' উপন্যাস বাহির হইলে উপন্যাসের হীরালাল চরিত্র তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া উক্ত সম্পাদক ক্ষোভ করেন।'

হেমেন্দ্রবাবু তাঁর লেখায় পত্রিকার বা পত্রিকার-সম্পাদকের নাম না করলেও জানা গেছে, পত্রিকাটি হ'ল—অমৃতবাজার পত্রিকা এবং এর সম্পাদক হলেন—শিশিরকুমার ঘোষ। তবে হেমেন্দ্রবাবু যে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকার সময় এই সম্পাদকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছিল, তা ঠিক নয়। হেমেন্দ্রবাবু ভুল করে অপরের কথা এই সম্পাদকের উপর চাপিয়েছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকাকালে যে মধ্যস্থ পত্রিকা তাঁকে বার বার আক্রমণ করেছিল, সেই মধ্যস্থ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে। সেইটাই বলছি—

কোন্ কাগজের সম্পাদক বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে চাঁদা আদায়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন, তা জানি না। আর চাঁদার টাকার ঠিক মত সদ্ব্যবহার হয়নি বলে, শচীশবাবু যা বলেছেন, তাও না হয় অস্বীকারই করছি। তবুও একটা কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্য প্রবন্ধ 'গর্দভ' নিয়ে মধ্যস্থে যে 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা রহস্যের সীমা ছাড়িয়ে নোংরামিতে গিয়ে পৌঁছেছিল।

মধ্যস্থে 'বঙ্গদর্শন-গর্দভ' প্রকাশিত হওয়ার বছরখানেক পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রজনী উপন্যাস লেখেন। এর সম্পাদকরূপী হীরালাল চরিত্রটি কোন্ সম্পাদককে লক্ষ্য করে আঁকা তা জানি না, তবে হীরালাল চরিত্রটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন একটি ক্ষোভের প্রতিশোধ তা অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন কম ছিল। আর তিনি যে তখন বেশ রাগী প্রকৃতিরও ছিলেন, তা তাঁর জীবনী পড়েও জানা যায়।

রজনীর হীরালাল চরিত্র অনেকেই পড়েছেন। তবুও এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বইয়েরই উদ্ধৃতি দিয়ে হীরালালের কিছুটা পরিচয় দিচ্ছি—

'হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শেখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র। তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথায় কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল।... তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে

গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশে টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।...অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল।'

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, হীরালাল অর্থলোলুপ ছিল এবং রজনী হীরালালকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায়, হীরালাল তাকে নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে চারদিকে জলের মধ্যে গঙ্গায় এক চরে একা ফেলে পালায়। আর যাবার সময় রজনীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র হীরালালের পত্রিকার নাম দিয়েছেন—স্তম্ভ্‌ভিশ্চশ্চাৎ।

এখানে একটা জিনিস শুধু লক্ষ্য করার এই যে, মধ্যস্থ সম্পাদক তাঁর কাগজের প্রথম পাতাতেই মাথায় একটা দুর্বোধ্য সমাসবদ্ধ বড় শব্দ ব্যবহার করতেন, আর তিনি নাট্যকারও ছিলেন। অনেকগুলি নাটকও লিখেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠির কথা নিয়ে এবার প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি, এখন আবার সেই চিঠিতেই ফিরে আসছি। অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যদি মতবিরোধ ঘটেও থাকে, সেটা তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না। তাই ঐ সম্পাদক সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে যা লিখেছিলেন, তা সত্য। তিনি অন্য কাউকে লক্ষ্য করে হীরালাল চরিত্র চিত্রিত করেছিলেন। তবে ঐ চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, তাঁর জাজপুরে বদলি হওয়া নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা তখন যা লিখেছিল, তাতে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—

We understand that Baboo Bankim chandra chatterji, the officiating Assistant Secretary to the Bengal Government, received a short and sweet note from Mr Secretary Macaulay, on the 22nd January. Mr Macaulay is reported to have written, 'very much pleased with the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour.' The charge against Bankim Baboo is that, during his time, office secrets oozed out fromtthe office.

This is the alleged charge, and which of course every body must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bankim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These secretaries have now come forward with the charge that Bankim Baboo permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr Blyth.

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে অর্থ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক ভদ্রলোক। বাঙ্গালীদের জন্য এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করার পর ঐ পদে বাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপসারিত করার কারণ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ কথা লিখলেও, তখন কিন্তু ইংরাজ পরিচালিত স্টেটসম্যান পত্রিকা অন্য কথা লিখেছিল। স্টেটসম্যানের সেই লেখাটা এই—

'With respect to the statements made by our contemporary, we are informed that no 'charge' of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra Chatterji, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or his abilities. It is a singular thing that if 'office secrets' were devulged during the period for which the Baboo acted as assistant secretary, the head of the office is unaware of the fact, and the words which purport to be an extract from Mr Macaulay's letter were never written by him. Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant....'

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'যাহারা স্টেটসম্যান না পড়িয়া শুধু বাঙ্গালীর কাগজ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের

মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মেকলে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়া ছিলেন। মেকলে সাহেব অপবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাতিশয় সুখ্যাতি করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন।···মেকলে সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গেল। আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি হইল। সিভিলিয়ান ব্লাইথ সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে 'অপসারিত করার আসল কারণটা ছিল, ঠিক ঐ সময় বঙ্গদর্শনে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়া। তিনি আনন্দমঠে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন।

ইংরাজ সিভিলিয়ানরা বাঙ্গলা জানতেন। তাঁরা বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এরই ফলে তাঁর ঐ অপসারণ।

এবার অপরের জন্য সাহায্য চেয়ে বা অপরকে সাহায্য করবার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী অথবা তাঁর কর্মচারীকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর দুটি চিঠির কথা বলছি। এ চিঠিও আজ আর নেই। শুধু চিঠি দুটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, এখানে প্রথমে যে চিঠিটির কথা বলছি, তার উল্লেখ আছে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনী গ্রন্থে। আর শেষের চিঠিটির কথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশন ইন্ মেকিং' গ্রন্থে লিখে গেছেন। চিঠি দুটির প্রসঙ্গ এই—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় বহরমপুরের সংলগ্ন কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী একবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাল দান করবেন স্থির করেছিলেন। মহারাণীর যে কর্মচারীর উপর এই শাল বিতরণের ভার পড়ে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল।

এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সন্ধান পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের বাড়িতে যান। সেখানে জগদীশবাবুকে না পেয়ে তার পুত্র খগেন্দ্রনাথকে বলে কয়ে তাঁকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নেন। খগেন্দ্রবাবু লিখেছিলেন—যাঁর উপরে বিতরণের ভার আছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে একটা চিঠি দেন তো এই গরীব ব্রাহ্মণ একটি শাল পান।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণের হাতে খগেনবাবুর চিঠি পেয়ে তাঁকে বললেন—ঠাকুর, আমি কাউকে সুপারিশ চিঠি দিতে ভালবাসি না। তবে খগেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। তার কথা অগ্রাহ্য করতে পারব না। এই বলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণের হাতে শাল বিতরণকারীর নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ ঐ চিঠির বলে একটি শাল নিয়ে আসেন। শাল নিয়ে ফিরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরের বাসায় দু-একদিন ছিলেনও। ব্রাহ্মণ দেশে ফিরিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বললেন—ঠাকুর, আমার বাড়ি থেকে আপনি শুধু হাতে ফিরলে, আমার উপর আপনি প্রসন্ন হবেন না বলে মনে হচ্ছে। তাই এই যৎ সামান্য কিছু দিলাম নিন। এই বলে তিনি ব্রাহ্মণের হাতে দশটি টাকা দিলেন।

ব্রাহ্মণ শাল এবং টাকা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন' বা ভারত সভা নামক ভারতীয়দিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই সভার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির শেষ কয় পংক্তি যা পাওয়া গেছে, তার উল্লেখ করেছি। এবার এই ভারত সভা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি চিঠির কথা উল্লেখ করছি। চিঠিটি পাওয়া না গেলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'এ নেশন ইন মেকিং' নামক আত্মজীবনীতে এই চিঠির কথা লিখে গেছেন। সেই চিঠির ইতিহাসটা এই—

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সভা স্থির করেন যে, শুধু ভারতবর্ষেই এখানকার ইংরাজদের কাছে আমাদের দাবী-দাওয়ার কথা জানালে চলবে না। ইংলণ্ডে গিয়েও শাসক ইংরাজ জাতির কাছে ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কথা প্রচার করতে হবে। এজন্য ভারত সভা লালমোহন ঘোষকে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তখন এঁর বিলাতে যাতায়াত এবং সেখানে থাকার খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে।

ঐ সময় ভারত সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যান। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টার কিছুদিন আগেই বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বহরম-

পুরে থাকার সময় সেখানকার কাশিমবাজার রাজবাড়ির লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাই সুরেনবাবু গেলে, সুরেনবাবুর হাতে কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে একটি চিঠি লিখে দেন।

সুরেনবাবু এবং তাঁর সঙ্গী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি নিয়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে যান। মহারাণী বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি পেয়ে ভারত সভাকে তখন কয়েক হাজার টাকা দান করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সুরেনবাবু লিখে গেছেন—

The only substantial sum that we obtained was from the Maharani Swarnamoyee. I fortified myself with a letter from Baboo Bankim chandra chatterji, the great Bengalee novelist, who evinced the utmost sympathy with the whole movement. Armed with this letter and accompanied by my indefatigable friend Babu Dwarakanath Ganguli, we called upon Rai Rajib Lochan Rai Bahadur, manager of the Maharani Swarnamoyee's estate, at his house at Berhampore. The old man received us with kindness, but he promised us only one-half of what we wanted. We thanked him, of course, though we made it clear that we expected more. We took leave of him, and as we were about to step into the street from his house, summoned us back and said 'I have reconsidered the matter and promise the whole amount you want', We thanked him very heartily and left his house, blessing him and the Maharani Swarnamoyee.'

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের যে অপ্রকাশিত ডায়রির কথা আগে বলেছি, সেই ডায়রি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। এ সম্বন্ধে নবকৃষ্ণবাবু যা লিখে গেছেন, তা এই—

'প্রকৃতি নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতির মোকদ্দমা বেধেছিল। কারও কথাতেই কালীপ্রসন্নবাবু মামলা মিটিয়ে নিতে চাইলেন না। অবশেষে ঐ মামলা মিটিয়ে দেবার জন্য বঙ্কিমবাবুকে ধরা হয়েছিল। মামলাটি মিটিয়ে ফেলবার জন্য বঙ্কিমবাবু কালীপ্রসন্নবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর চিঠি পেয়ে কালীপ্রসন্ন-বাবু বঙ্কিমবাবুকে টেলিগ্রাম করেন—

'Will pay your letter every attention. Letter follows.'

বঙ্কিমবাবুর মধ্যস্থতায় মামলাটি অচিরেই মিটে গিয়েছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, ঐ টেলিগ্রামখানি অবিনাশবাবুকে দেখাবার জন্য বঙ্কিমবাবু আমাকে দেন।'

নবকৃষ্ণবাবুর এই ডায়রিতে অবিনাশবাবু উল্লেখ থাকলেও অবিনাশবাবুর পুরা নাম নেই। এবং প্রকৃতি পত্রিকার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির কেন মামলা বেধেছিল, আর কিভাবেই বা মামলাটি মিটে গিয়েছিল, তারও কোন কথা নেই। তখনকার দিনে এই মামলাটি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে একটি বহু আলোচিত চাঞ্চল্যকর মামলা ছিল। এই ভেবেই হয়ত নবকৃষ্ণবাবু মামলার পুরা বিবরণ, এমন কি অবিনাশবাবুর পুরা নামও উল্লেখ করে যান নি।

প্রকৃতি সম্পাদকের এই মামলায় পড়ার কথা এবং মামলা মিটিয়ে নেবার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি লেখার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থেও লিখে গেছেন। তবে হেমচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস' নামক গ্রন্থে এই মামলার ও মামলা মিটে যাওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস দিয়েছেন। এই মামলা সম্বন্ধে শচীশ-বাবুর লেখাটি প্রথমে উদ্ধৃত করছি। পরে হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর দীর্ঘ লেখাটির সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি। শচীশবাবু লিখেছেন—

'সাহিত্যিক মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ দিতে

ও বিপদে সাহায্য করিতে কখন তিনি পরাম্মুখ হইতেন না। একবার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম প্রকৃতি। অনুকূলবাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গোবিন্দচন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই তো কালীপ্রসন্নবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিয়া ছিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকিল, মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবত রাজার। দরিদ্র সাহিত্য-সেবী অনুকূলবাবু মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের শরাণগত হইলেন। সেন মহাশয় মোকদ্দমা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

অবশেষে অনুকূলবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না···যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপানাবলী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূলবাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্নবাবুকে পত্র লিখিলেন—'অনুকূল সাহিত্য সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদগ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে ও অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল জানিবে।'

এই মামলার ব্যাপারে নবকৃষ্ণবাবুর ডায়রিতে অবিনাশবাবুর নাম আছে। শচীশবাবুর লেখায়—কিন্তু অবিনাশ নেই, আছে অনুকূল। সম্ভবত অবিনাশ-বাবু অনুকূলবাবুর ভাই অথবা অন্য কোন নিকটজন ছিলেন। অনুকূলবাবু মামলার ওয়ারেণ্টের বলে বা মামলার তদ্বিরের জন্য ঢাকায় গেলে তখন নবকৃষ্ণবাবু ঐ অবিনাশবাবুকেই টেলিগ্রামটা দেখিয়ে এসেছিলেন।

শচীশবাবুর বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষের ন্যায় কবি গোবিন্দ দাসেরও পরিচয় ছিল। শচীশ-বাবু লিখেছেন—'আমি ১২৯২ সালের কথা বলিতেছি। সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র

সানকিভাঙ্গার বাটীতে থাকেন। প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত সাহিত্যিকেরা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করিতেন—চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার···। সময় সময় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিতেন।'

কলকাতার যে পল্লীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ঐ পল্লীটিরই নাম সানকিভাঙ্গা। এখানে তিনি ভবানী দত্ত লেনে থাকতেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রকৃতি-সম্পাদকের নামে মামলা করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব শচীশবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ মামলার অন্তত আট বছর আগে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় ছিল। তাই প্রকৃতি-সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সম্পাদকের বিপদের জন্য তো বটেই, তাছাড়া গেবিন্দচন্দ্রই ঐ মামলার মূল জেনেও মামলা মিটিয়ে নেবার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষকে অনুরোধ করে থাকতে পারেন।

যাই হোক, হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস' গ্রন্থ থেকে এবার ঐ মামলার কিছুটা বিবরণ দিচ্ছি—

ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী ১২৮৩ সালে প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে নিজ রাজ্যের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী বা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। এর কিছুদিন পরেই ভাওয়াল-জয়দেবপুরের অধিবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস রাজা কালীনারায়ণের পুত্র কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হন। ঐ সময় রাজকুমারের বয়স ছিল বছর উনিশ।

রাজা কালীনারায়ণ পুত্র এবং মন্ত্রীর উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বেরোন। তরুণ রাজকুমার আবার মন্ত্রী কালীপ্রসন্নর উপর ভার দিয়ে নিজে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতে থাকেন।

গোবিন্দচন্দ্র নিজ কর্তব্য হিসাবে রাজকুমারকে প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করতেন। রাজকুমার যেমন গোবিন্দচন্দ্রের কথায় কান দিতেন না, মন্ত্রী কালীপ্রসন্নও তেমনি গোবিন্দচন্দ্রের ঐ আচরণের জন্য তাঁর উপর বিরক্ত হতেন।

ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা এই—রাজা কালীনারায়ণের

তিন বিবাহ ছিল। তাঁর দ্বিতীয়া রাণীর ভগিনীপুত্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), তৃতীয়া রাণীরও ভগিনীপুত্র শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং ব্যাঙ্গা খানসামা একরাত্রে মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে জনৈক বেচু শিকদারের বাড়িতে কু-অভিপ্রায়ে যায়। গিয়ে বাইরের দরজায় আঘাত করতে থাকে এবং দরজা খুলে দিতে বলে। বেচু বাড়িতে ছিল না। তার স্ত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকে।

চিৎকার শুনে বেচুর ভৃত্য বাইরে এলে শ্যামাচরণরা তাকে খুব প্রহার করে চলে যায়।

বেচু বাড়ি এসে সমস্ত শুনে রাজদরবারে নালিশ জানাল। মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন বিচার করে কেবল ব্যাঙ্গার পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন এবং দুই শ্যামাচরণকে বেকসুর খালাস দিলেন।

এই বিচারে ভাওয়ালের প্রজামণ্ডলী বিস্মিত হলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্রও বেদনা বোধ করলেন। তিনি এ সম্পর্কে পুনর্বিচারের জন্য রাজকুমারকে অনুরোধ জানালেন।

রাজকুমার পুনর্বিচারে অস্বীকৃত হলে, গোবিন্দচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন পুনর্বিচার করাবেনই। এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি ভাওয়ালের জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে বোঝালেন এবং একদিন পুনর্বিচারের দাবীতে বিশাল জনতা নিয়ে রাজদরবারে এসে হাজির হলেন। জনতা জানাল, পুনরায় বিচার না হলে তারা নিজেরাই ঐ অন্যায়ের বিচার করবে।

রাজকুমার বিশাল জনতা এবং তাদের কথা শুনে ভীত ও বিচলিত হলেন। শেষে পুনর্বিচারে রাজী হলেন। এবার বিচারক রাজকুমার নিজে এবং মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন। বিচারে রায় হল—শ্যামাচরণদ্বয় রাজার জমিদারীতে যে যে পদে নিযুক্ত ছিল, তা থেকে বরখাস্ত হল এবং ব্যাঙ্গার ৫০০ টাকা জরিমানা হল। ব্যাঙ্গা সম্বন্ধে আরও একটা ব্যবস্থা হল—যতদিন না লোকে তার সম্বন্ধে ভাল মত পোষণ করবে, ততদিন সে রাজ্যের একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জুতো পায়ে ও ছাতা মাথায় দিতে পারবে না।

এই বিচারেও গোবিন্দচন্দ্রের হৃদয়ের বেদনা দূর হল না। তখন তিনি রাজদরবারের সকলের সামনেই রাজগৃহের তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। অবশ্য পুনর্বিচার করানোর পরে তাঁর পক্ষে আর চাকরি করাও মুশকিল ছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কলকাতায় 'নবযুগ' নামক একটি সাপ্তাহিক

পত্রিকায় ভাওয়ালের উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও মন্ত্রী কালীপ্রসন্নর বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন রাজাকে বোঝালেন, এ রচনা গোবিন্দচন্দ্রেরই। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁর জন্মভূমি জয়দেবপুর থেকে নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র এই আদেশ শুনে রাজাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ঐ রচনা তার নয়, তিনি নবযুগে কখনও লেখেন নি। এজন্য তিনি সাক্ষী হিসাবে নবযুগ-সম্পাদককেও আনতে চেষ্টা করবেন।

রাজা, গোবিন্দচন্দ্রের কোন কথাতেই আর কান দিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র চিরদিনের জন্য নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হলেন। নির্বাসিত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র কলকাতায় এসে ঠিক করলেন--না লিখেও যখন লিখেছি এই অপবাদ নিলাম, তখন এবার সত্য সত্যই লিখব।

এই ঠিক করে ভাওয়াল রাজদরবারের বহু অনাচার, অত্যাচার ও কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র 'মগের মুলুক' নামে এক বিদ্রূপ রসাত্মক কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। কাব্যটি যথা সময়ে ১২৯৯ সালে কলকাতার 'প্রকৃতি' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হল।

প্রকৃতিতে মগের মুলুক প্রকাশিত হলে ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন প্রকৃতির সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারীর নামে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে নালিশ করেন। প্রকৃতির পরিচালকগণ ওয়ারেন্টের বলে গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা যেতে বাধ্য হলেন।

প্রকৃতির পরিচালকবর্গের এই বিপদে গোবিন্দচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তিনি কলকাতায় তাঁর বন্ধু নব্যভারত পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে ধরে ঢাকার এক উকিলের সাহায্যে মামলা লড়ার ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থা করে তিনি একদিন প্রকৃতির পরিচালকবর্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি গেলে সেদিন তাঁর সঙ্গে ভীত, দরিদ্র ও দুর্বল-প্রকৃতির এঁরা কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন এবং মামলাটিরও কিভাবে সমাপ্তি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে এবার হেমবাবুর 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' বই থেকেই উদ্ধৃত করছি—

'...তাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে আর বাক্যালাপ না করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তখন কবি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে,

নির্ভীকতা এবং আত্মসম্মানবোধ এই ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, তথা হইতে কবি ফিরিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তিনিই অনুষ্ঠাতা হইয়া এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন। ঢাকার জনৈক বিশ্বস্ত সাহিত্য-সেবকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এই মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি নাকি সেই পত্র দেখিয়াছেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভা আহূত হয় এবং প্রকৃতি-সম্পাদক উক্ত সভায় ঘোষ মহাশয়কে একখানি ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে সম্পাদক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বলেন।

যথাসময়ে তাহা বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রার্থনা করেন। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত 'ক্ষমাপত্র' প্রত্যেক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক কাগজে (তখন দৈনিক বাঙ্গলা কাগজ ছিল না) প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যথা সময়ে তাহা বঙ্গদেশের প্রায় সকল কাগজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সময়কার দেশের লোকে জানিতে পারিয়াছিল যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন। এতদুপলক্ষে দাস-কবি একখানি পত্র আমাদিগকে একবার লিখিয়া ছিলেন—

প্রকৃতি-সম্পাদক আমার লিখিত 'মগের মুলুক' এর পাণ্ডুলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়েছিলেন এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকদ্দমা করিতে সাহস পায় নাই।'

এই মামলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে—বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ক্ষমাপত্র লিখিয়ে নিয়ে মামলা মিটিয়ে নিতে বলেন নি। তিনি অমনিই মামলা মিটিয়ে নিতে বলেছিলেন। প্রকৃতি-সম্পাদক নিজে গিয়ে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন তিনি কখনই সাহায্যপ্রার্থীকে এইভাবে হেয় করে মামলা মিটিয়ে নিতে বলতে পারেন না।

ঢাকায় একজন সাহিত্য-সেবক বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি দেখেছিলেন বলে

হেমবাবু তাঁর গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন। চিঠিতে যদি ক্ষমাপত্র লিখিয়ে নেওয়ার কথা থাকত, তাহলে হেমবাবু সে কথা ঐ সাহিত্য-সেবকের মুখে নিশ্চয়ই শুনতেন এবং লিখেও যেতেন।

প্রকৃতি-সম্পাদককে দরিদ্র ও দুর্বল প্রকৃতির দেখেই বুদ্ধিমান ও চতুর রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমাপত্রের কথা কিছুই জানতেন না। পরে হয়ত কাগজে দেখেছিলেন বা শুনেও ছিলেন।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের যে ডায়রির কথা নিয়ে আরম্ভ করেছি, সেই ডায়রির কথায় আবার ফিরে আসছি। ঐ ডায়রির এক জায়গায় নবকৃষ্ণবাবু লিখেছেন—'রাজকৃষ্ণ রায়কে বঙ্গদর্শনে লিখবার জন্য বঙ্কিমবাবু একবার চিঠি লিখেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনে লিখলে কলম পিছু দেড় টাকা করে দক্ষিণা পাওয়া যেত। রাজকৃষ্ণবাবুকে দক্ষিণার কথাও জানানো হয়েছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই এ কথা শুনেছিলাম। বঙ্গদর্শনে একবার কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর লেখা বাতিল করে নগেন্দ্রনাথ বসুর একটি রচনা দেওয়া হয়েছিল।'

নবকৃষ্ণবাবু রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় তাঁর সহকারী ছিলেন এবং রাজকৃষ্ণবাবুর 'বীণা' প্রেসের তদারককারী কর্মীও ছিলেন। অতএব রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে বঙ্গদর্শনে তাঁর লেখা ও দক্ষিণার কথা শোনা নবকৃষ্ণবাবুর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এখানে নবকৃষ্ণবাবুর ডায়রির ঐ লেখা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লুপ্ত চিঠিটির কথা ছাড়াও আরও দুটি বিষয় সম্বন্ধে জানা গেল। (১) বঙ্গ-দর্শন প্রতি পৃষ্ঠা দু কলমে ছাপা হত। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র এক পৃষ্ঠা লেখার জন্য লেখককে তিন টাকা সম্মান দক্ষিণা দিতেন। একশ বছরেরও আগে তখনকার তিন টাকার মূল্যমান আজকের ত্রিশ টাকারও অনেক বেশী ছিল। তাই মাঝারি আকারের বঙ্গদর্শনের এক পৃষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের ভালই দক্ষিণা দিতেন বলা যেতে পারে। (২) বঙ্কিমচন্দ্র কোন লেখকের কাছ থেকে নিজে লেখা চেয়ে নিলেও, পছন্দ না হলে, সে লেখা বাতিল করতে এতটুকুও ইতস্তত করতেন না। কারণ, বঙ্গদর্শনের উচ্চ মান বজায় রাখাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছোট্ট চিঠি ছেপেছেন, আর একটি চিঠির কথা শুধু উল্লেখ করে গেছেন। যে চিঠিটি ছেপেছেন, তাতে শচীশবাবুর চাকরিতে সুখ্যাতির কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের খুশী হওয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের বাড়ির খবর দেওয়া—এই ধরণের কয়েকটা কথা আছে মাত্র।

শচীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটির কথা শুধু উল্লেখ করেছেন, সেটির সম্বন্ধে লিখেছেন—'একবার তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বায়ু পরিবর্তন উদ্দেশে কিছু দিনের জন্য চন্দননগরে বাস করেন। বাড়িটি অতি সুন্দর দ্বিতল, গঙ্গার উপর। তিনি কিছুদিন তথায় একাকী থাকিয়া পত্র লিখেন—তোমার খুড়ীকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।

আমি খুড়ীমাকে লইয়া একদিন প্রাতঃকালে চন্দননগরে আসিলাম।... আমায় বলিলেন—তোমার খুড়ীকে বাগান দেখাইয়া লইয়া এস। আমি স্নান করিয়া লই।'

এরপর এই প্রসঙ্গেই শচীশবাবু লিখেছেন, তিনি যখন তাঁর খুড়ীমা অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বাগান দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে আবার বাড়ির কাছে ফিরে এলেন, তখন বাড়ির দুতলায় ক্রুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ভীষণ চিৎকার শুনতে পেলেন। পরে তাঁরা জানতে পারলেন, ভৃত্য স্নান করাবার সময় ভুল করে যে কলসীতে অত্যধিক গরম জল ছিল, সেই কলসীর জল বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় ঢেলেছিল। মাথায় ঐরূপ অত্যধিক গরম জল পড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ভৃত্যের উপর রেগে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভৃত্যরা কলসীতে করে জল নিয়ে সেই জল ঢেলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে স্নান করাতো, তার একটা কাহিনী এখানে বলছি—

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের তৈরি একতলা বৈঠকখানা বাড়িটির চারটি ঘরের মধ্যে এক পাশের যে ঘরটিতে তাঁর ভৃত্য মুরলী থাকত, সেই ঘরের মেঝে এবং ছাদের মাঝখানে আর একটি ছাদ ছিল। মূল ছাদে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে ঐ ঘরের মাঝের ছাদে যাওয়ারও একটা দরজা ছিল। এই মাঝের ছাদের উপরের ছাদে ঠিক মাঝখানটিতে একটি মাঝারি গোছের

গোলাকার ঝাঁঝরি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নানের সময় তাঁর ভৃত্য কয়েক কলসী জল নিয়ে উপরের ছাদে ঝাঁঝরির পাশে বসে থাকত, আর বঙ্কিমচন্দ্র মাঝের ছাদে ঝাঁঝরির নীচে বসতেন। ভৃত্য ঝাঁঝরির মুখে ধীরে ধীরে কলসী থেকে জল ঢালত, সেই জল ফোয়ারার মত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গায়ে-মাথায় পড়ত। এইভাবে তিনি কৃত্রিম ফোয়ারার জলে স্নান করিতেন। বলা বাহুল্য যে, মাঝের ছাদে পড়া জল পাইপ বেয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে পড়ত। এই ঘরটি আজও আছে বটে, কিন্তু স্নানাগারটি আজ আর নেই।

এবার একটা কথা—শচীশবাবু যে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চন্দননগর থেকে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন—তোমার খুড়ীকে নিয়ে এখানে চলে এস, শচীশবাবুর এই কথা থেকে আমার এও দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ সঙ্গে স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকেও একটা চিঠি দিয়েছিলেন, অন্তত এই বলে যে, শচীশকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চলে এস।

এরূপ বিশ্বাস বা অনুমান করার হেতু এই যে, প্রথমত—রাজলক্ষ্মী দেবী সেকালের তুলনায় ভালই লেখাপড়া জানতেন। দ্বিতীয়ত—ভাসুরপো জ্যোতিশকে লেখা রাজলক্ষ্মী দেবীর যখন একাধিক চিঠি পাচ্ছি, তখন এটা অনুমান করা ভুল হবে না যে, তিনি তাঁর স্বামীকেও নিশ্চয়ই লিখতেন আর বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে চিঠি লিখতেন।

পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পারিবারিক চিঠি পেয়েছি, কিন্তু স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিও পাই নি। ঠিক এমনি বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখা রাজলক্ষ্মী দেবীরও কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। পাওয়া না গেলেও বেশ অনুমান হয়, কাঁটালপাড়া অথবা কলকাতায় পরিবার রেখে বঙ্কিমচন্দ্র যখন একা বাইরে কর্মস্থলে থাকতেন, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন এবং রাজলক্ষ্মী দেবীও স্বামীকে চিঠি দিতেন।

স্ত্রীকে চিঠি লেখার অভ্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র দুবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল সেকালের প্রথা অনুযায়ী বাল্যেই এগার বছর বয়সে। প্রথমা স্ত্রী মোহিনী দেবীর বয়স ছিল তখন মাত্র পাঁচ। মোহিনী দেবীর পিতা নবকুমার চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রদের কাঁটালপাড়ার বাড়ির মাইল দুই দক্ষিণে নারায়ণপুর গ্রামে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন বাইশ এবং মোহিনী দেবীর বয়স ষোল সেই সময় কয়েক দিনের জ্বরে ভুগে মোহিনী দেবী হঠাৎ মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাড়িতে ছিলেন না, কর্মস্থল যশোহরে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোন কোন লেখকের লেখা থেকে জানা যায়, মোহিনী দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর থেকে স্ত্রীকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—তোমাকে এবার শীঘ্রই এখানে নিয়ে আসবো।

মোহিনী দেবী লেখাপড়া জানতেন। তিনি স্বামীর ঐ চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। স্বামীর কাছে থাকতে পাবেন, এই আনন্দে তিনি তখন সেই চিঠি অনেককেই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও মোহিনী দেবীর—তাঁদের সে আশা আর পূর্ণ হয়নি।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হলেও পিতামাতার আদেশে, বিশেষ করে অভিন্নহৃদয় বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক মাস পরে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এবার পাত্রী কাঁটালপাড়ার অদূরেই হালিশহরের। নাম রাজলক্ষ্মী দেবী, বয়স বার। রাজলক্ষ্মী দেবীর পিতা সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল অন্য জায়গায়। তিনি হালিশহরে গৃহ-জামাতা হিসাবে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে হালিশহরে গিয়ে পাত্রী পছন্দ করে এসেছিলেন।

এখন আমার কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমা স্ত্রীকে যখন চিঠি লিখতেন বলে জানা যায়, তখন তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও চিঠি লিখতেন। বিশেষ করে রাজলক্ষ্মী দেবী মোহিনী দেবী অপেক্ষা আরও বেশী শিক্ষিতা ছিলেন।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মী দেবীকে নিশ্চয়ই চিঠি লিখতেন বলে যেমন অনুমান করছি, তেমনি কোন চিঠি পাওয়া না গেলেও এও অনুমান করছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুদেরও অবশ্যই চিঠি লিখতেন। কেন তা বলছি—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমার দেখা লোক' বইয়ে লিখে গেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় তাঁদের বাড়ির কাছে থাকতেন তখন হেমচন্দ্র প্রায়ই কলকাতা থেকে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় সানকিভাঙায়

থাকার সময় অনেকের সঙ্গে হেমচন্দ্রও প্রতি রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করতেন। আরও কারও কারও লেখায় জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বৌবাজার স্ট্রীটে থাকতেন তখন প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকরা তাঁর কাছে আসতেন। বৈঠকে সাহিত্য আলোচনা হ'ত, আর রাজলক্ষ্মী দেবী অন্দরমহল থেকে 'ঠাকুর' মারফৎ গরম লুচি তপ্‌সে মাছ ভাজা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন। বঙ্গদর্শনের শুধু লেখক হিসাবেই নয়, বন্ধুত্বের সূত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হেমচন্দ্রের নানাভাবে যোগাযোগ ছিল। তাই এঁকেও নিশ্চয়ই চিঠি লিখতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও দক্ষ অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শুধু বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখকই ছিলেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়ও ছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বিখ্যাত বই 'নানা প্রবন্ধ'র প্রতিটি প্রবন্ধই বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসটি এঁকে উৎসর্গ করেন। এমন কি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণবাবুর 'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনাটিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বহুভাষাবিদ্ এই রাজকৃষ্ণবাবু কিছু কম বয়সেই মারা যান। তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন চিঠি পাওয়া না গেলেও তাঁর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে তখন কলকাতায় যে শোকসভা হয়েছিল, সেই শোকসভার একটি ছেঁড়া চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সৌজন্য ও অমায়িকতা গুণে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মৃত্যু হওয়ায় দুঃখে সকলের একবার মিলিত হওয়া আবশ্যক···আগামী ২রা ফাল্গুন রবিবার বেলা চারটার সময়···অক্রুর দত্তের গলি ১৮ নং ভবনে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে সভা আহ্বান করা হইবে। অনুরোধ আপনারা সভায় উপস্থিত হইবেন। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত

চিঠির গোবিন্দলাল দত্ত ছিলেন, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক। বৌ-বাজারের অক্রুর দত্ত লেনে অবস্থিত এই সাবিত্রী লাইব্রেরী ছিল একটি বিখ্যাত লাইব্রেরী। এর প্রশস্ত হলে তখন নানা ধরণের সাহিত্য সভা প্রায়ই হ'ত।

শচীশবাবুর বই থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। তার কাহিনীটা এই—

ভারতের তৎকালীন ইংরাজ সরকার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'রায় বাহাদুর' এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে সি. আই. ই, উপাধি দিয়েছিলেন। সি, আই. ই, উপাধি প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—

'দরবার হইল একুশে মার্চ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মৃতুশয্যায় শায়িত। সুতরাং তিনি দরবারে যাইতে পারেন নাই।'

আর 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—সেই সময় এই নিয়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'উপাধি-উৎপাত' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

নগেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন—'যদি এ কথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিমবাবু রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্ধা করিতে পারিতাম।'

এই প্রসঙ্গেই শচীশবাবু লিখেছেন—'ইহার কিছুদিন বাদে সাহিত্য-সম্পাদক একখানি বিশ্বস্ত পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম সকলকে জানাইয়া তিনি বলিলেন যে, নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক, গেজেটে উপাধির তালিকা-মুদ্রিত হইবার পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। এই পত্র বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছিলেন।'

শচীশবাবু সাহিত্য-সম্পাদকের নাম না করলেও ইনি হলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুরেশবাবু তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' নামক বিখ্যাত বইটিতে চারটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ের বহু আলাপ-আলোচনার কথা বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন।

শচীশবাবুর বই থেকে এইরূপ আরও একটি লুপ্ত চিঠির কথা জানা যায়। সেই চিঠিটির প্রসঙ্গে শচীশবাবু লিখেছেন—

'একবার একটি বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া খামের উপর মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লিখিয়াছিলেন—এ বাড়িতে মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই। আপনি বোধ হয়, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইংরাজ-স্তোত্র' লেখাটার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকেও শচীশবাবুর ঐ লেখার সত্যতা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।...

হে মানদ! আমায় টাইটেল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি।...

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চশমা দিব, কাঁটা-চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিযা তোমার ভাষা কহিব, পৈতৃক ধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টার লেখাইব। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'ইংরাজ স্তোত্র' রচনা থেকে উদ্ধৃত করে যে দেখালাম, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—কাঁটা চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব ইত্যাদি, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবনেরও পরবর্তীকালের একটা অনুশোচনা। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এক সময়ে সাহেবী ভাবাপন্ন হয়ে কাঁটা-চামচে ছাড়া খেতেন না। পরে তিনি কিভাবে কাঁটা-চামচ ছাড়লেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর পরিচিত মজিলপুরের কালীনাথ দত্তর কাছে একদিন গল্প করেছিলেন। কালীনাথবাবু সেই গল্পই এইভাবে লিখেছেন—'একদিন তিনি কাঁটা-চামচ হস্তে একটি কৈ-মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃপুন বিফল প্রযত্ন হইতেছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—কি বিড়ম্বনা! উপায় থাকিতে কি কর্মভোগ।—এই কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল।'

এরপর তিনি শুধু কাঁটা-চামচে খাওয়াই ছাড়েন নি, মাছ-মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তখন যশোহর জেলার ঝিনাইদহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র একবার তাঁর বিশেষ পরিচিত শোভাবাজার রাজবাড়ির কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন মনস্থ করেন। এবং এও ঠিক করেন যে, টেবিল চেয়ারে কাঁটা-চামচে ভোজের আয়োজন করবেন। এই স্থির করে তিনি কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর কাঁটা-চামচগুলো চেয়ে পাঠান। এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এই—

প্রিয়তমেষু,

মুরলী যে কাঁটালপাড়ায় যায়, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। বড়বাবুর চাকর নাই। চাকর যাহাকে যাহাকে বহাল করিয়াছিলেন, তাহারা পলাইয়াছে। কেহ থাকিতে চাহে না। আজ তিনি পৃথক বাসা করিয়াছেন তাঁহার বাসায় অটল মোতায়েন আছে। অতএব মুরলীকে পাঠাইলে আমার বাসার কাজ চলিবে না। অটল মুরলী উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে বড়বাবুরও কার্য চলে না। কেন না তাঁহার বাসায় জনপ্রাণী নাই।

আমারও কাঁটালপাড়ায় যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বড়বাবুর অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তন হইতেছে। কখন কি রকম হয়, তাহা স্থির নাই। তিনি আমাকে কোথাও যাইতে দেন না। রাত্রে উঠাইয়া আনেন। সুতরাং তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় যাইতে পারিব না।

তোমার জ্যেষ্ঠতাতের এই মরণাপন্ন অবস্থা, আর তোমার পিতাও শয্যাগত। এই অবস্থায় তুমি যে ভোজের ঘটা বাধাইয়াছ, তাহা অতি বিস্ময়কর। তোমার বালকবুদ্ধি আজও যায় নাই।

যাহা হউক, সেখানে মুরলীর যাওয়া হইল না। সেখানে লোকাভাবে অটলকে পাঠান হইল না। আমার ছুরি-কাঁটা যাহা ছিল, তাহা ঝিনাইদহ হইতে আসিবার সময় Shirres সাহেবকে দিয়া আসিয়াছি। বেসেট যাহা আছে, তাহা টেবিলে বাহির করা যায় না।

আমার বিবেচনায় যদি গোপেন্দ্রকৃষ্ণকে খাওয়াইতে হয়, তবে আমাদের দেশী ব্যঞ্জনাদি উত্তম করিয়া খাওয়াইলেই ভাল হইতে পারে। তুমি যে ২৷৷ টাকা পাঠাইয়াছিলে, তাহা ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি তাং বুধবার

—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের দাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি উপদেশ এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশীয় প্রথার উপরও তাঁর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার সাহিত্য-সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন, আর একটি চিঠির কথা শুধু মোটামুটি বক্তব্য সহ উল্লেখ করে গেছেন। যে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন, তার একটা অংশ এই—

সাদর সম্ভাষণম্,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারী চরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আমি চন্দ্রবাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেন না আপনার বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়বাবু আপনার সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।...ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্মণঃ

এই চিঠির চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়বাবু হলেন, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কৃষ্ণকান্তের উইল বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২তে। বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে যে বলেছেন, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময় কিছুদিনের জন্য তাঁকে কলকাতা থেকে অতি দূরে যেতে হয়েছিল, সেটা হল, ঐ সময় তিনি উড়িষ্যার কটক জেলায় জাজপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

এই চিঠির প্রসঙ্গে আর একটা কথা—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু বইয়ের ক্ষেত্রেই আগে কাগজে প্রকাশিত হলে, পরে বই করবার সময় আগের লেখার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। আবার বই-এর বিভিন্ন সংস্করণেও সংশোধন করেছেন। যেমন—আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১২৮৭-৮৯ সালের বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-দর্শনে যা প্রকাশিত হয়, পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় তার কিছু পরিবর্তন করেন। আবার দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ও পরিবর্তন করেন। এমন কি পঞ্চম সংস্করণের সময়ও একটা পরিচ্ছেদ (আগের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ বাদ দেন।

গিরিজাবাবু তাঁর বইয়ে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠিটির কথা উল্লেখ করেছেন, এবার সেই চিঠিটির সম্বন্ধে কিছু বলছি—

গিরিজাবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময় উপন্যাসগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী এই তিনটিকে প্রথম স্তরে, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে তৃতীয় স্তরে, বাকি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতিকে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এইরূপ স্তর বিভাগের হেতু সম্বন্ধে গিরিজাবাবু বলেছেন—'প্রথম স্তরের উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই উপন্যাসগুলি লিখেন নাই।...পাঠকের চিত্তরঞ্জন মাত্র এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল...। লোকশিক্ষাই তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।... মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা উভয় স্তরের উপন্যাসেরই লক্ষ্য। তবে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে সে সমস্যা যত স্থূল, যত সাধারণ—তৃতীয় স্তরের সমস্যা সেরূপ নহে। ধর্মপথে যাঁহারা একটু অগ্রসর, তৃতীয় স্তরের উপন্যাস তাঁহাদিগেরই উপযোগী।...'

গিরিজাবাবু তাঁর বইয়ে এইরূপ স্তর বিভাগ করে আলোচনার পর শেষে লিখেছেন—'আমরা এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলাম—আপনার এই শেষ উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে প্রথমের উপন্যাসগুলি বড়ই তরল প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়।—এই কথার উত্তরে গ্রন্থকার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—'এ সম্বন্ধে তোমার যে মত অনেকেরই সেই মত।'

গিরিজাবাবু তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠিটির একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করলেও বা বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে একটি মাত্র বাক্যে বললেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে এই প্রসঙ্গেই হয়ত আরও কিছু কথা বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়েই গিরিজাবাবুকে আরও যে দু-একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলিও আজ আর পাওয়া গেল না। নষ্ট হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা) সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরা পাতা' পড়ে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সরলা দেবীকে একবার একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিটিও আজ আর নেই। ঐ চিঠির প্রসঙ্গে সরলা দেবী লিখেছেন—'ভারতীতে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে তাঁর লেখা চিঠি।…বঙ্কিমের লিপিখানি ছিল পুরো বঙ্কিমী ঠাটের সাহিত্যের একখানি হীরের কুচি। বিদূষক সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। তার উল্লেখ করে 'গরীব বিদূষকের' পক্ষ নিয়ে তাঁর সরল লেখনী দুই এক ছত্রে কি হাস্যের ছটাই তুলেছিল! তাই বলছি, তাঁর চিঠিখানি ছিল একটি সাহিত্যের ক্ষুদ্র রসকুণ্ড।…

বঙ্কিমের চিঠির সাথী হয়ে এসেছিল সেদিন তাঁর নিজের এক সেট বই উপহার—অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন। তাঁর হস্তলিপি যুক্ত সে বইগুলিও রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' নামক প্রবন্ধে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি লুপ্ত চিঠির উল্লেখ করে গেছেন। সেই চিঠিগুলির মধ্যে কেবল একটি ছোট্ট চিঠি, যার বক্তব্য ছিল মাত্র তিনটি শব্দে এবং শব্দ তিনটিও মনে রাখার মত ছিল বলে পূর্ণচবাবু সেই চিঠির তিনটি শব্দই অর্থাৎ ছোট্ট চিঠির পুরা ভাষাটাই বলে গেছেন। সেই চিঠির ইতিহাস এবং চিঠিটি হল এই—

দীনবন্ধু মিত্র বহু বৎসর উড়িষ্যা বিভাগ, নদীয়া বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের ইন্‌সপেকটিং পোস্ট মাষ্টার ছিলেন। তখন তাঁর কাজ ছিল, অনবরত ঐ সব এলাকার নানা স্থানে ঘুরে সেখানকার পোস্ট অফিস সমূহের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগের ইন্‌সপেকটিং পোষ্ট মাষ্টার থেকে কলকাতায় সুপারনিউমররি ইন্‌সপেকটিং পোস্ট মাস্টার হিসাবে নিযুক্ত হন। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কাজে সাহায্য করাই ছিল ঐ পদের কাজ।

দীনবন্ধুর কাজে ও কর্তব্য-নিষ্ঠায় পোস্ট মাস্টার জেনারেল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করবার জন্য দীনবন্ধুকে কাছাড়ে পাঠান। সেখানে সেই গুরুতর কাজ সম্পন্ন করে অল্প দিনের মধ্যেই দীনবন্ধু আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কাছাড় থেকে ফিরবার সময় তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কাছাড়ের তৈরি চর্মবিহীন একজোড়া কাপড়ের জুতো আনেন।

কাছাড় থেকে ফিরে দীনবন্ধু লোক মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঐ জুতো জোড়া পাঠিয়ে দেন। ঐ সঙ্গে খামে এঁটে একটি চিঠিও দেন। চিঠিটি খুব ছোট, তাতে শুধু লেখা ছিল—কেমন জুতো!

বন্ধুর চিঠি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুব হাসলেন। তারপর তিনিও পরিহাস করে দীনবন্ধুর ঐ পরিহাসমূলক চিঠির একটি উত্তর দিয়েছিলেন। দীনবন্ধুর চিঠিটি যেমন এক কথায় ছিল, তিনিও তেমনি এক কথাতেই উত্তর দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—তোমার মুখের মত।

পূর্ণবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এঁরা ছাত্র অবস্থায়

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন। উভয়েই ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা লিখতেন। প্রথমে এঁদের মধ্যে পত্রে আলাপ হয়। পরে সেই আলাপ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পত্রে আলাপের সময় উভয়েই কবিতাতেও পত্র লিখতেন।

এই যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, এর সবই আজ লুপ্ত। উভয়ের কারও বংশীয় বা আত্মীয়দের নিকট একটি পত্রও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী' উপন্যাসটি বন্ধু দীনবন্ধুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দীনবন্ধুর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন জগদীশনাথ রায়। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেও তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

জগদীশনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা ১৪।১৫ বছরের বড় ছিলেন। তাহলেও এঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। জগদীশনাথ মাইকেলের সহপাঠী ছিলেন। মাইকেল এঁকে 'মাইডিয়ার জাগ' বলে ডাকতেন। ইনিই প্রথম বাঙ্গালী সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ হয়েছিলেন।

জগদীশনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের বৈঠকখানায়। শ্যামাচরণ তখন তমলুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আর জগদীশনাথও পুলিশের সণ্ট সুপারিন্-টেনডেণ্ট হিসাবে তখন তমলুকে ছিলেন। শ্যামাচরণ ও জগদীশনাথ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, তাই পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে বেড়াতেও যেতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ সময় মেদিনীপুরের নেগুয়ায় (বর্তমান নাম কাঁথী) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নেগুয়া থেকে বড়দা শ্যামাচরণের কাছে তমলুকে বেড়াতে আসতেন। এইরূপ একবার এলে তখনই শ্যামাচরণের বাড়িতে জগদীশনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রকে যেমন নানান্ ধরণের বহু চিঠি লিখেছিলেন, বন্ধু জগদীশনাথকেও তেমনি চিঠি লিখতেন। এঁকে লেখা ইংরাজী ২।৩টি চিঠি ছাড়া বাকি চিঠিগুলি আজ আর পাওয়া যায় না।

জগদীশনাথ রায়কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি লেখার প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর পুত্র ললিতমোহন মিত্র লিখেছেন—'অনেকেই হয়ত জানে না যে, এই জগদীশবাবুই বিষবৃক্ষের হরদেব ঘোষালে পরিণত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠিপত্র চলিত।'—নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁর বহু বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এমন কি এই দেশেই তাঁর অনেকগুলি বই ইংরাজীতেও অনূদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে এবং তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কয়েকটি বই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তর একটি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিটি ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক-সমূহের প্রুফ সংশোধক ও কপি প্রস্তুতকারক কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সংগ্রহের মধ্যে। ঐ চিঠিতে দেখা যায়, তখন লণ্ডনের মেসার্স অ্যালেন এণ্ড কোং থেকে বঙ্কিম-চন্দ্রের আর একটি উপন্যাস অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আলোচনাটি কার্যকর হয়নি।

মেসার্স অ্যালেন এণ্ড কোং থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করার কথা হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে পূর্বোক্ত নবকৃষ্ণবাবু তাঁর ডায়রিতে লিখে গেছেন—রমেশ দত্তর মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরাজী অনুবাদ বিলাত থেকে প্রকাশ করার কথা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে অনুবাদ পরে হারিয়ে যায়।

দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দুখানি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। একখানি বিষবৃক্ষ, অপর-খানি দেবী চৌধুরাণী। প্রথমখানি লাট-মহিষীকে দিয়াছিলেন।...দ্বিতীয়খানি অপহৃত হইয়াছে। একখানি পুস্তকাকারে বাঁধন খাতায় বঙ্কিমচন্দ্র অতি যত্নের সহিত অনুবাদটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। যে খাতায় তিনি খসড়া করিয়াছিলেন, সে খাতা আজও আছে। কিন্তু ভাল খাতাখানি খোয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন সকলে শোককাতর তখন এই ভাল খাতাখানি ও অন্যান্য কাগজপত্র অপহৃত হইয়াছে। পূজনীয়া

খুড়ীমাতার নিকট শুনিতে পাই, তিনি সে অমূল্য দ্রব্যগুলির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।'

শচীশবাবুর খুড়ীমাতা অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী চেষ্টা করেও দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সহ অন্যান্য অপহৃত কাগজপত্র কিছুই উদ্ধার করতে পারেন নি।

শচীশবাবু যে লিখেছেন, বিষবৃক্ষের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমচন্দ্র লাট মহিষীকে দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর বইয়ের অন্যত্র বলেছেন—'বাঙ্গলার মসনদে তখন ইলিয়ট সাহেব অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। লেডি ইলিয়ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যাপারে রমেশ দত্ত লণ্ডনের অ্যালেন এণ্ড কোং-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন বলে, বঙ্কিম-চন্দ্রকে লেখা তাঁর যে চিঠির কথা বলেছি, সেই চিঠির কিছুটা এবার উদ্ধৃত করছি। চিঠিটি দীর্ঘ। তাতে বই-এর কথা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কথা আছে। চিঠির প্রথম পাতার কোণে এক জায়গায় রমেশবাবু লিখেছিলেন—

P.S. Reply to me always to the Care of
Messrs Grindlay & Co.
55 Parliament Street,
London, S.W.

রমেশবাবুর সেই দীর্ঘ চিঠির প্রথমাংশটা এই—

Littlehampton
Sussex
16th Sept. 1886

My dear Bankim Babu,

I am sorry Messrs Allen & Co. have not yet given their final reply about publishing your novel—but I am 'takeeding' them today and...I shall be able to let you know the result by the next week.

এ বিষয়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর বঙ্কিম-স্মৃতি কথায় লিখেছেন—

'বঙ্কিমবাবু বলিলেন—রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের পাবলিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন—পাবলিসাররা নিজের খরচে বাঙ্গলা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন প্রোব্লেম লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অন্য উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবে না। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠিপত্র চলিয়াছিল।

রমেশ, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে দেখিয়াছি। উভয়ে মশগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।'

রমেশবাবু বিলাতে থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র তখন যেমন তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন বলে জানা গেল, তেমনি রমেশবাবুর নিজেরই একটা লেখা থেকে জানা যায়, তাঁর বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বাড়িতে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠির ব্যাপারটা হ'ল এই—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। খুলনায় তিনি প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সময় রমেশবাবুর পিতা ঈশানচন্দ্র দত্তও সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অবশ্য ঈশানবাবুর তখন চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ ঈশানবাবুকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। ঈশানবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্র একবার কলকাতায় এলে, তিনি ঈশানবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলেন। রমেশবাবুর বয়স তখন ১০।১২। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন রমেশবাবুকে খুব আদর করেছিলেন। সেই থেকেই তিনি রমেশবাবুকে আজীবন স্নেহ করে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনায় থাকাকালেই সেখানে কর্মরত অবস্থায় রমেশবাবুর পিতার মৃত্যু হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশবাবুদের বাড়িতে একটি শোকপত্র পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি পাওয়া যায় নি বটে, তবে রমেশবাবু পরবর্তীকালে তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে ঐ চিঠির কথায় এইরূপ লিখে গেছেন—

'১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল

হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায়, তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাপি সে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।'—নব্য-ভারত, বৈশাখ ১৩০১

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু দিন আগেকার কথা। সেই সময় কবি নবীনচন্দ্র সেন একদিন কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস লিখবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করেন।

নবীনচন্দ্র ঐ সময় রাণাঘাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন নবীনচন্দ্রকে পর পর দুটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি দুটি আজ আর নেই। কোনদিন কোথাও প্রকাশিতও হয়নি। শুধু নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্ম-জীবনীতে প্রসঙ্গত চিঠি দুটির কথা উল্লেখ করে গেছেন। প্রথম চিঠিটিতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে লিখেছিলেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুরের রাস দেখতে যাবেন।

শান্তিপুর রাণাঘাট থেকে তিন চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং রাণাঘাট মহকুমারই অন্তর্গত। তখন রাণাঘাটে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে করে শান্তিপুরে যেতে হ'ত। শান্তিপুর পর্যন্ত ট্রেন ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য অদ্বৈতের জন্মস্থান এই শান্তিপুর। এখানে বহু গোস্বামী বা গোঁসাই-এর বাস। শান্তিপুরের বিখ্যাত রাস সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ দু-একটা কথা বলছি। একবার ওখানকার প্রাচীন ও প্রখ্যাত শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ দেখতে গিয়ে সেখানে স্থানীয় পটেশ্বরী কালিকা দেবী নিয়ে লেখা একটি পত্রিকা দেখি। সেই পত্রিকায় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক প্রভাস রায় শান্তিপুরের রাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ থেকেই এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'গোস্বামী প্রভুদের ভক্তিমান বংশধরগণ নিজ নিজ বাসভবনে মন্দির, দেবালয়, নাটমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরম যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা, পূজার্চনা, দোল, ঝুলন, রাসোৎসব ইত্যাদি পরিচালন করবার ব্যবস্থা করেন।

এর অল্প কিছুদিন পরে শান্তিপুরের তন্তুবায়...আরও বিভিন্ন জাতীয় ধনী

ও অভিজাত বাংলার ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বাসভবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেবাপূজা ও (রাসসহ) উৎসবাদি পরিচালন করতে থাকেন।

প্রথম দিকে এই রাসোৎসব তিন দিন ধরে বাড়িতে বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হ'ত। যতদূর জানা যায়, প্রায় তিন শ বছর পূর্ব থেকে রাসের তৃতীয় দিনে বিগ্রহগুলিকে সুসজ্জিত হাওদায় বসিয়ে সংকীর্তনাদি সহকারে নগর পরিক্রমার ব্যবস্থা প্রচলন হয়। সে-সময় এই পরিক্রমা অপরাহ্নেই সম্পাদিত হ'ত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোস্বামীদের আগ্রহাতিশয্যে ও উৎসাহে বিভিন্ন পরিবারের গৃহস্বামীগণও নিজেদের বিগ্রহ নিয়ে সন্ধ্যাকালে সাড়ম্বরে আলোকমালা ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে বৃহদায়তনের শোভাযাত্রা সহ এই পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় 'রাইরাজার হাওদা' রাধাকৃষ্ণবেশী 'বালকের হাওদা' কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত নানা মৃৎ মূর্তিও এই শোভাযাত্রায় পরিচালন করার ব্যবস্থা করা হয়। এ-দিনের এই অনুষ্ঠানই 'ভাঙ্গারাস' নামে খ্যাত হয়। ভাঙ্গারাসের পরের দিনের অনুষ্ঠান—ঠাকুর নামানো উৎসব। এদিন প্রাতঃকাল থেকে বহু রাসবাড়িতেই সংকীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেলে বিগ্রহকে কোলে নিয়ে কীর্তনাদি সহ নিজ নিজ পল্লী পরিভ্রমণ করা হত। প্রত্যাবর্তনের পর প্রসাদ বিতরণ ও অভিষেকক্রিয়া সমাপনান্তে বিগ্রহকে দেবালয়ে পুনঃস্থাপন করা হত। এখানেই রাসোৎসবের সমাপ্তি। প্রাচীন কাল থেকে মোটামুটি এই ধারাতেই এখনকার রাসোৎসব পরিচালিত হয়ে আসছে।'

এবার নবীনচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় চিঠিটির কথা। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে নাতি এবং নবীনচন্দ্রের স্ত্রীকে নাতবৌ বা নাতনী বলতেন। দ্বিতীয় চিঠিটিতে তিনি লিখেছিলেন, রাণাঘাটে গিয়ে দিন কতক থাকবেন, এবং তাঁর এই নাতি-নাতনীর সেবাযত্ন নেবেন।

এই হারানো বা লুপ্ত চিঠি দুটি প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবনে' যা লিখে গেছেন, সেই লেখাটা উদ্ধৃত করেই এখন এ প্রসঙ্গ শেষ করছি—

'ইহার (কলিকাতায় দেখা করে আসার) কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু লিখিলেন, তিনি শান্তিপুরের রাস কখনও দেখেন নাই। অতএব রাস

দেখিতে আসিবেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি কিছুদিন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে থাকিবেন এবং যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব (কলিকাতায়) উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল, তাহাও স্থির করিবেন। আমাদের পতিপত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। রাসের সময় তাঁহার জন্য সমস্ত স্থির করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি, পত্র পাইলাম তাঁহার শরীর কিছু কিছু অসুস্থ হইয়াছে। অতএব তিনি আসিতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে রাণাঘাটে আসিয়া আমার সঙ্গে কিছু বেশী দিন থাকিবেন। কারণ, কলিকাতার হট্টগোলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, রাণাঘাটের জল-বাতাস ভাল না হইলেও তাঁহার নাতি-নাতনীর স্নেহে ও শুশ্রূষায় সে অভাব পূরিত হইবে। হা ভগবান। আমাদের এ আশাও পূর্ণ করিলে না! ইহার পরে একদিন আমার প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা লিখিলেন যে, সেই দিনই বঙ্কিমবাবুর অস্ত্র-চিকিৎসা (অপারেশন) হইবে। অবস্থা ভাল নহে। সকলেই বড় চিন্তিত হইয়াছেন। তাহার দুই দিন পরে সংবাদপত্রে মর্মাহত হইয়া দেখিলাম যে, এই শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন।'

পরিশিষ্ট

আরও অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত পত্র

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

শ্রীচরণেষু,

গিরিশের মারফৎ ১১৫৫ টাকা পাঠাইলাম। পূর্ব প্রেরিত ফর্দ মত বিলি করিবেন। বাকি রহিল লৌকতা আর বকৃশিস। জমি বিক্রয়ের টাকা পাইলে তাহা হইবে।

ছাতিমাড়ানি বিক্রয় করিতে পারি নাই। বড়বাবু তাহা লইবার জন্য জিদ্‌ করিতেছেন।

খোকার পীড়ার কারণ, তাহার টীকা দেওয়া হইল না। এই অবস্থায় তাহাকে আর কলিকাতায় রাখা যায় না। কেন না কলিকাতায় বসন্ত রোগের বড় প্রাদুর্ভাব। হাওড়াতেও বাড়ি পাওয়া গেল না। আর সেখানে বড় হাম হইতেছে। চুঁচুড়ায় হাম ও ওলাউঠা হইতেছে। সুতরাং তিন মাসের জন্য পরিবার কাঁটালপাড়ায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি। সেখানে হাম, বসন্ত কি ওলাউঠা হইতেছে কিনা, এই পত্রের উত্তরে লিখিবেন। এক সপ্তাহ মধ্যে পরিবার কাঁটালপাড়ায় পাঠাইব। সুতরাং আমাকে ছুটি লইতে হইবে। ছুটি চাহিয়াছি। পাইব বোধ হয়।

যাহাকে যাহাকে মাসিক দিয়া থাকি, তাহারা কেহ দুই মাস, কেহ তিন মাস মাসিক পায় নাই। তাহাদিগকে মাসিক দিব, বঞ্চিত করিব না। কিন্তু আপাততঃ টাকার বড় অপ্রতুল। ইতি তাং ২ এপ্রিল

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন তারিখে যশোর যাইবেন লিখিবেন।

লালচাঁদ যশের হাতচিঠা পাঠাইলাম। তাহার নামে টাকা উহাতে উসুল দিয়া তাহাকে ফেরৎ দিবেন।

[এই চিঠির গিরিশ যে কে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তখন কি বাবতে ঐ টাকা পাঠিয়ে ছিলেন, তা জানা গেল না। তবে অনুমান হয়, গিরিশ সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন নিকটজন ছিলেন।

ছাতিমাড়ানি কোন একটা বিষয় সম্পত্তি হবে বলে মনে হয়।

চিঠির খোকা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর এক পুত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি শরৎকুমারীর বিয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ জামাতাকে গৃহ-জামাতা করে ছিলেন।

চিঠিটি পড়ে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার তখন কলকাতায় ছিল। আরও জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং কলকাতা থেকে হাওড়ায় যাতায়াত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় আসার আগে হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তখন তাঁর বাসা ছিল হুগলীর পাশেই চুঁচুড়ায়।

চিঠিটিতে তারিখ আছে শুধু ২রা এপ্রিল। সালের কোন উল্লেখ নেই। না থাকলেও বেশ বোঝা যায়, এটা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়েই হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন।

চিঠিটি থেকে আরও জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র তখনও যশোহরের স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর ঐ চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।]

শ্রীচরণেষু,

এই পাজি বৈদিকের পত্র তাহার প্রার্থনা মত আপনার নিকট পাঠাইলাম। এই পত্রের লিখিত কথা সকলের জন্য...। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[কাঁটালপাড়ার বরদা ভট্টাচার্য ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বাড়ির বৈঠকখানার কাছে বরদা ভট্টাচার্যের একটা জমি কিনেছিলেন। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের মোকররি মৌরসি স্বত্ব ছিল, অর্থাৎ ঐ জমি তাঁর দান বিক্রয় করার অধিকার ছিল। বার্ষিক খাজনা দেওয়া ছাড়া বরদা ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

এই জমি রেলওয়েতে পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১২শ টাকা পান। বরদা ভট্টাচার্য ঐ টাকার অংশ দাবী করে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে

যান। পরে তিনি এ ব্যাপারে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সাহায্য চান। সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় এলাহাবাদে একরূপ আত্মগোপন করে বাস করছিলেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঠিকানা জানতেন। বরদাবাবু সঞ্জীবচন্দ্রের ঠিকানা জানতেন না। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা তাঁর একটি চিঠি সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুরোধ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে লেখা বরদাবাবুর চিঠিটি সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় সেই সঙ্গে নিজে সঞ্জীবচন্দ্রকে উপরে উদ্ধৃত চিঠিটি লিখেছিলেন।

বরদাবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে যে অনুরোধ পত্র লিখেছিলেন এবং সঞ্জীবচন্দ্রকেও যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি দুটি এখানে পর পর দিলাম—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্

বিজ্ঞাপনমিদং মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি ঠিকানা দিয়া অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—৮ জ্যৈষ্ঠ '৯৪ সাল

শ্রীযুত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাচরণ দেবশর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

মহাশয়, আপনি বাটী হইতে রওনা হইবার পর আর আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। সম্প্রতি বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে, যে জমি আমার রেলওয়েতে পড়িয়াছিল, তাহা বঙ্কিমবাবু নিজ খরিদা লেখাইয়া টাকা সমুদয় বাহির করিয়া লইয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন যে, আমি কেবল তোমায় তোমার খাজনার বিশগুণ পণ দিব, যদি ইহাতে স্বীকার না হও, নালিশ করিতে পার। তিনি ঐ জমির মূল্য ১১০০ টাকা পাইয়াছেন। আমি ডেপুটি কালেক্টরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, তোমার

মালিকানা সত্ব ৫৭৫ টাকা পাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি কিছুই দিতে চাহেন না। আমি এ বিষয়ে বড়বাবুকে জানাইয়াছি এবং আপনাকেও জানাইতেছি। আপনারা অনুগ্রহ-পূর্বক আমার মীমাংসা করিয়া দিউন। কারণ, আমায় অকারণ কষ্ট দেওয়ায় বিশেষ কোন ফল নাই এবং যাহাতে নালিশ করিয়া অপযশ না কিনিতে হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনার যাহা মত হয় সংবাদ দিবেন, আপনার পত্র পাইলে নালিশের স্থির করা যাইবে। আমার ইচ্ছা হাইকোর্টের নজির অনুযাইক যেরূপ প্রজাকে মালিকানা সত্ব দেওয়া যাইতেছে, তাহাই আমি পাই। অকারণ নালিশ করিয়া কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই। এই পত্রের জবাব সত্বর দিবেন এবং আপনার ঠিকানা লিখিয়া দিবেন, আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আপনি কবে বাটী আসিবেন লিখিবেন। ইতি—

শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য

সাং কাঁটালপাড়া

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বরদা ভট্টাচার্যের এই চিঠিটি ছিল খোলা চিঠি। বরদাবাবুর খোলা চিঠি দেওয়ার হেতু, তিনি চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও চিঠিটি পড়ুন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিটি পড়ে চিঠির মধ্যেকার 'মালিকানা সত্ব ৫৭৫ টাকা' এবং 'কিছুই দিতে চাহেন না' এই দু জায়গায় লেখার নীচে দাগ দিয়ে পাশে পাশে নিজে লিখে দিয়েছিলেন—false, false.

সঞ্জীবচন্দ্র বরদা ভট্টাচার্যের চিঠি পেয়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে তখন একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই সবে মেদিনীপুরে গিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। মেদিনীপুরে যাওয়ার আগে তিনি ব্যক্তিগত কাজে ক'মাসের ছুটি নিয়ে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ছিলেন এবং নিজের বাড়ি মেরামত করাচ্ছিলেন। এই সময়েই তিনি রেল কোম্পানীর কাছ থেকে জমির ক্ষতি পূরণের টাকাটা পান, আর বরদা ভট্টাচার্যও এই সময়েই কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের এলাহাবাদ থেকে লেখা চিঠিটি পেয়ে তখন তাঁকে এ সম্পর্কে আর একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিটি এর পরেই উদ্ধৃত করা গেল।]

শ্রীচরণেষু,

আপনার একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তারিখ নাই। প্রায় থাকে না।

বরদা ভট্টাচার্য ৫ টাকা খাজনা পায়, তজ্জন্য সে ৫ × ২০ = ১০০৲ পাইতে পারে। High court ruling এই যে, Every person should receive amount of compensation proportionate to his interest in the land.

উহার interest ৫৲ annually, এজন্য ১০০ টাকা পাইতে পারে। আমি ঐ ১০০৲ লইয়া সাধাসাধি করিয়াছি, তাহাতে সে আমাকে কটূক্তি করিয়া গিয়াছে।

তার উপর উহাকে বলিয়াছি যে, যদি তুমি না লও, তবে তোমাকে চিরকাল ঐ খাজনা দিব। এবং তাহার খাজনা আদায়ের জন্য আমার অন্য সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া লেখাপড়া করিয়া Registry করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে সে রাজী না হইয়া কড়া কথা বলিয়া গিয়াছে।

তাহাকে কেহ বুঝাইয়াছে যে, আমি যে ১২০০ টাকা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে ৮০০ টাকা তাহার প্রাপ্য। বড়বাবু আমাকে আটশত টাকা দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন...। যখন জমি মাপ হয়, তখন আমি ঝিনাইদহে ছিলাম, আমার লোকজন জরিপের সময়ে কেহ উপস্থিত ছিল না।

তথাপি এই ভট্টাচার্য বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আমি জুয়াচুরি করিয়া খরিদা ব্রহ্মোত্তর বলিয়া তাহা খাইয়াছি এবং আপনাকেও ঐরূপ লিখিতে সাহস করিয়াছে। যখন কাঁটালপাড়ার সকল লোকের আমার প্রতি

এই ব্যবহার, তখন কাজেই কাঁটালপাড়ার বাড়ি ফেলিয়া দিলাম। ইতি

১১ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র রাগ বা অভিমানবশে বাড়ি ফেলে দিলাম, সঞ্জীবচন্দ্রকে একথা লিখলেও বাড়ি ফেলে দেন নি। তিনি বাড়ি মেরামত করাতে করাতেই ছুটি শেষ হলে মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকেই টাকা পাঠিয়ে বাকি মেরামতের কাজটা সম্পন্ন করিয়ে ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি কাঁটালপাড়ার সকল লোকের অসদয় বা দুর্ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই চিঠি লেখার দু মাস পরে নৈহাটি কাঁটালপাড়ায় স্কুলের জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা সঞ্জীবচন্দ্রের মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটি এর পরেই উদ্ধৃত করলাম।]

Midnapore, 1887
17th August

শ্রীচরণেষু,

কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা University যাহাই হ'ক, তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না। কাঁটালপাড়ার পূজায় আমি টাকা দিব না। এ বৎসর আমি ও আমার পরিবার পূজার সময়ে মেদিনীপুরেই থাকিব। সুতরাং কলিকাতাতেও পূজা করিতে পারিলাম না।

যেখানে বরদা ভট্টাচার্যের মত ব্যক্তি আমাকে জুয়াচোর বলে, যেস্থানে রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের মত লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত লোকের সঙ্গে দলাদলি এবং যেখানে বড়বাবুর

মত সহোদরের মুখ দর্শন করিতে হয়, সে দেশের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। সেখানে আমার কোন দুর্গোৎসব হইবে না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনঃ—আমার চক্ষের দৃষ্টি অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য কয়দিন হইল পুনরায় মাছ খাইতেছি বটে, কিন্তু মাংস খাই না ও খাইব না। আমার শরীরের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। উহা আমার বা আপনার সাধ্যায়ত্বের ভিতরে নহে।

[১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বঙ্কিমচন্দ্র দুই অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। ২০শে মার্চ মথুরায় শ্যামাচরণ ভুল করে অযথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রাগ করেন এবং পরদিন তিনি ভাইদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন, কোন কথা না বলে অন্যত্র চলে যান।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র ৩১শে মার্চ এলাহাবাদে থাকা কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির একটি চিঠি পান। সেই চিঠি থেকে ওঁরা জানতে পারেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারীর একটি পুত্র হয়েছে, আর এও জানতে পারেন যে, বড়দা শ্যামাচরণ বাড়ি ফিরে গেছেন।

মথুরায় শ্যামাচরণ কিভাবে ভুল করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অবিচার করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের সে দিনকার দিনলিপি থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"Baro Babu played a drama. He was always dissatisfied with every thing. He felt tired of remaining at Brindaban and when he was told that, Bankim requires a little rest to regain his health, he insisted on going to Joypur alone or with some jatri. When he was apparently sleeping (at 2 P. M.) but we knew he was not, Bankim said that he won't allow Dada to go to Joypur alone, he must accompany him, let the consequence be what ever it may be. Baro

Babu pretended to awake from his sleep. He looked at us wrath and then to the servant's room and sat there alone as an insulted man. I asked him what was the matter. He said amongst other things that Bankim had told আমি এখনই ওকে তাড়াইয়া দিতে পারি। Why brother should you all combine and drive me away, when I could go away at the least hint. I am not poor,'...

শ্যামাচরণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তখন রাগ বা অভিমান করে চলে এলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়েছিল, তা নয়। কারণ বরদা ভট্টাচার্যের ব্যাপার নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যায়, এই ঘটনার অল্প দিন পরেই শ্যামাচরণ বরদা ভট্টাচার্যকে ৮০০ টাকা দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। বরদা ভট্টাচার্যের ব্যাপারেও শ্যামাচরণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ভুল করে ছিলেন। এই সব কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তখন বড়দার উপর ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে মেজদাকে লেখা চিঠিতে ঐ কথা বলেছিলেন।

দাদার উপর এবং কাঁটালপাড়ার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এই রাগ বা অভিমান ছিল তখনকার মত সাময়িক। পরে এ রাগ, অভিমান তাঁর আর ছিল না।

তিনি সাময়িক রাগের বশে তখন একথা লিখলেও কিছুদিন পরে রাগ পড়ে গেলে স্কুলে অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং কাঁটালপাড়ার বাড়ির দুর্গা পূজায় টাকাও দিয়েছিলেন।]

শ্রীচরণেষু,

...Carbuncle দেখা দিয়াছে···আমার বড় বেশী দিন আর নাই। এবার যে carbuncle হইয়াছে, তাহা সামান্য। আফিস যাইতেছি। কলিকাতা হাওড়া যাতায়াত করিতেছি···ভয় নাই।

কিন্তু যেরূপ প্রকারের পীড়া, তাহাতে যখন carbuncle দেখা দিয়াছে, তখন আর অধিক দিন পরমায়ু নাই। দুই এক বৎসর বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি। দুই দিনেই জীবন···ফুরাইতেও পারে।

আপনাকে এ কথা···তাৎপর্য এই যে, আমার এই অবস্থায় আপনার সংসার চালানোর কি উপায়·· হইতে আপনার ও যতীশের···উচিৎ। পূর্ব হইতে কিছু উপায় হইতে পারে।

আর যদিও কিছুদিন·· আমার চাকরি এই···উপর আবার চাকরি চলিবে · তাহা হইলেও আপনাদের···উপায় চিন্তা করা কর্তব্য···আমি এক্ষণে হাওড়ায় আছি···রবিবার।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠিটি খুবই ছিন্ন। ছিন্ন অংশগুলিতে '···' চিহ্ন দেওয়া গেল। চিঠিটি যখনকার লেখা বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর বাসা ছিল হাওড়ায় পঞ্চাননতলা রোডে (বর্তমান নাম দেশপ্রাণ শাসমল রোড।)]

শ্রীচরণেষু,

যে কথাটা আমার লিখিতে বাকি ছিল তাহা এই যে, যদিও আপাততঃ যতীশের পুত্র কন্যাদের পক্ষে মোটা চাউল খাওয়া বড় ক্লেশদায়ক হইয়াছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা অভ্যাস করান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কেননা, আমার···র একটি Carbuncle হইয়াছে···বিশেষ পরিশ্রম করিয়া উহা···কারণ আছে।

বাঙ্গালী হইয়া যে-ই আমার মত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছে, সে-ই পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বে মরিয়াছে! আমি পৈতৃক ধাতুর গুণে আরও কিছুদিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি। কিন্তু এই জানুয়ারির পূর্বে কর্ম পরিত্যাগ করা নিশ্চিত।

যতীশ আমার মাসিক ভিন্ন আর কোন উপায় করিতে পারিল না ও পারিবে না। অতএব এই জানুয়ারির মধ্যে মোটা চাউল অভ্যাস হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই…যতীশের…পুত্রকন্যা…

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রের নাম ছিল জ্যোতিশ। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে যতীশ বলেই সম্বোধন করতেন। চিঠির শেষাংশটি ছিন্ন]

শ্রীচরণেষু,

…দাদার পীড়ার কোন উপশম নাই। এখন হাঁপানি কাশির জন্য অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছে।

নীলমণির মুখে শুনিলাম যে দেবত্র সম্পত্তির বাবত আমার, পূর্ণচন্দ্রের ও রাখালের টাকা যতীশ লইয়াছে। যতীশের কথাবার্তায় বুঝিলাম যে, আমার অংশের টাকা সে নিজে ব্যয় করিয়াছে।…

…নিষেধ করিয়াছিলাম। তাহা না শুনিয়া ১৯ টাকা খরচ করিয়া গিয়াছে শুনিলাম। ইতি তাং ১১ ফাল্গুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠির দাদা হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ।

নীলমণি হলেন নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের দেবত্র সম্পত্তির এবং বঙ্কিমচন্দ্রদেরও সম্পত্তির ইজারাদার ছিলেন। নীলমণির পদবী যে চট্টোপাধ্যায় এবং এঁর বাড়ি যে ঘাটালে, এ কথা জানতে পারি নৈহাটীবাসী এঁর এক আত্মীয় কবি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আর রাখাল জ্ঞাতি ভ্রাতা।]

শ্রীচরণেষু,

কথাটা এই যে, পাচিকা না থাকায়…রাঁধিয়া ছিলেন।…শাশুড়ী নিজে রাঁধিয়া খাইয়া ছিলেন।…যতীশ আমাকে হিসাব দিল না ও দিবে না। পূর্বেই লিখিয়াছি, অনেকবার বলিয়া পাঠাইয়াছি।

টাকা…সে উড়াইয়া…

…মেদিনীপুরে দিয়াছে। আমি…র মেদিনীপুরে যাইব। সুতরাং এই অবস্থাতেই…কে রাখিয়া গেলাম। কাহারও কোন…নাই। যখন শুনিব যে যতীশের…আর টাকা নাই এবং চালচলন…ছে তখন টাকা পাঠাইব…

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা শাশুড়ী হালিশহরে তাঁর নিজের বাড়িতেই সাধারণত থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী ভিন্ন তাঁর আর দ্বিতীয় সন্তান ছিল না। তাই তিনি অনেক সময় কন্যার বাড়িতে এসেও থাকতেন।]

এখানে পর পর যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ক'টি খুবই ছিন্ন চিঠি প্রকাশ করা হ'ল, নৈহাটীর ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি শতছিন্ন ও প্রায় ধূলো হয়ে যাওয়া পত্রাংশ পেয়েছি। এই চিঠি তিনটির একটির শুধু প্রথমাংশটুকু এবং ঐ চিঠিটি দু পৃষ্ঠায় লেখা ছিল বলে ঐ পত্রাংশের অপর পৃষ্ঠার লেখাটুকুও পাওয়া গেছে। অপর চিঠি দুটিরও একেবারে শেষাংশ দুটি পেয়েছি। এই শেষাংশও বেশ ছিন্ন। তবুও এই শতছিন্ন চিঠি তিনটির যেটুকু করে অংশ পাওয়া গেছে, তা থেকেই বঙ্কিম-চন্দ্রের চরিত্রের দরদী দিকের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ খণ্ডিত পত্রাংশ তিনটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

প্রথম পত্রাংশটি এই—

শ্রীচরণেষু,

মাসিক ৭০ টাকা পাঠাইলাম। ... আমাদিগের মাতুলানীকে দিতে হইবে। স...১৩০ টাকা পাঠাইয়া ছিলাম। ফর্দ পূর্বে লিখিয়া···

উপীনের ১০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। তাহা দিবার উহাদিগের শক্তি নাই।···

···আসেন, তবে তাহাকে দিতে পারেন। যোগীন নিজে যদি ঐ টাকা লইতে আসেন, তাহাকে দিতে পারেন। কেননা, আপনাদিগের জানিত হইলে সে টাকা উড়াইতে পারিবে না।

পূজা সম্বন্ধে আমার পত্রের কোন উত্তর পাই নাই। সুতরাং পূজার জন্য কোন টাকা পাঠাইতে পারিলাম না। ইতি তাং···

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পত্রাংশটি এই—

···যাইবে। ইতি তাং ১ Sept

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খরচের...

নিজ—৭০,
মাতুলানীর মাসিক—৩,
উপীনের জরিমানা—৫০,
সদাতাঁতিনীর মা—৭,

———

১৩০ টাকা

পুনশ্চ। এই পত্র লেখার পর আপনার ৩০ আগষ্ট তারিখের পত্র পাইলাম। পূজার টাকা শীঘ্র পাঠাইতেছি। ইতি—

তৃতীয় পত্রাংশটি এই—

পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহাকে...দিয়াছিলাম। পুনশ্চ চাহিয়াছেন...আর দশ টাকা দিলাম। ইতি তাং ২ অ...

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[দেখা যাচ্ছে, এখানে আলোচিত এই চিঠি তিনটির মধ্যে প্রথম চিঠিটি লিখলে সঞ্জীবচন্দ্র তার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। সেই উত্তর পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিলেন।

প্রথম চিঠির 'মাসিক ৭০ টাকা' হল—সঞ্জীবচন্দ্রের জন্য তখনকার মাসিক বরাদ্দ ৭০ টাকা। 'আমাদের মাতুলানীকে' শব্দ দুটির আগে কি শব্দ ছিল তা বোঝা গেল না। আর ১৩০ টাকার আগে যে শব্দের আদ্যক্ষর 'স' পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় ঐ শব্দটা ছিল "সর্বসমেত'। চিঠির উপীন ও যোগীন এরা কারা এবং উপীনের কোথায় আর কেনই বা জরিমানা হয়েছিল, অনেক খোঁজ করেও তার কিছুই জানা গেল না। কিছু জানা না গেলেও, তবুও ঐ চিঠি থেকেই যেটুকু জানা গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে, ১০০ টাকা জরিমানা দেবার ক্ষমতা উপীনদের না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ৫০ টাকা সাহায্য করেছিলেন। আর এও অনুমান করা যাচ্ছে যে, উপীন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সামাজিক অন্যায় করে ঐ দণ্ডে দণ্ডিত হয় নি। তা যদি হ'ত তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় আদর্শবাদী মানুষ কখনই উপীনের জরিমানার টাকা সাহায্য করতেন না।

তৃতীয় চিঠিটি থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীতে এক ব্যক্তিকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি আবার চাওয়ায় তাঁকে পুনরায় দশ টাকা দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তখনকার দশ টাকার মূল্যমান আজকের একশ টাকারও বেশী ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র দুই অগ্রজের সঙ্গে উত্তর ভারতে একবার তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখন এই চিঠি থেকে দেখা গেল, তিনি একবার শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীতে জগন্নাথ দর্শনেও গিয়েছিলেন।]

শ্রীচরণেষু,

মাসিক ৩০ টাকা পাঠাইলাম। ইতি, তাং মঙ্গলবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যোতিশ পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরি পাওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে বেশী টাকা সাহায্য করতেন। জ্যোতিশ চাকরি পাওয়ার পর থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ৩০ টাকা করে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জামাকাপড়, চিকিৎসা প্রভৃতি বাবতেও বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিত টাকা দিতেন।]

শ্রীচরণেষু,

আপনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, দুই বেলা খাইতে জোটে না। কিন্তু যতীশের অর্থাভাব তো কিছুই দেখি না। সে গতকাল দশ টাকা দিয়া একটা চাপকান কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। ছুটিতে চাপকানের কোন প্রয়োজন নাই।

Medical Certificate সম্বন্ধে যতীশ আমার ও পূর্ণচন্দ্রের প্রতি যেরূপ শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা সে-ই পারে, আর কেহ পারে না। পূর্বেও তাহার ঐরূপ ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে। ইতি তাং বৃহস্পতিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

যতীশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা সবিশেষ বুঝাইতে হইলে অনেকটা লিখিতে হয়। আমার তত সময় নাই এবং ততটা গুরুতর ব্যাপারও কিছু নহে যে অতটা লিখি।

যতীশের এরূপ ব্যবহার নূতন কিছু নহে। পূর্বে পূর্বেও এরূপ করিয়াছে। আমি এ সকল বিষয়ে সচরাচর কোন কথা কহি না এবং এক্ষণেও তাহার বিস্তারিত···নাই। ইতি তাং

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

আপনার সংবাদ লোক মুখে পাইতেছি। এজন্য পত্রাদি লেখার কোন প্রয়োজন হয় না।···

···চিন্তা নাই, আমি নীলমণির নিকট সে টাকা আদায় করিব। তবে পূর্ণচন্দ্র ও রাখালের অংশের টাকাও না খরচ করে। দেখিলাম যে যতীশ এখন আর আমাকে বড় গ্রাহ্য করে না। সুতরাং আমি বড় কিছু বলি নাই। কলিকাতায় কতকগুলো টাকা ব্যয়···

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

···পাড়ায় রাষ্ট্র যে আমি আপনাকে পশ্চিম হইতে আসিতে দিই নাই। সেই জন্য আপনি আসেন নাই। আমার বিশ্বাস আপনি নিজে থাকিতে চাহেন, আমি থাকিতে দিই নাই। আমার পরিণামে যে এই পুরস্কার হইল, তাহা আমি বহুদিন হইতে জানি। জানি বলিয়াই এবং এইরূপ পুরস্কার কাঁটালপাড়ায় পাই বলিয়াই, অনেক দিন পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছি।

এ সকল রচনা প্রথম বড়বাবুর···।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এই পাতার শেষ চিঠিটি যে সময়ের লেখা সেই সময়কার আরও দুটি চিঠি প্রসঙ্গ কথা সহ আগে বইয়ের ২৪-২৬ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে দেখুন।]

শ্রীচরণেষু,

শরতের গতকল্য একটি পুত্র হইয়াছে। প্রসবকালে…প্রাণ বিয়োগ… রক্ষা পাইয়াছে।

গির্জার কোন খবর পাই নাই।…পত্র পাইয়াছি তাহা আপনার দৃষ্টি জন্য পাঠাইলাম। পাঠ করিয়া ফেরৎ দিবেন। যে ডাক্তার পাঠাইয়াছিলাম, সে অযোগ্য বলিয়া তাহার ঔষধ খায় নাই। আমি পূর্ণকে লিখিয়াছি যে, তাঁহার টাকা দিতে হইবে না। গির্জার জন্য কোন চিন্তা নাই—পীড়া কঠিন নয়… ইতি—তাং ১৯ ফাল্গুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

আজ আপনার পোষ্টকার্ড…

বসিরহাটের আর কোন পত্র পাই নাই। ডাক্তার পাঠাইয়াছিলাম, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনা গিয়াছে যে, বিশেষ কোন পীড়া নাই। মধ্যে মধ্যে…low হয়। তাহার যেরূপ চিকিৎসা দরকার, তাহা বিপিনবাবু যেরূপ স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, সে সেইরূপ করিতে গিয়াছিল। বসিরহাটের নেটিব ডাক্তারের তাহা পছন্দ হয় নাই। পূর্ণচন্দ্রের চিঠির…ভাবেও ডাক্তারের…তাহাতে আমার …যে বসিরহাটের ডাক্তারেরা…মানুষ দেখিয়া ভয় দেখাইয়া কতকগুলা টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে এবং তাহার ব্যাঘাত দেখিয়া আমার প্রেরিত ডাক্তারকে অযোগ্য বলিয়া পূর্ণকে বুঝাইয়া …বিদায় দিয়াছে। রোগ যাহা, আমার বাড়িতে আমি তাহা নিজে আরাম করিয়াছি। যাই হোক্, পূর্ণ আমাকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি আর এ সকল কথা কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। একশত টাকা গুনগারি …পুঁজি ভাঙ্গিয়া টাকা…

শরৎ ও তাহার পুত্র এখন ভাল আছে। কিন্তু সূতিকার পীড়ার আশঙ্কা এখনও যায় নাই। বিপিনবাবু আর এক সপ্তাহ না দেখিয়া কাঁটালপাড়ায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সূতিকা পূজার জন্য পুরোহিতকে আসিতে

বলিয়া পাঠাইবেন। বুধবার দিন ছেলে হইয়াছে, সুতরাং কবে সূতিকা পূজা তাহা পুরোহিত হিসাব করিয়া লইতে পারিবেন। ইতি তাং ২০ ফাল্গুন শুক্রবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এখানে উদ্ধৃত শেষের চিঠি দুটির শরৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবী। শরৎকুমারী দেবীর চার পুত্র ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে—দিব্যেন্দুসুন্দর, পুরেন্দুসুন্দর, শুভেন্দুসুন্দর ও ব্রজেন্দুসুন্দর।

গির্জা বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পৌত্র। পূর্ণচন্দ্র সেকালের প্রথা অনুযায়ী পুত্র বিপিনচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মাত্র ১৪ বছর বয়সের সময়। বিপিনের ১৯ বছর বয়সে তাঁর প্রথম পুত্র গির্জার জন্ম হয়। বিপিন তখন কলেজের ছাত্র এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পিতার কাছে থাকতেন।

পূর্ণচন্দ্র বসিরহাটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে বিপিনচন্দ্রের ঐ শিশুপুত্রের একবার অসুখ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা শুনেই তাঁর কলকাতার বিখ্যাত গৃহ চিকিৎসকের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কলকাতা থেকে একজন ভাল চিকিৎসককে বসিরহাটে পাঠিয়েছিলেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র বংশের সকলের জন্যই কিরূপ চিন্তা করতেন!

এ ছাড়া আগের উদ্ধৃত অধিকাংশ পত্র ও পত্রাংশ থেকেও একটা বিষয় পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপার্জন করতেন, তেমনি স্বজন, আত্মীয়, অনাত্মীয় ও অভাবী ব্যক্তিদের টাকাও দিতেন প্রচুর।]

[জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের পুত্র সন্তান ছিল না বটে, কিন্তু ঋণগ্রস্ত মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশকে নিয়ে তাঁর যেন ভাবনা চিন্তার আর অন্ত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে জ্যোতিশকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন। জ্যোতিশের চাকরির জন্য তিনি যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি তাঁর চাকরি হলেও আবার নানান্ বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়েছেন। জ্যোতিশ অন্যায় করলে, তাঁকে যেমন কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছেন, তেমনি তাঁর ছোট বড় সকল বিপদেই তাঁকে সাহায্য করতে আগিয়ে গেছেন।

এখানে জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করছি। এগুলি থেকে ঐ সব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাবে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক খবর এবং মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও বহু বিষয় জানা যাবে। কোন কোন চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের খবরও রয়েছে।

প্রিয়তমেষু,

এ মাসে টাকার বড় গোলযোগ। ওদিকে অর্দ্ধেক বেতন ছিল। তারপর ছুটি কয়দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল। এখানে ১৭ই মে চার্য লইয়াছি। সেই দিন হইতে পুরা দর যাহা পাইব। Accountant general হিসাব করিয়া দিয়াছেন। এ মাসে মোটে ৪০০ টাকা বেতন পাইব। আসিবার সময়ে আমার হাতে টাকা ছিল না। রাজকৃষ্ণবাবুর নিকট দুই শত টাকা হাওলাত করিয়া আনিয়াছি। ঐ দুই শত টাকার যাতায়াত খরচ এবং বাসা খরচে প্রায় ১৫০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে—৫০ টাকা যাহা আছে, তাহা ৩০ জুন পর্যন্ত বাসা খরচ চলিতে পারে। ৩০ জুন আমি এখান হইতে যাইবার সম্ভাবনা। অতএব পুনর্বার বেতন পাইবার পূর্বেই যাইতে হইবে। অতএব এই ৪০০ টাকার মধ্য হইতে পথ খরচ ১০০ টাকা রাখিতে হইবে ও রাজকৃষ্ণবাবুকে দুই শত টাকা দিতে হইবে। অবশিষ্ট এক শত টাকা যাহা থাকিবে তাহাই কলিকাতার বাসায় পাঠাইব। তাহাতে তাহাদের কুলাইবে না। কেন না, কেতাবের টাকার আমদানি কম, আর নূতন বাড়ীর লেখাপড়া ও মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খরচ হইতেছে। তোমাদিগকে পাঠাইবার জন্য এক পয়সাও রহিল না। কাজেই এ মাসে তোমাদের কিছুই আনুকূল্য করিতে পারিব না।

ইহাতে তোমাদের কষ্ট হইবে। কিন্তু আমি ছুটি লইলে তোমাদের

এরূপ কষ্ট হইবে। পূর্বাহ্নে ঝিনাইদহ হইতে আমি তোমার পিতাকে সতর্ক করিয়া ছিলাম। তাহা জানিয়াও তোমরা কোনরূপ চেষ্টা কর নাই। আপনারা চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব হইতে কিছু উপায় করিবার জন্য কণ্ঠমালা ছাপাইতে ছিলাম। তোমার পিতা তাহাতেও ব্যাঘাত করিয়া আপনারও ক্ষতি করিলেন, আমারও কতকগুলা টাকা ক্ষতি করিলেন। তোমরা আপনারা আপনার কোন উপকার করিবে না; আপনারাই আপনার অনিষ্ট করিবে। অন্যে কেহ যদি তোমাদের উপকার করিতে যায়, তাহারও অনিষ্ট করিবে। ইহা হইলে কেহই তোমাদের লইয়া চালাইতে পারে না।

যে ৪০০ টাকা বেতন কাটা গেল, তাহার মধ্যে ২০০ টাকা দরবার করিয়া পশ্চাৎ পাইতে পারি। যদি পাই তবে তাহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিব। কিন্তু তাহার এখন অনেক বিলম্ব। ইতি তাং ৩১ মে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এই চিঠিটি উড়িষ্যার কটক জেলার ভদ্রক থেকে লেখা। ঐ সময় ভদ্রক বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর জেলার ঝিনাইদহ থেকে বদলি হয়ে ভদ্রকে গিয়েছিলেন। তিনি ঝিনাইদহে গিয়েছিলেন ১৮৮৫র ১লা জুলাই, আর ভদ্রকে যান ১৭ই মে। ভদ্রকে কাজে যোগ দেওয়ার আগে অসুস্থতাবশত তিন মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন।

এই চিঠির রাজকৃষ্ণবাবু হলেন বঙ্গদর্শনের লেখক বহু ভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্প সংখ্যক ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম।

কণ্ঠমালা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা একটি উপন্যাস।]

কল্যাণবরেষু,

Accountant general আমাকে last pay certificate দেন নাই,

এজন্য আমি আজিও বেতন পাই নাই। এজন্য টাকা এ পর্যন্ত আমি পাঠাই নাই।

টাকা পাঠাইলেও যে তোমাকে আমি পাঠাইতাম বা এক্ষণে পাঠাইব, এরূপ বলিতেছি না। যতদিন তোমার চরিত্র সংশোধিত না হয় ততদিন আমি তোমার কোন উপকার করিব না। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, তোমার মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার না করিলে আমি তোমার কোন উপকার করিব না। তথাপি তুমি মাতার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার কর, তাহা কানে শুনা যায় না…এরূপ নরাধমের যে সাহায্য করে বা তাহাকে যে স্নেহ করে, সেও তাহার ন্যায় নরাধম।

তুমি মনে কর, আমি বিদেশে আছি, কিছু জানিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমি কলিকাতা হইতে আসিবার আগে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি, তুমি যাহা করিবে, আমি সমস্ত জানিতে পারিব।

তোমার মাতা আমার পূজনীয়া। আমি তাঁহাকে খাইতে অবশ্য দিব। কিন্তু তোমাকে দিব না। কেননা তুমি পিতৃদ্রোহী এবং মাতা-পিতার সম্বন্ধে যে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিছুই আমি বিশ্বাস করি না। কেননা তাহা হইলে তুমি কখন মাতার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতে না। ইতি তাং ৪ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের পুত্র সন্তান না থাকায় একবার কথা হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু জ্যোতিশ তাঁর বাবা-মা'রও একমাত্র পুত্র বলে, তাঁর বাবা-মা এ প্রস্তাবে রাজী হন নি। ঋণগ্রস্ত পিতার সন্তান এবং নিজেও উপার্জনে অক্ষম জ্যোতিশ, ধনী কাকার পোষ্যপুত্র হতে না পারার কথা স্মরণ করেই মাঝে মাঝে বাবা মা'র প্রতি রাগে খারাপ ব্যবহারও করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে স্নেহ করতেন বলে, তাঁর ভাল মন্দ সকল রকম ব্যবহারেরই খোঁজ রাখতেন এবং কোন রকম অন্যায় কাজ করলে, সেজন্য তাঁকে তীব্র তিরস্কারও করতেন।]

কল্যাণবরেষু,

তোমার মাতা ও অপরে তোমার মাসিকের কথা আমার নিকট তুলিয়াছিলেন। উত্তর তাঁহাদিগের মুখে শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা যদি বুঝাইয়া না বলিতে পারিয়া থাকেন, এজন্য আমি সেই সকল কথা পত্রের দ্বারা জানাইতেছি।

আমি যাহা মাসিক দিতাম, তাহা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দিতাম। তোমাকে দিতাম না। এবং তোমাকে দিবার আমার কথা নাই।

তুমি যদি বল—'আমি খাইব কি প্রকারে?' তাহার উত্তরে তোমাকে উপার্জন করিতে উপদেশ দিই। চাকরির জন্য আমাকে আসিয়া ধরিও না। আমি তোমাকে অনেকগুলা চিঠি দিয়াছি। তুমি তাহা ব্যবহার কর নাই। এক্ষণে আর চিঠিপত্র দিতে পারিব না। আপনি চাকরির চেষ্টা করিবে।

আর যদি তোমাকে এ বয়সে নিতান্তই খুড়া জ্যেঠার উপর বোঝা হইতে হয়, তবে আমি একা তোমার খুড়া জ্যেঠা নই। আর সকলেই সাহায্য করিতে সক্ষম। আমাকে একা ভার দেওয়া অনুচিত। এবং আমি তাহা লইবও না। তোমাদিগের ভরণপোষণের ভার আমি একাই বহিতাম বটে, কিন্তু তাহার যে কারণ, তোমার প্রতি তাহা বর্তে না।

আর যদি নিতান্তই তোমার অন্য কোন উপায় না হয়, তবে কেবল তোমার ডাল ভাতের খরচ দিব। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক বিষয় আমার বাধ্য না হইলে তাহা দিব না—

(১) তুমি জমি বেচিয়া যে টাকা পাইয়াছ, তাহার হিসাব দিবে। আমি হিসাব তদন্ত করিব, সত্য কিনা।

(২) তুমি অবশিষ্ট জমি শীঘ্র বিক্রয় করিবে।

(৩) বিক্রির টাকা আমার নিকট আমানত করিবে। আমি তদ্দ্বারা তোমাদিগের দেনা পরিশোধ করিব। এবং অবশিষ্ট টাকা তোমার পিতা যেরূপ বলিবেন, তাহা করিব।

(৪) তোমার মাকে কখনও অপমান করিবে না।

এই চার বিষয়ে আমার অবাধ্য হইলে আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করিব না। আমি এ সকল কথা তোমার পিতাকে লিখিয়াছি।

ইহার উত্তরে লম্বা পত্র লিখিও না। তুমি বড় বড় লম্বা লম্বা পত্র লিখিয়া

থাক। আমি বড় বড় পত্রে বিরক্ত। বড় লম্বা পত্র লিখিলে আমি পড়িব না। ইতি তাং ৮ বৈশাখ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যোতিশের মায়ের নাম ছিল নবরঙ্গ দেবী। মায়ের স্বভাব তো, তাই তিনি পুত্রের ব্যবহারে সম্মান না পেলেও সেই পুত্রেরই খাওয়া পরার চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে জ্যোতিশকে লিখেছিলেন, চাকরির জন্য তোমাকে অনেকগুলি চিঠি দিয়েছিলাম, তুমি তা ব্যবহার করনি—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ ধরণের একটা চিঠি এর পরে উদ্ধৃত করলাম।]

প্রিয়তমেষু,

মথুরাপুরের Special Registrar খালি। মাসিক লাভ আন্দাজ ১০০ টাকা। মথুরাপুর জয়নগর মজিলপুরের নিকট। রেল হইতে ৪।৫ ক্রোশ হইবে। তোমার চেষ্টা করা কর্তব্য। অতএব আসিয়া চেষ্টা করিবে।

মেজবাবু এখন বাড়ি যাইতেছেন না। তাঁহার প্রতিক্ষা করিতে গেলে বোধ হয় ঘটিবে না। তুমি সকালের ট্রেনে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে পার। বাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে।

এ সকল আমার নিজ মতানুসারে লিখিলাম। মেজবাবু কি বুঝেন বলিতে পারি না। তাঁহার মতের অপেক্ষা করিলাম না। ইতি তাং ১২ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যোতিশ মথুরাপুরে চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলেন কিনা জানা না গেলেও, তবে তিনি নিজেও যে একেবারে চাকরির চেষ্টা করতেন না,

তা নয়। এ সম্পর্কে কাকা বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখা জ্যোতিশের একটা চিঠি প্রসঙ্গতঃ এর পরে উদ্ধৃত করেছি।]

প্রিয়তমেষু,

গ্রাণ্ট সাহেবের সঙ্গে অদ্যই সাক্ষাৎ করা উচিত। তাঁহার বাসা কোথায় আমি জানি না। সাক্ষাৎকালে আমাদিগের পরিচয় দিতে পার। ইতি—

এখানে আহারের কষ্ট হইবে। বাসায় আহার করা ভাল।

[জ্যোতিশ একবার বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসায় এসে বাড়ির দরোয়ানের মারফৎ কাকাকে লেখা তাঁর একটি চিঠি হাওড়ার কোর্টে কাকার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেটা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশের চিঠি পেয়ে সেই চিঠিরই এক পাশে উপরের ঐ কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দরোয়ান কোর্টে গিয়ে আরদালি মারফৎ জ্যোতিশের চিঠিটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই চিঠিটি পড়ে মনে করেছিলেন, জ্যোতিশই কোর্টে এসে নিজে আরদালির হাত দিয়ে চিঠিটি পাঠিয়েছে। তাই তিনি চিঠির শেষে জ্যোতিশকে বাসায় অর্থাৎ তাঁর কলকাতার বাসায় আহার করার কথা বলেছিলেন।

কাকাকে লেখা জ্যোতিশের চিঠিটি ছিল এই—

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ, গতকল্য আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, হুগলীর দ্বিতীয় মুনসেফের সেরাস্তাদারি ২।৩ দিন মধ্যে খালি হইতেছে, এবং ঐ কার্যে অন্য এক ব্যক্তি শীঘ্র নিযুক্ত হইতেছে। আরও শুনিলাম যে, হুগলীর জজ গ্রাণ্ট সাহেব মনে করিলেই আমি

কার্যটি পাইতে পারি। অতএব অদ্য প্রাতঃকালেই গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে হুগলী গিয়া শুনিলাম গ্রাণ্ট সাহেব হুগলীতে থাকেন না। কলিকাতায় থাকিয়া নিত্য যাতায়াত করেন। কলিকাতায় কোথায় থাকেন, তাহা নিশ্চয় কেহ বলিতে পারিল না। ২।১ জন অনুমান করিয়া বলিল যে Bengal club-এ থাকাই সম্ভব। কারণ, ইতিপূর্বে উহাদের মধ্যে একজন সাহেবকে তথায় দেখিয়াছিল। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায়ে হুগলী হইতে যে মেল ট্রেন ৯টায় ছাড়ে তাহাতে আসিয়া এখনই মহাশয়ের বাসায় পৌছিয়াছি। গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ করা উচিৎ ছিল কিনা এবং এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা আমাকে লিখিয়া পাঠাইতে আজ্ঞা হইবে। আর গ্রাণ্টের কলিকাতার বাসার ঠিকানা যদি মহাশয়ের জানা থাকে, তবে তাহাও লিখিবেন। আমি অদ্যই গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করার মনস্থ করিয়াছি। কারণ, এ চাকরির উমেদার অনেকে আছে।

মহাশয় এক্ষণে কার্যে ব্যস্ত বলিয়া তথায় শ্রীচরণ দর্শন করিয়া বক্তব্য নিবেদন করিতে যাইলাম না। ইতি তাং ১৫ নবেম্বর

সেবক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র

পুঃ লিঃ

৺কার্তিক পূজা উপলক্ষ্যে অদ্য ও আগামী কল্য হুগলীর দেওয়ানি আদালত বন্ধ আছে;]

Wait till I have leisure, which I shall get in half an hour.

B. C. C.

[জ্যোতিশ একবার নিজে হাওড়ার কোর্টে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার কথা লিখে জানালে অর্থাৎ স্লিপ দিলে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই

স্লিপের উপরেই দেখা হওয়ার সময় সম্বন্ধে ঐ কথা লিখে দিয়েছিলেন।
জ্যোতিশের চিঠি বা স্লিপটা ছিল এই—

শ্রীচরণেষু,

আমি এখনই এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করিলে তার অনুবর্তী হইব। ইতি

সেবক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র]

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। অটলবিহারী মৈত্রের সঙ্গে আমার আলাপ নাই। পূর্ণর সঙ্গে আছে। কিন্তু বোধ হয় শত্রুভাব।

তোমার পিতার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তিনি ভাল আছেন।

ত্রিশ টাকায় অনেকের সংসার চলিতেছে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া তোমাদেরও চলিতে পারে। তোমার পিতাকে খরচ পাঠাইতে হইতেছে। তোমাদের দিতে হইতেছে। রামহরিকে দিতে হইতেছে।···কেও কখন কখন দিতে হয়। একা মানুষ আর কত দিক পারে। তোমরা আপনার গরজ ভিন্ন আর কিছু দেখ না। তাই আমাকে আবার টাকার জন্য লিখিয়াছ। ইতি তাং ২ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বেকার জ্যোতিশচন্দ্র অটলবিহারী মৈত্রকে ধরে একটা চাকরির চেষ্টায় ছিলেন। তাই অটলবাবুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ আছে কিনা, এ কথা জ্যোতিশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দুই অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেও সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানতঃ দেশে তাঁর পাওনাদারদের জ্বালাতেই বাড়ি না ফিরে এলাহাবাদে থেকে যান। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি তাঁর দেয় মাসিক বরাদ্দের টাকা এলাহাবাদেই পাঠিয়ে দিতেন।
চিঠির '...' অংশটি ছিন্ন।]

কল্যাণবরেষু,

তোমার মাতার টাকা ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতায় পাঠাইয়াছি। তোমার পিতার পত্র পাইয়াছি। ভাল আছেন। ইতি তাং ২৫ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

আমি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তোমাদিগের খরচের ৯০ টাকা পাঠাইলাম। ১০ টাকা মেজবাবু রাখিলেন। তিনি ব্যস্ত আছেন। বড়বাবুর পীড়া কিছু বৃদ্ধি। তোমাদিগের মঙ্গলাদি লিখিবে। ইতি—শুক্রবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে বাড়ি কিনেছিলেন। কর্মস্থল মেদিনীপুর থেকে কলকাতার এই বাড়িতে আসার কথাই চিঠিতে লিখেছিলেন।
সঞ্জীবচন্দ্রও এই সময় এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসেন। এসে তখন কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন।
বড়বাবু অর্থাৎ বড়দা শ্যামাচরণ তিনিও অসুস্থতার জন্য কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে এসেছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র আজ পাইলাম। আমি মফঃস্বলে আছি। ডাক চলে না। বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এজন্য তোমার পত্র পাইতে আমার বিলম্ব হইয়াছে। উত্তর পৌছাইতেও বিলম্ব হইবে।

বাটি মেরামতের জন্য এ মাসে ৫০ টাকা দিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার এখানে মফঃস্বলে খরচ মাসে ১২৫ টাকা পড়িয়াছে। এ মাসে ৬০০ টাকা মাত্র বাড়ি পাঠাইয়াছি। বোধ করি তাহাতে টাকার অকুলান হওয়াতে টাকা দিতে পারে নাই। বিশেষ এ মাসে আর আর অনেক খরচ আছে। তুমি কলকাতায় তোমার খুড়ীর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ করিতে পার, তবে সবিশেষ অবস্থা বুঝিতে পারিবে। আমিও এ বিষয়ে পত্র লিখিলাম। ফলে খরচ পত্রের বন্দোবস্তের ভার তোমার খুড়ীর উপর। আমি এ সকল ঝঞ্ঝাট হইতে ক্রমশঃ অবসর লইতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

তোমার দেওয়া ফর্দ তোমার পিতার নিকট পাঠাইয়াছি। আমি মেদিনীপুরে পৌছিয়াছি। এখানে তোমার চাকরির চেষ্টা দেখিব। হইতে পারিবে বোধ হয়।

এখন তোমার হাতে যে টাকা আছে, তাহা হইতে পূর্বমত এ কয় দিনের খরচ চালাও। মাস কাবারে কিছু টাকা পাঠাইব। ইতি তাং ১৯ মে

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে জ্যোতিশকে চাকরির জন্য চিঠি লিখে দিলেও বা কোথায় চাকরি পাওয়া যাবে তার হদিস দিলেও তিনি জ্যোতিশের চাকরির জন্য তেমন চেষ্টা করেন নি। জ্যোতিশের কোথাও চাকরি হচ্ছেনা দেখে এবার তিনি নিজেই জ্যোতিশের চাকরির চেষ্টা করেন।

এই চেষ্টার ফলে জ্যোতিশ মাস খানেক পরেই মেহেরপুরে পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরিটি পান।

চাকরি জোগাড় করার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি সম্মানবশতই জ্যোতিশকে সাব্‌ ইন্‌সপেকটর অব্‌ পুলিশ না করে, এর উপরের স্তরে একেবারে ইন্‌সপেকটর অব্‌ পুলিশের চাকরিটি দিয়েছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

তোমার পিতা পুনর্বার রোগে পড়িয়াছেন লিখিয়া ছিলেন। তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ছিলাম। এক হপ্তা হইল পত্র লিখিয়াছি। কোন উত্তর পাই নাই। বোধ করি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতএব তুমি তাঁহার সম্বাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। তিনি যদি আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে স্বয়ং পত্রের উত্তর লিখিতে বলিবে। কাঁটাল পাড়ায় দলাদলি...। জানিয়া...কিছু প্রয়োজন আছে।

আমি শারীরিক ভাল আছি, তাঁহাকে বলিবে। আমার জায়গায় এ পর্যন্ত কোন লোক নিযুক্ত হয় নাই। অতএব কবে যাইব, তাহার কোন স্থিরতা নাই। ইতি তাং···মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠির '...' অংশগুলি ছিন্ন থাকায় ঐ সব জায়গায় কি লেখা ছিল জানা গেল না।]

প্রিয়তমেষু,

তোমার জ্যেষ্ঠ তাতের এক পত্র ডাক যোগে পাইলাম। তাহাতে তোমার পিতা ও ছোটকাকার প্রতি এরূপ উক্তি আছে যে, তাহা শুনিয়া তাঁহাদের মর্মান্তিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সে পত্র তাঁহাদিগকে পড়িতে দিলাম না। তোমার জ্যেঠা মহাশয়ের উদ্দেশ্য যে মেজবাবু ও ছোটবাবু সে পত্র দেখেন। তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে জানাইও যে আমি তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। ভবিষ্যতে তাঁহার কোন পত্র আসিলে আমি তাহা খুলিব না। কেননা, ঐরূপ কথা পড়ায় কোন ভাল ফল নাই। কেবল বিবাদ ও মর্মপীড়া বৃদ্ধি পায় মাত্র। এজন্য আর তাঁহার পত্র পড়িব না।

তুমি এই সকল কথা তাঁহাকে জানাইবে। যদি নিজে না জানাইতে পার, তবে এই পত্র তাঁহার পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দিবে।

তিনি জানিতে চাহিয়াছেন সম্বাদ দাতা কে? তাঁহাকে বলিও, সম্বাদ দাতা স্বয়ং জানকী রায়। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, আমাদের তদারকের ফল কি হইয়াছে। ফল কিছুই হয় নাই। আমি পীড়িত, সিঁড়িতে উঠিতে নামিতে পারি না। সুতরাং জানকী রায় কি রাধামাধব হালদারের নিকট যাইতে পারি নাই। জানকী রায়ের কাছে গেলেও আর কিছু বেশী কথা পাওয়া যাইবে না। রাধামাধবকে পত্র লিখিয়াছিলাম। সে কোন উত্তর দেয় নাই। আর কি তদারক করিতে বলেন?

এই সকল কথা তাঁহাকে জানাইও। নিজে না জানাইতে পার এই পত্র পাঠাইয়া দিও। ইতি তাং ৩০ শ্রাবণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ। পত্রে তোমার জ্যেঠা মহাশয়ের যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, তিনি রাগে সর্বদা কষ্ট পান। বুঝাইয়া বলিও, ক্রোধ শরীর নাশক। সর্বদা যাহাতে আনন্দে থাকেন, সেই চেষ্টা করিতে বলিও। ঝগড়া বিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে। আর কাজ নাই। তোমার বাপকে একবার ডাকিতে বলিও, সব মিটিয়া যাইবে। ইতি—

[সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের উপর শ্যামাচরণের অত রাগের কারণ সম্বন্ধে যা জানা যায় তা এই—

প্রথমত—পিতা যাদবচন্দ্র তাঁর সমস্ত বাস্তভিটা সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে দান করায় শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র নিজের অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের কিছুটা অংশ নিয়ে সেখানে থাকতেন। শ্যামাচরণ কিন্তু বাস্তু থেকে সম্পূর্ণই বঞ্চিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত—যাদবচন্দ্র আবার এক ক্রোড় দানপত্র করে কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে ঋণযুক্ত করবার জন্য পূর্ণচন্দ্রের অংশের দেয় পিতৃঋণের টাকা শ্যামাচরণ প্রভৃতি চারজনের উপরেই সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত—সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন প্রেসের জন্য যখন কলকাতায় জানকীনাথ রায়ের কাছে ১৫০০ টাকা ঋণ করেন। সেই ঋণপত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে যাদবচন্দ্রও সহি করেছিলেন। যাদবচন্দ্র সহি করার ফল হয়েছিল এই যে, তাঁর মৃত্যুর পরেই জানকী রায় যাদবচন্দ্রের চার পুত্রের নামেই পাওনা আদায়ের জন্য নালিশ করেছিলেন।

এই সব টাকা পয়সার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কিছু মনেই করতেন না। শ্যামাচরণ কিন্তু টাকার ব্যাপারে খুব হিসাবী ছিলেন। কারণ, তিনি প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৮০০ টাকা মাইনের চাকুরে হলেও তাঁর সংসার ছিল বেশ বড়। পুত্র ছিল ৩টি, আর কন্যা ছিল ১১টি। তিনি কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন রীতিমত অর্থব্যয় করে বেশ বড় বড় ঘরে। যেমন, তাঁর এক জামাতা ছিলেন উত্তরপাড়ায় জমিদার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর জানকী রায় শ্যামাচরণের নামে নালিশ করলে, তখন পিতার অবর্তমানে শ্যামাচরণের ক্রোধটা গিয়ে পড়েছিল সঞ্জীবচন্দ্রের উপরে। এই সঙ্গে পিতার ক্রোড় দানপত্রের কথা স্মরণ করে পূর্ণচন্দ্রের উপরও শ্যামাচরণের রাগ হয়েছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের উপর শ্যামাচরণের এই যে রাগ এও অবশ্য ছিল তখনকার মত সাময়িকই। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে যে বলেছিলেন—

তোমার বাপকে একবার ডাকতে বোলো, সব মিটে যাবে—সেই মতই সঞ্জীবচন্দ্র দাদার কাছে গেলে তাঁর রাগ পড়ে যায়।

বিষয়-সম্পত্তি বা টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন কোন ভাইয়ের সঙ্গে শ্যামাচরণের এক-আধবার মনোমালিন্যের নজীর পাওয়া গেলেও, সব ভাইয়ের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাবেরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।]

কল্যাণবরেষু,

বুধবার বৈকালে সিধুর বিবাহের আশীর্বাদ হইবে। তুমি এবং কৃষ্ণ দুইটার গাড়ীতে আসিবে। আহারাদি করিয়া ৯।। টার গাড়ীতে যাইতে পারিবে। তোমাদের পথ খরচা এখানে দিব। ইতি তাং ২৫ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সিধু হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর কৃষ্ণ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের পুত্র।]

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ১৫ টাকা রথের খরচের জন্য চাহিয়াছিলে, ...উমাচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে কিনা, তাহার কোন সম্বাদ আমাকে কেহ লিখিল না। তুমি আমাকে তাহা লিখিও।

শরতের পুত্রের পুনর্বার কঠিন পীড়া হইয়াছিল।...ইতি তাং ২২ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ। এবার যখন কলিকাতায় লোক আসিবে ২৫ খানি চন্দ্রশেখর পাঠাইয়া দিবা। চাবি তোমার কাছে আছে।...

[ভাটপাড়া নিবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একজন কর্মচারী ছিলেন। ইনি সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের ব্যাপারে দেখাশুনা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের খরচে নিজের বই ছাপতেন। ছেপে পুস্তক বিক্রেতাদের দিতেন। তাঁরা কমিশন নিয়ে বই বেচে দিতেন।]

প্রিয়তমেষু,

তোমার চাকরি হওয়ার সম্বাদ পাইয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তোমার চাকরিতে আমার নিজের বিশেষ উপকার। কিন্তু তাহা তত আনন্দের কারণ নহে। তুমি অমানুষ হইয়া যাইতেছিলে, এক্ষণে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। আর আমি আজ মরিলে কাল তোমাদিগের সংসার নির্বাহের উপায় ছিল না, সে উপায় হইল। ইহাই আমার বিশেষ আনন্দের কারণ।

তুমি Health Certificate জন্য চিন্তিত হইয়াছ। Civil Surgeon তোমাকে পরীক্ষা করিলেই Certificate দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন বিশেষ Organic Disease না থাকিলে কেহই Certificate দিতে অস্বীকার করে না। তোমার সেরূপ কোন পীড়া নাই।...

Inspector general office হইতে তোমাকে একখানি Civil Surgeon নামিত চিঠি দিবে, সেই চিঠি দেখাইলেই Civil Surgeon একখানি form fill up করিয়া দিবে। তাহাতে কোন আশঙ্কা বা গোলযোগ নাই। প্রথম Salary bill সঙ্গে ঐ Certificate খানি পাঠাইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে চাই না। Civil medical office ঐ Certificate দিতে বাধ্য। তোমায় কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। কেবল বয়সের একটু গোলযোগ আছে। সে বিষয়ে মেজবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিবে।...তবে ২৫ বৎসরের উপর বয়স বলিয়া নিজে মুখে স্বীকার করিলে গোলযোগ হয়। এজন্য সকলেই বলিয়া থাকে, আমার বয়স ২৪ বৎসর ৮ কি ৯ মাস। তাহাতে কেহ কিছু মনে করে না।

তোমাকে যদি শীঘ্র Join করিতে বলিয়া থাকে, তবে শীঘ্রই যাইবে। Health Certificate জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। কেবল Inspector General Office হইতে Civil Surgeon নামিত চিঠিখানা লইয়া যাইবে। ঐরূপ চিঠি District office হইতেও পাওয়া যাইতে পারে।—

কার্য সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছ। তাহা আমি পশ্চাৎ দিব এবং তাহার অনুবর্তী হইলে তোমার উপকার হইবে। আপাততঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবে।

(1) Code of criminal procedure, specially chapter 5, 6, 7, 14, Cal 3 Sub, 11.

(2) Penal code

(3) Evidence act

(4) Police mannual,

অন্যান্য বিশেষ কথা পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব। তুমি কবে রওয়ানা হইবে জানাইবে। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হেল্‌থ সার্টিফিকেট সম্বন্ধে কাকা অভয় দেওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিশ এই নিয়েই নানা চিন্তা করতে থাকেন এবং কাজে যোগ দিতে যেতেও দেরি করেন। এ সম্পর্কে জ্যোতিশের একটা চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশকে আবার এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। Health certificate সম্বন্ধে তুমি যে সকল অনুমান করিতেছ, তাহা অমূলক। এইরূপ সকল বিষয়ে…আপনা-আপনি মনের ভিতর…লইলে কর্ম কাজ চালাইতে পারিবে না। যে অনর্থক ভয়ে ভীত হয়, তাহাকে বুঝানো ভার। এজন্য তোমাকে বুঝাইবার কোন চেষ্টা করিলাম না।

কর্মস্থলে যাইতে আর বিলম্ব করিও না। অন্যত্র টাকা না পাও, তোমার পিতার নিকট পূর্ণচন্দ্রের প্রেরিত যে পূজার তহবিল আছে, তাহা হইতে

যাইবে। পশ্চাৎ তাহা পূরণ করিলে চলিবে। আমার হাতে এখানে এখন কিছু নাই। এজন্য পাঠাইতে পারিলাম না।…ইতি তাং ২৯ আগষ্ট সোমবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠির '…' অংশগুলি ছিন্ন।

এই চিঠিতে যে পূজার তহবিলের কথা আছে, সে হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দুর্গা পূজার তহবিল। সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঐ সময় বাড়িতে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র নিজেদের কর্ম্মস্থলে থাকায় সঞ্জীবচন্দ্রই বাড়ির পূজার ব্যবস্থা করতেন। পূজার টাকা দিতেন বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।]

জ্যোতিশ চাকরি পেলে কি ভাবে কাজকর্ম করবে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তখন যেমন চিঠি লিখে জ্যোতিশকে উপদেশ দিয়ে ছিলেন (বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তেমনি জ্যোতিশের চাকরিতে প্রথম মাইনে পাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিলে, তখন আবার তিনি জ্যোতিশকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বেতনের জন্য Inspector General সাহেবের Personal Assistant কে এইরূপ লিখিতে পার। I have made several applications to the District Suptd. of police for issuing my salary for—. He has neither issued my salary nor assigned any reason for withholding it. I humbly solicit that he may be instructed to issue my salary. ইতি তাং

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিশের চাকরির ব্যাপার নিয়েই তাঁকে লেখা আর একটি চিঠি—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যে বিষয় লিখিয়াছ, তাহার অনুসন্ধান লওয়া অবশ্য কর্তব্য। অনুসন্ধান, কলিকাতায় Inspector General সাহেবের আপিসের কেরাণিদিগের দ্বারা জানিতে হইবে। তুমি নিজে আসিয়া জানিবে অথবা তোমার পিতাকে পাঠাইয়া দিবে।

Toynbee সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু কোন ফল হইবে না বোধ হয়, কেন না সে লোক ভাল নহে। Paul সাহেব এখন আর Inspector General নহে। Bolton সাহেব তাহার জায়গায় হইয়াছে। Bolton সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ নাই। কিন্তু সে Chachenzie সাহেবের বাধ্য হইবার সম্ভাবনা। Chachenzie সাহেব শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। তোমার পিতা একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে এ বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে। পার যদি তাঁহাকে সম্মত করিও। আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে চান না। ইতি তাং ৯ নবেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র

[সঞ্জীবচন্দ্র কিছুটা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।]

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি এক শত টাকা বেতনের চাকরি করিতেছে। এক্ষণে আমার নিকট কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা অন্যায়। যাহারা ঐ বেতনের চাকরি করে, তাহারা সকলেই আপন আপন পরিবার বিনা কষ্টে প্রতিপালন করিয়া থাকে। আমি এ মাসে কোন খরচ পাঠাই নাই ও পাঠাইব না।

তোমার পিতার জন্য কোন চিন্তা নাই। তিনি মনে করিলেই আমার নিকট আসিয়া থাকিতে পারেন। ইতি তাং ৬ অকটুবর।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে লিখেছিলেন, আর অর্থ সাহায্য করব না। কিন্তু এ কথা বললে কি হবে! তিনি আগের মত জ্যোতিশকে মাসিক সাহায্য করতেন না বটে, তবে মাঝে মাঝে নানা ব্যাপারে সাহায্য করতেই হ'ত। যেমন, জ্যোতিশের চাকরিতে একবার বদলির জন্য তাঁকে অর্থ সাহায্য করছেন। এ সম্পর্কে লেখা চিঠিটি এই—

প্রিয়তমেষু,

বদলির জন্য যে ৫০ টাকা আবশ্যক, তুমি কাল এখানে আসিলে আমি তোমাকে দিব। ইতি তাং ৩ শ্রাবণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিশের চাকরিতে বদলি ইত্যাদির ব্যাপারেই শুধু নয়, চাকরিতে তাঁর ছুটি নেওয়ায় বা গণ্ডগোল দেখা দিলে, সে সব বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে মাথা ঘামাতে হ'ত। এ সম্পর্কে জ্যোতিশকে লেখা তাঁর ৩টি চিঠি এখানে দিলাম—

কল্যাণবরেষু,

তোমার ৭ হপ্তার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। চিঠি আসিয়াছে। চিঠি আমার কাছে আছে। ইতি তাং ১৩ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র কাল বৈকালে পাইলাম। এখানে টেলিগ্রাফ নাই। সুতরাং টেলিগ্রাফের দ্বারা কোন উত্তর দিতে পারি নাই। আমি অদ্য বাটী রওনা হইব। মঙ্গল বুধবার নাগাদ কলিকাতা পৌছিতে পারি। কলিকাতায় সাক্ষাৎ হইলে তোমার কথার সবিশেষ উত্তর দিব।...হইয়া থাকে ব্যস্ত হইও না। যাহাতে অনিষ্ট না হয় তাহা করিব। ইতি তাং ২৬ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তুমি যখন কোন অত্যাচার কর নাই, তখন কোন ভয় নাই। ভয় পাইও না। ...ভয় অপরাধের লক্ষণ বুঝায়। ১৫ ফিব্রুয়ারি উত্তম দিন। পাঁজি দেখিয়া বারবেলা বাদ দিয়া যাত্রা করিও।

অনিলের বিবাহ সকালেও হইতে পারিবে। কেন না অরক্ষণীয়া কন্যা। কন্যা না দেখিলে সম্বন্ধ ঠিক হইবে না। বিশেষতঃ এখনও টাকার স্থিরতা হয় নাই।

ছুটি মঞ্জুরির একমাস মধ্যে ছুটি avail of করিতে পার। অনুমতি লইয়া আরও অধিকদিন পরে পার।

তোমার সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত একটা কনষ্টবল কি চৌকিদার আসে না কি? পাঁড়ে গিয়া নৈহাটি স্টেশনে অপেক্ষা করিতে পারে। ইতি তাং ২১ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[পাঁড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির দরোয়ান। শেষের চিঠি ছুটি ছিল]

২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ড হারবারের কাছে মুড়াগাছা পরগণায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের একটা ছোট তালুক ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রচুর ঋণ এবং জ্যোতিশচন্দ্রকেও বেকার দেখে যাদবচন্দ্র মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর ঐ মুড়াগাছা তালুকের এক শ' বিঘা জমি জ্যোতিশকে পৃথকভাবে দিয়ে যান। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইয়েই বাকি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। জ্যোতিশের অংশ-সহ মুড়াগাছার এই সমস্ত সম্পত্তিরই ইজারাদার ছিলেন নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতিশের মুড়াগাছার ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটি চিঠি এখানে দিচ্ছি। তার আগে, সঞ্জীবচন্দ্রের ঋণের জন্য জনৈক ডিক্রিদার কর্তৃক তাঁর বাড়ি ক্রোক করায় বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় যে চিঠি দিয়েছি, সেই প্রসঙ্গে জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি চিঠি পরে পেয়েছি। ঐ সঙ্গে ঐ মামলার কয়েকটা কাগজ পত্রও

পেয়েছি। বইয়ের ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটিতে জানকী রায়ের কথা আছে। সেখানে প্রসঙ্গ কথায় বলেছি, এই জানকী রায়ের কাছেই সঞ্জীবচন্দ্র ঋণ করেছিলেন। এখন ঐ মামলার কাগজপত্র পেয়ে দেখছি, ঋণদাতা জানকী রায় নয়, মথুরামোহন রায়। মনে হয়, জানকী রায় মথুরা রায়ের বাড়িরই কোন নিকটজন ছিলেন।

ঐ সঙ্গে শ্যামাচরণকে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৮০০ টাকা বেতনের চাকুরে বলেছিলাম। এখন দেখছি, সম্ভবতঃ তিনি প্রথম শ্রেণীর হন নি, সেই হিসাবে বেতনও ৮০০র কিছু কম ছিল।

পরে পাওয়া সেই চিঠিটি হ'ল এই—

প্রিয়বরেষু,

তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে বিষয়ে যে আইন আছে, তাহা নকল করিয়া পাঠাইলাম।

দস্তকে একটি সময় নিরূপিত থাকে। তাহার মধ্যে দস্তক জারি না হইলে দস্তক ফেরৎ হয়। ঐ সময় প্রায় এক হপ্তা কি দুই হপ্তা এইরূপ থাকে। তাহার পর ডিক্রিদার প্রার্থনা করিলে নূতন দস্তক হইতে পারে।

সারদার সম্বন্ধী অধ্যাপকদিগকে দিবার জন্য ২৫০ টাকা দিয়াছিল। তাহা মেজবাবুকে দিয়াছিলাম। তাহা তিনি অধ্যাপকদিগকে দিয়াছেন, কি রাখিয়া গিয়াছেন, কি লইয়া গিয়াছেন, আমাকে লিখিবে। তাঁহার কোন পত্র পাই নাই। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

For the purpose of making an arrest no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise. No outer door of any dwelling house shall be broken open—অতএব দিনমানে বাহির দ্বার বন্ধ রাখিবে, রাত্রে খুলিবে।

But when the peon has duly gained access to any dwelling house he may unfasten and open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found. Provided that if the room be in the actual occupancy of a woman who is not the judgment debtor and who

according to the customs of the countries does not appear in public, the peon shall give notice to her that she is at liberty to withdraw and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her every reasonable facilities for withdrawing he may enter such room for the purpose of making the arrest.

[জ্যোতিশ বাড়িতে বিপদের সম্ভাবনা দেখে সেজ কাকার শরণাপন্ন হয়ে উপদেশ চেয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভয় দিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন।
চিঠির সারদা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। এঁর সম্বন্ধী ছিলেন ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিববাবু তাঁর বাবা কিংবা মা'র শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভাটপাড়ার টোলের পণ্ডিতদের দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ২৫০ টাকা দিয়েছিলেন।]

এবার জ্যোতিশের জমি বিক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত চিঠিগুলি উদ্ধৃত করছি—

প্রিয়তমেষু,

নীলমণি পূজার পূর্বে বাড়ি গিয়াছে। এ পর্যন্ত আসে নাই। আর সে আসিলেও ফসল না উঠিলে জমি বিক্রয় হইবে না। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য কোন চেষ্টা হইতে পারে নাই। হরি ধোপার জন্য উমাচরণকে পাঠান হইয়াছিল, তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। ইতি তাং ১ নবেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

আমি পুনর্বার খরচ পত্র দিয়া রামময়কে মুড়াগাছায় তোমার জমি বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া ছিলাম। কিন্তু গোমস্তার ভাওচির জন্য উহায় কিছুই হইতে পারে নাই ও হইবার সম্ভাবনা নাই।

এতদিন তোমার কলিকাতার মহাজনদিগকে স্থগিত রাখিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহারা আর থাকে না। এক্ষণে তাহারা জমি কোবলা করিয়া লিখিয়া লইতে সম্মত হইয়াছে। তুমিও তাহাতে সম্মত আছ পূর্বপত্রে লিখিয়া ছিলে। অতএব এক্ষণে সে মত আছে কিনা লিখিবে।

শ্রীশচন্দ্রের শ্বশুর শ্যামাচরণ পণ্ডিতভুণ্ডকে ঐ জমি লইবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়া ছিলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর এ পর্যন্ত দেন নাই। তিনি বেশী টাকা দিবেন এমন বোধ হয় না। কত টাকায় তাঁহাকে দিতে পারি লিখিবে।

আমি মুড়াগাছা হইতে ৫৭ টাকা দশ আনার চাউল আনিয়াছি। আমাদের গোমস্তার দ্বারা কিনিয়াছি। সে ঐ টাকা তোমায় দিতে বলিয়াছে। টাকা তোমার কাছে পাঠাইব, কি উহা হইতে কাঁটালপাড়ায় রাঁড়ী-বালতির খুজরা দেনা পরিশোধ করিব লিখিবে। তুমি না বলিলে কাহাকেও কিছু দিব না। বিধু, কুমুদিনি প্রভৃতি কয়েকজন দুঃখী বড় বিরক্ত করে। ইতি তাং ১৫ মার্চ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ। তুমি কেমন আছ, আর কোন সংবাদ পাই নাই। তাহা লিখিবে।

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আঙ্গুলে একটু বেদনা হওয়ায় নিজে হাতে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তুমি নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াই যেরূপ ভাবে ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই—উপরওয়ালা সাহেবরা যখন যাহা বলিবেন, তখনই তাহা স্বীকার করিতে হইবে এবং সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। রাসবিহারীবাবু কুলোক হইলেও তাঁহার উপর কিছু মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা সাহেবের নিকট কিম্বা অপর কাহারও নিকট কিছু মাত্র বলিবে না এবং তাঁহার খুব আনুগত্য করিবে।

তিনি কাজ শেখান বা না শেখান আপনি কাজ শিখিবে। যে আপনি কাজ শিখিতে জানে, তাহার পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। যে আপনি কাজ শিখিতে না জানে পরের সাহায্যে তাহার কোন উপকার হয় না। সাহেব যগুপি তোমাকে কুষ্টিয়া যাইতে বলেন, তখনই তাহা স্বীকার করিবে। কাজের জন্য আটকাইবে না। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ চালাইবে। Magistrate সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমাকে সদরে রাখার জন্য কোন কথা বলিবে না, ইহাকে 'ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া' বলে। District সাহেব তাহাতে খুব রাগ করিবার সম্ভাবনা। বংশ মর্যাদা লইয়া একশবার বড়াই করিবে না, উহাতে লোকে বিরক্ত হয় ও উপহাস করে এবং বংশেও এমন কিছু গৌরবের কথা নাই যে সকলের কাছে বড়াই করা যায়। অমুককে কুষ্টিয়ায় দাও, আমি যাইব না, এমন সকল কথা সাহেবের কাছে বলিবে না। সর্বদা নম্রভাবে চলিবে। নম্রতা শিক্ষা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা তোমাকে পরামর্শ দিয়াছে যে 'তুমি ছয় মাস কাল সদরে থাকিতে চাও, একথা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার' তাহারা তোমার শত্রু। জোর করিয়া কোন কথা বলিলে তোমার চাকরি থাকিবে না।

সাহেবরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। বাঙ্গালী বিশেষতঃ তোমার মত ক্ষুদ্র চাকরের কোন কথারই জোর চলে না, ইহা নিশ্চিত জানিও।

কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াই রাসবিহারীবাবুকে অথবা অন্য কাহাকে শত্রু করিও না। ইতি তাং ১৭ই ভাদ্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু—

তোমার পত্র পাইয়া ও তুমি কঠিন রকম পড়িয়া যাওয়ার সম্বাদ পাইয়া চিন্তিত আছি। কোথায় কি রকম জখম হইয়াছে, কিরূপ চিকিৎসা হইতেছে, এক্ষণে কেমন আছ, আর এখন লোক পাঠান আবশ্যক কিনা লিখিবে।

তুমি বাড়ি আসিলে সপিণ্ডকরণ হইবে। আমি সেই সময় দিনস্থির করিয়া দিব। ভাদ্র মাস পড়িতে না পড়িতে যাহাতে পরিবার লইয়া যাওয়া হয় সে চেষ্টা করা আবশ্যক।

কাঁটালপাড়ার সব ভাল আছে, সম্বাদ পাইয়াছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছ কিনা লিখিবে।

তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন এক্ষণে হইতে পারে না। কেন না তাহার সর্বাঙ্গে ফোড়া ও জ্বরও কখন কখন হইয়া থাকে। অসুস্থ শরীরে অন্নপ্রাশন দিতে নাই। উপনয়নের সময়ে হইবে।

সুতরাং এক্ষণে সপিণ্ডকরণের প্রয়োজন নাই।

নীলমণি মুড়াগাছায় গিয়াছিল। পুনশ্চ আসিয়াছে। সে মুড়াগাছায় যাওয়ার পর আমার পরিবারবর্গ লইয়া রাখাল কাঁটালপাড়ায় গিয়াছিলেন ও এক্ষণে তাঁহারা সেইখানে আছে। অতএব চিন্তার বিষয় নাই।

টাকা মাস কাবারে কৈলাসের নিকট পাঠাইবে। কৈলাসকে টাকা মজুত রাখিতে বলিবে; আমি বাটী গিয়া খরচ পত্র করিব। আমি সংসারের সকল বন্দোবস্ত করিতেছি।

যদি মেহেরপুরে পীড়া বেশী না থাকে, তবে পরিবার লইয়া যাওয়াই ভাল। কেন না তোমার নিজের তত্ত্বাবধান নহিলে ছেলেগুলি ভাল থাকে না। আর তোমাদের বাড়ির Ceptic বা কুয়া পাইখানা অতিশয় অনিষ্টকারী জানিবে।

অনিলের একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্র ধনী ব্যক্তি, সব ভাল, কিন্তু বয়স ৩৬ বৎসর। তোমার মত কিনা, অনিলের বিবাহে ব্যয় করা তোমার বা আমার ক্ষমতা নাই। অতএব যাহাতে অল্প ব্যয়ে হয়, তাহাই খুঁজিতে হয়। কৃতদার পাত্রে ব্যয় হইবে না। ইতি তাং ২৮ শ্রাবণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

আমি নিজে এক মাস হইতে পীড়িত। প্রায় ১৫ দিবস শয্যাগত ছিলাম।

এক্ষণে ছুটিতে আছি। আমার বাড়িতে বসন্ত রোগের উৎপাত। সিধুর বসন্ত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে তোমাকে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। নীলমণি এক পয়সাও আদায় করিয়া দেয় নাই এবং দিবে এমনও বোধ হয় না। সে আমার কোন কথা গ্রাহ্য করে না। আমার শারীরিক দুরবস্থা দেখিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছে, আমি আর রক্ষা পাইব না। আমি আরোগ্য লাভ করিলে, তাহার নামে টাকার জন্য নালিশ করিব এবং অন্য ইজারাদার বহাল করিব স্থির করিয়াছি।

মুড়াগাছার জমি বিক্রির জন্য সে কোন চেষ্টা করে নাই। আমি রামময়কে পাঠাইতাম, কিন্তু নিজের পীড়ায় ও বিপদ-আপদের জন্য পারি নাই। এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলে কিছু করিতে পারিব না।

নীলমণি আমার কথায় তোমার নিকট যাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। ইতি তাং ২৩ চৈত্র

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

বেতনের টাকা একদিনেই খরচ হইয়াছে। তাহার কারণ কলিকাতায় একটি তেতলা মহল প্রস্তুত করায় এবং অন্যান্য কারণে আমার অনেক টাকা বাজার দেনা হইয়াছে। এজন্য কিছুতেই টাকার কুলান করিতে পারিলাম না।

আমি যখন মুড়াগাছা হইতে চাউল আনাই, তখন বুঝিযা ছিলাম যে, পরে টাকা দিলে চলিবে। এবং যখন তোমার উপর টাকার বরাত স্বীকার করি, তখনও এমন বুঝি নাই যে, এখনই টাকা দিতে হইবে। তাহা হইলে এক্ষণে চাউল আনাইতাম না। যাহা হোক, যখন তোমার টাকার অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে, তখন শীঘ্রই টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছি।

পরম্পরায় শুনিলাম যে, বরদা ভট্টাচার্য ও রাম ফক্কড় তোমার নামে নালিশ করিয়াছে। সত্য মিথ্যা জানি না।

তুমি কেমন আছ লিখিবে। ইতি তাং ৫ এপ্রিল

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠিতে যে তেতলা মহলের কথা আছে, সে হল—বঙ্কিমচন্দ্র মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে যে দুতলা বাড়িটি কিনেছিলেন, সেইটাই তিনতলা করার কথা।

রাম ফক্কড়ের আসল নাম—রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর সম্বন্ধে নৈহাটীর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন—কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল রামফক্কড়। নৈহাটী ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়িতেই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তিনি সব বাড়িতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন এবং ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল।—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ]

প্রিয়তমেষু,

তোমার নামে যে নালিশ হইয়াছে, বিপিনের দ্বারা এক একটা জবাব দেওয়াইব। বিপিন এক্ষণে এখানে নাই। ডায়মণ্ড হারবারে আছে। আসিতে লিখিয়াছি।

Handnote জাল বটে। দেনা তোমার পিতার বটে, তোমার নহে। কিন্তু দেনা যথার্থ। তোমার পিতৃসম্পত্তির উপর ডিক্রি হইলেও আদায় হইবে। কেন না তোমার পিতার পরিত্যক্ত কিছু জমি তুমি দখল কর। রাম ফক্কড় তাহা জানে। এমত স্থলে জবাব দিয়া টাকা নষ্ট করা তাদৃশ বিধেয় বোধ হয় না। তুমি জবাব দিতে লিখিয়াছ। এজন্য বিপিনের উপর ভার দিব। কিন্তু ব্রাহ্মণের যথার্থ পাওনা, আমি তাহার বিরোধী হইতে ইচ্ছুক নহি। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জেলে দিবার তদ্বির জন্য যাহা লিখিয়াছ, আমা হইতে তাহা হইবে না। তাহা হইলে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথকে ইতিপূর্বে জেলে দিতাম।

মোকদ্দমায় জবাব দিতে গেলে খরচ লাগিবে। খরচের টাকা খাজনার টাকা হইতে দিতে লিখিয়াছ এবং নীলমণির নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিতে লিখিয়াছ। কিন্তু নীলমণি তো গত আশ্বিন মাসে বরখাস্ত হইয়াছে। সে কাঁটালপাড়ায় আছে বটে, কিন্তু ছয় সাত শত টাকা…

করিয়াছে। তাহাকে জেলে না দিলে টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার নিকট এক কড়া আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলমণির জায়গায় যে ব্যক্তি বহাল হইয়াছিল, সেও টাকা তছরূপ করিয়া ফেরার হইয়াছে। সেই ব্যক্তি ৫৭ টাকা ১০ আনা তোমার হিস্যায় আমার উপর বরাত দিয়াছে। যদি ঐ টাকা হইতে জবাব দিতে বল, তবে জবাব দেওয়ান যায়। নচেৎ পারিব না। ইতি তাং ২০ এপ্রিল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ণচন্দ্র এই সময় ডায়মণ্ড হারবারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাই বিপিন সেখানে তাঁর পিতার কাছে গিয়েছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

নীলমণিকে পুনশ্চ বহাল করা গিয়াছে। সে মুড়াগাছা গিয়াছে। তোমার জমি এবার বিক্রয় করিয়া দিবে স্বীকার করিয়া গিয়াছে। তার সঙ্গে আর একটা লোকও গিয়াছে। উহাদিগকে কিছু পুরস্কার দিব স্বীকার করিয়াছি।

ভূতনাথকে ধরিয়া আনিয়া তোমার হিসাব নিকাশ করিয়াছি। তোমার ও আমার হিস্যার টাকাই তাহার কাছে পাওনা। আর সকলের টাকা সে নিকাশ করিয়া দিয়াছে। তোমার আমার হিস্যার টাকা অন্য শরিক, অর্থাৎ বসন্ত ও তোমার বড় জ্যাঠাই লইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের কাছে আমি আদায় করিয়া তোমায় দিব।

তুমি সাবেক হিসাবের দরুণ আমার নিকট কিছু পাইবে। কণ্ঠমালার বাবত আমার কাছে কিছু পাইবে। আর তোমার অংশের ব্রহ্মোত্তরের টাকা পাইবে। মোট হিসাব করিয়া আগামী মাসে তোমার টাকা তোমাকে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করি, কেন না তুমি সেখানে কিছু দেনা করিয়াছ শুনিয়াছি।

তোমার সাবেক হিসাবের নকল আমার কাছে যাহা ছিল, খুঁজিয়া

পাইলাম না। তোমার কাছে নকল আছে, একটা নকল পাঠাইবে। হাণ্ডেঙ্ক টাকাগুলি তুলিয়া দিয়া মোট ঠিক করিয়া টাকা পাঠাইব।

বাঁকিপুরের সম্বন্ধ ঠিক আছে। যদি টাকার যোগাড় হয়, তবে তুমি বাড়ি আসিলে অনিলের বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। ইতি তাং ২০ ডিসেম্বর।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

এক শত টাকার নোট Insure করিয়া পাঠাইলাম। আজ রবিবার Insure হইবে না। কাল হইবে। ইতি তাং ৩ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

৪ঠা জানুয়ারি তোমাকে ১০০ টাকা পাঠাইয়াছি। তাহার পৌঁছ সম্বাদ, এ পর্যন্ত লেখ নাই। কিন্তু ডাকঘর হইতে রসিদ পাইয়াছি। তোমাদের সকলের পীড়া লিখিয়াছিলে। কিন্তু এ পর্যন্ত আরোগ্য সম্বাদ লেখ নাই।

নীলমণি মুড়াগাছা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তোমার জমির ২২০০ টাকার বেশী দর এ পর্যন্ত নাই। কিন্তু বেশী পাওয়া যাইতে পারিবে এমন ভরসা দিয়াছে। সে আবার শীঘ্র মুড়াগাছা যাইবে।

তোমার গত সনের বাবত মুড়াগাছায় ব্রহ্মোত্তরের টাকার যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে ২৩ টাকা যাহা তোমার বড় জ্যাঠাই বেশী লইয়াছেন, তাহা তাঁহার দেবত্রের টাকা হইতে কাটিয়া লইয়াছি। ব্রহ্মোত্তরের টাকা এ পর্যন্ত এ সন আদায় হয় নাই। এজন্য বসন্তের কাছে তোমার যে পাওনা, তাহা এ পর্যন্ত আদায় করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার সাবেক মজুত ১৬৷৷+২৩=৩৯৷৷, বাদ কিঞ্চিৎ খরচ, আমার কাছে মজুত রহিল। তুমি যদি আবশ্যক বিবেচনা কর, তবে ঐ টাকা তোমার নিকট পাঠাইতে পারি। সেখানকার দেনা রাখা উচিত নহে। ইতি তাং ৩ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

নীলমণি কি পাইবে না পাইবে, তাহা জানি না। তুমি আমার বড় সুসময় দেখিয়াছ। রথযাত্রা, ঠাকুর বাড়ি মেরামত, তোমার কন্যার বিবাহ, বাকি দেনার পরিশোধ (তোমার ছোট কাকা কিছু দিলেন না) ইত্যাদিতে ব্যতিব্যস্ত, এই সময়ে তুমি গচ্ছিত টাকার মত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছ। আমার অসাধ্য হইয়াছে। ইতি তাং ২৩ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

কাল যখন তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তখন আমার তেতলা ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। ঘর পুড়ে নাই, কিন্তু বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী পুড়িয়া ক্ষতি হইয়াছে। সেই সময়ে তোমার পত্র পাইয়া উত্তর দিয়াছিলাম। তাই অমন পত্র লিখিয়াছিলাম। নহিলে লিখিতাম না। টাকা কড়ি এক পয়সা হাতে নাই। পুঁজি ভাঙ্গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতেছি। ইতি তাং ২৪ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বিবাহের উদ্যোগ হ'ল দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের বিবাহের উদ্যোগ।]

কল্যাণবরেষু,

নীলমণি জমির ২৫০০ টাকার বেশী দর এক্ষণে বলে না। এত অল্প দরে আমি উহা বেচিতে সম্মত হই নাই। তোমার যে মত হয় লিখিবে।

নীলমণির এ সব জুয়াচুরি মাত্র। রামময় ভট্টাচার্য যাইতে চাহিয়াছিলেন। যে কারণে তাঁহাকে পাঠান হয় নাই পূর্বে লিখিয়াছি। এক্ষণে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

নীলমণি তোমার হিস্যার টাকা সম্বন্ধে বলে (১) ২২৷৷ টাকার চাউল ও ইলিস মাছ ইত্যাদি তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। (২) মোটে আর ২৮

টাকা সে আমাকে দিতে আসিয়াছিল। ঐ টাকা তোমার কাঁটালপাড়ার দেনা পরিশোধে ব্যয় করিতে হইবে, এজন্য উহা তাহারই কাছে আছে। (৩). আর ২৫ টাকা আমার উপর বরাত দিয়াছে। কিন্তু নীলমণি সকল শরিকের হিসাব নিকাশ করিয়া না দিলে আমি ঐ টাকা দিব না। তোমার দেনার জন্য আমি কাঁটালপাড়া যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।…

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার যে টাকা আমার কাছে আছে, তাহা money order করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছিলে, কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া পাঠাই নাই। কেন না হাতে হাতে তোমার অনেক খরচের প্রয়োজন আছে। এখন তাহা বুঝাইতেছি।

প্রথমত, ৺রাধাবল্লভের দেবত্র বিষয়ের তিন কিস্তি রোড সেস দাখিল করে নাই। ভুতো ও নীলমণি ষড়যন্ত্র করিয়া নীলাম করাইতেছে। ৭ই সেপ্টেম্বর নীলামের দিন স্থির আছে। ঘর হইতে টাকা দিয়া বিষয় রক্ষা করিতে হইবে।

তাহার পর তোমার কলিকাতার দেনা লইয়া বড় গোলযোগ। আমি ১লা আগষ্ট কর্মত্যাগ করিয়া জমি কিনিয়া লইব, এই কথা ছিল। আমি কর্ম-ত্যাগের দরখাস্ত দিয়াছিলাম। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন নাই। ১ নভেম্বর পর্যন্ত আমাকে থাকিতে হইবে। এজন্য সে বন্দোবস্ত মত কাজ হয় নাই। তাহাতে তাঁহারা নালিশের আরজি প্রস্তুত করিয়াছেন। আরজিতে দেখিলাম যে compound interest মাস মাস সুদ আসলগণ্য হইয়া তাহার উপর সুদ চড়িয়াছে। অতএব পাঁচ হাজার টাকা তাঁহাদের পাওনা হইয়াছে। তাঁহার আরজিতে বন্ধকী বিষয় বিক্রির ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রির এবং তৎসহ তোমার বেতন ক্রোকের প্রার্থনা করিয়াছে। আমি আরজি দাখিল করিতে দিই নাই। অনেক হাঁটাহাঁটি করিতেছি। কথা নিষ্পত্তি করিতে পারিব এমন ভরসা পাইয়াছি। তুমি চিন্তিত হইও না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

আজ বার দিনের উপর হইল তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে অনেক আবশ্যকীয় কথা লেখা আছে। তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইলে তোমার জমি বিক্রয়ের কোন বন্দোবস্ত হইতে পারিতেছে না। ইতি তাং ৮ ডিসেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

আমার পত্রের কোন উত্তর পাই নাই। আজ আবার প্রেমচাঁদ আঢ্যের পুত্র তাগিদ করিয়া গিয়াছে। বোধ করি নালিশ করিবে। ইতি তাং রবিবার ৫ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু,

ভুবন সাহাদিগকে লিখিয়াছি যে, টাকা আমি দিব। গত কাল money order করিয়া কুড়ি টাকা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

উহাদিগের টাকার জন্য ছোটবাবুকে লিখিয়াছি।

নীলমণি বরাত্তে ২৫ টাকা money order তোমাকে পাঠাইয়াছি।

তোমার কলিকাতার মহাজনেরা নালিশ রুজু করিতে ছিল—আমি আপাততঃ কিছু সময় লইয়াছি। জমির দরের জন্য রামময় ভট্টাচার্যকে পাঁচ টাকা খরচ দিয়া মুড়াগাছায় পাঠাইয়াছি।

আর যাহা কর্তব্য লিখিলে করিব। জমি বিক্রয়ের উপায় না হইলে তোমার কন্যার সম্বন্ধ করা বৃথা। এজন্য কিছু করি নাই। কৃষ্ণধনকে তাহার ভাইয়ের জন্য লিখিতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, তাহা লেখা হইয়াছে কিনা তাহা লিখিবে। ইতি তাং ১২ জুলাই

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

আমার শরীর সুস্থ হইয়াছে এবং আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নীলমণি জমি বিক্রয় করিবার কোন চেষ্টা করে নাই, টাকা দেয় নাই বা হিসাব দেয় নাই।...যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু...আমি কয় মাস পীড়ায় লণ্ডভণ্ড হওয়ায় কোন বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি নাই। এবং তাঁহাকে অগ্রিম খরচপত্র দিতে হইবে, তাহাও দিতে পারি নাই।

সম্প্রতি পূজার দালানের পাশের বৈঠকখানার দোতলা না নামাইলে দালান সমেত পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। উহা নামাইয়া রাখার...

[জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠিটির '...' অংশগুলি ছিন্ন। এই অবস্থাতেই চিঠিটি পাওয়া গেছে। তাই ঐ ছিন্ন অংশগুলিতে কি লেখা ছিল, তা আর জানা গেল না।

জ্যোতিশের জমি বিক্রি করার ব্যাপারে নীলমণির অনাগ্রহের প্রধান হেতু ছিল এই—নীলমণি জ্যোতিশের ঐ ১০০ বিঘা সম্পত্তিটিরও ইজারাদার ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন—অন্য লোক এই জমি কিনে নিলে, তখন সেই ব্যক্তি তাঁকে আর ইজারা নাও দিতে পারে। ফলে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হবে।

এই চিঠিতে 'পূজার দালানের পাশের বৈঠকখানার দোতলা'র যে কথা আছে, তার একটু ইতিহাস আছে। এখন ঐ পূজার দালান ও তার পাশের বৈঠকখানার কথা বলছি—

এই পূজার দালান হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দুর্গাপূজার দালান। আগে এই ঠাকুর দালানেই বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহ দেবতা রাধাবল্লভ থাকতেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র এর পাশেই আর একটি বড় মন্দির তৈরি করিয়ে দিলে রাধাবল্লভকে সেই মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূজার দালানের পিছনের অংশে টানা দেয়াল থাকলেও মাঝে এবং সামনে দু পাশের দেয়াল বাদে ৪টি করে বড় থামে খিলান দিয়ে ৫টি করে বড় বড় ফোকর বা ফাঁকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খিলানের জন্য এই এক একটি থামের দূরত্ব ছিল ৩।৪ হাত। এইভাবে পূজার

দালানটিকে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা রেখেই দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পিছনের অংশটা সামনের অংশের চেয়ে বড় ছিল এবং সেইখানেই পূজা হত।

এ ছাড়াও উঠান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছিল পূজার দালানের কিছুটা ফাঁকা রক বা দোর।

বাড়ির এই পূজার দালান বা দুর্গা দালানে দুর্গা পূজা দেখেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ২৪ পরগণা জেলার বারাসতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'আমার দুর্গোৎসব' লেখার অল্পদিন পরেই তিনি ঐ রচনার ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রদের এই পূজার দালানটি ছিল দক্ষিণ মুখো। দালানের সামনেই অনেকটা ফাঁকা উঠান। উঠানটা আজও ফাঁকা পড়ে আছে। উঠানের পূর্বদিকে পশ্চিম মুখো কয়েকটা ঘরে ছিল বঙ্গদর্শন প্রেস ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার অফিস। উঠানের পশ্চিম দিকে পূর্বমুখো ঘরগুলো ছিল বাড়ির চাকর-বাকরদের থাকার ঘর। উঠানের দক্ষিণে বঙ্কিম-চন্দ্রদের দুটি বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানা দুটি আজ ও কোন রকমে টিকে আছে। দুই বৈঠকখানার মাঝ দিয়ে ভিতরে প্রবেশের বিস্তৃত পথ। প্রবেশ পথের সেই কাঠের বিরাট দরজাটিও এখনও আছে।

পূর্ব-পশ্চিমে বেশ অনেকটাই লম্বা পূজার দালানের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত দুটা ছিল দুতলা। মাঝখানে বিস্তৃত পূজার জায়গাটার ঠিক উপরে ছাদে কোন ঘর ছিল না।

পূজার দালানের পশ্চিম প্রান্তে দালানের উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে নীচে দুটি এবং উপরে দুটি করে ঘর ছিল। এই ঘরগুলির দরজা ছিল সংলগ্ন বাড়ির অন্দর মহলের দিকে অর্থাৎ পূজার দালানের দিকে নয়। নীচের ঘর দুটিতে রথের ও অন্যান্য পূজার উপকরণ থাকত। আর উপরের ঘর দুটি ছিল যাদবচন্দ্রদের স্বামী-স্ত্রীর।

পূজার দালানের পূর্ব প্রান্তে একতলায় দালানের উত্তর দক্ষিণ জুড়ে বেশ একটা বড় ঘর, আর এর উপরেও ঐ মাপেরই আর একটি ঘর ছিল। একতলার ঘরটি ছিল পশ্চিম মুখো অর্থাৎ দরজা ছিল দালানের দিকে। এই ঘরে যাদবচন্দ্র নিজে বসতেন। এইটিই ছিল

তাঁর নিজের বৈঠকখানা। ঘরের যে জায়গাটায় তিনি তক্তপোষের উপর বসতেন, তার সামনে পূর্ব দিকের দেয়ালে ছিল একটা বিরাট জানালা। জানালা খোলা থাকত এবং যাদবচন্দ্র এইখানে বসে সব সময়েই গৃহদেবতা রাধাবল্লভকে দেখতেন। এখানে বসে পাশের মন্দিরে অবস্থিত রাধাবল্লভকে ভালভাবে দেখা যেতো।

যাদবচন্দ্রের বৈঠকখানার উপরে যে বড় ঘরটি ছিল, তাতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতারা পড়াশুনা করতেন। ঐ ঘরে বসে পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন।

দুতলার ঐ ঘরে ওঠার সিঁড়ি ছিল এক তলার ঘরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে। আর ঘরটি দক্ষিণ মুখো হলেও ছাদের দিকে পশ্চিমে আর একটা দরজা ছিল। কয়েকটা জানালা তো ছিলই।

ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় হলেও দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ পড়ার ঘরে ওঠার সিঁড়ি, যাদবচন্দ্রের রাধাবল্লভ দর্শনের সেই খোলা প্রকাণ্ড জানালা সহ ভাঙ্গা পূজার দালান, বঙ্গদর্শনের প্রেস ও অফিস ঘর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সবই ছিল। আজ (১৯৭৮ খ্রীঃ) এ সব আর কিছুই নেই। শুধু পূজার দালানে ওঠার জন্য উঠানের সিঁড়ি এবং ঐ দালানের পশ্চিম দিকের একটুখানি ভাঙ্গা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। পূজার দালানটি সমভূমি উঁচু মাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে। উঠানের পশ্চিম দিকে ভৃত্যদের ঘরগুলোর ভাঙ্গা দেয়ালও শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

সেযুগে সিমেণ্ট ছিল না। তাই তখনকার লোকে যাঁরা পাকা বাড়ি করতেন, তাঁদের প্রায় সকলেই দেয়াল গাঁথাতেন কাদা দিয়ে। ফলে এই কাদায় গাঁথা বাড়ি তেমন বেশী দিন থাকত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথামত পূজার দালান রক্ষার জন্যই তখন তাঁর ঐ দুতলার পড়ার ঘর নামিয়ে ফেলা হয়েছিল।]

কল্যাণবরেষু,

মহাজনদিগের নিকট আরও ছয় মাস সময় লইবার চেষ্টা করিতেছি। কেননা জমি উত্তম মূল্যে বিক্রয় ভিন্ন অনিলের বিবাহের কোন উপায় দেখি নাই। সম্বন্ধ সহজ হইতে পারিবে, কেবল টাকার অভাব।

তুমি আর যে দুই খণ্ড জমি বিক্রয়ের জন্য বলিয়াছ, তাহার মূল্য আমি অবগত নহি। আঁচ কিরূপ লিখিবে।

ঠাকুর বাগানের কাঁঠাল গাছ আশু ঘেরিয়া লইয়াছে সত্য। তজ্জন্য গত পূজার সময়ে সারদাকে আনাইয়াছিলাম। তাহার দলিল পত্র বাহির করিয়া, তাহাদের সম্মুখে ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া জমি মাপ করান হইয়াছিল। ঐ দলিল আমার ৺পিতৃঠাকুরের ও আরও শরিকানের দস্তখতি; আমি তাহাতে সাক্ষী। মাপে ৺গোষ্ঠ যাত্রার বেদী ও তোমার কাঁঠালগাছ সারদার অংশে পড়িল। তাহার পর আর আমি কি কথা কহিব। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যখন আসিবে পুনর্বার মাপ করাইও।

উহা ৺কর্তা মহাশয়ের নিজ খরিদ, এমন কিছু দলিল পত্র বা অন্ত কোন প্রমাণ থাকে, তবে আমাকে লিখিও, আমি আর একবার চেষ্টা দেখিব। আর এ বিষয়ে তুমি সারদা ও কীর্তিকে পত্র লিখিও। এক্ষণে কাঁটালপাড়ায় উভয় বংশে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমি কোন বিবাদে থাকি না ও থাকিব না। দাদাদিগের সঙ্গে বিবাদের ভয়ে আমি কাঁটালপাড়ার ভিটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আশু কীর্তির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা নাই।

...ঘর কোন জমিতে ছিল, তাহা আমি জানি না। তাহার ঘর আমি কখন দেখি নাই। আমি ১২ বৎসর কাঁটালপাড়া পরিত্যাগ করিয়াছি। ফলে তোমার পিতা যে জমি সারদাকে কোবলা করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন উহারা আর কোন্ জমি দখল করিয়াছে, সরে জমিনে গিয়া আমি দেখিতে পাই নাই। তবে দিদি যে কিছু বাড়াইয়া লিখিবেন, তাহার অনেক কারণ আছে।

চাউলের মূল্য তোমার নিকটেই যাইবে। কিন্তু চাউলের মূল্য এত সত্বর দিবার কথা ছিল না। যাই হোক, তোমার যখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, তখন আমার হাতে টাকা হইলেই পাঠাইব।

তুমি লিখিয়াছ, খুজরা দেনা তোমার যাহা যাহা আছে, তাহার একটা ফর্দ পাঠাইয়াছ, আমি তাহা কখন পাই নাই।

শশীপাল তোমার পিতার handnote বাবত তোমার নামে নালিশ করিবে বলিয়া গিয়াছে। আমি বলিয়া দিয়াছি যে তুমি উত্তরাধিকারী সূত্রে কিছু পাও নাই। এজন্য তুমি দায়িক নও। তথাপি তাহারা নালিশ করিয়া ডিক্রি করিয়া রাখিবে। তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। ইতি তাং ২৯ মার্চ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র শশী পালকে যে ঐ সময় বলেছিলেন, জ্যোতিশ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার কিছু পায় নি, তার কারণ, জ্যোতিশ পিতার পরিত্যক্ত যে সামান্য জমি পেয়েছিলেন, সে জমি বিক্রি করে রাম ফক্কড় প্রভৃতির দেনা মেটাতে আগেই শেষ করেছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছিলাম। এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি, কিন্তু চাকরি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কর্মত্যাগ করিয়াছি।

তোমার মহাজনদিগের সঙ্গে মিটাইতে পারিলাম। আমি ২৫০০ টাকার বেশী কোন মতেই দিতে পারিব না। তাঁহারা ২৯০০ টাকার কম মিটাইবেন না। বলাইবাবুর পত্র তোমার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। আমি পুনশ্চ বলাইবাবুকে লিখিয়াছি, নিজের সাধ্য নাই যে তাঁহার কাছে যাই। ফলে আর একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব। ইতি তাং ২২ সেপ্টেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার মহাজনেরা ২৫০০ টাকায় অস্বীকার হওয়ায় তোমার যে টাকা আছে তাহা লইয়া সর্বসমেত ২৬০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা সর্বসমেত ২৯০০ টাকার কম লইবেন না। বন্ধ খুলিলেই (১৭ই নবেম্বর) নালিশ করিবেন।

আমিও আর মুড়াগাছার বিষয় রাখিয়া ২৫০০ টাকা দিতে রাজি নহি। কেন না, ঐ বিষয় হইতে আর কিছু পাওয়া যায় না। গোমস্তা নাই, আদায় তহশীল হয় না। নীলমণি বা আর কেহ স্বীকৃত হইল না বা হইবার রকম দেখি না। ৺রাধাবল্লভের বিষয় এইবার নীলাম হইবে। গতবার আমি ঘর হইতে ৫০ টাকা রোডসেস দিয়া বিষয় রাখিয়াছিলাম। কিন্তু বার বার পারি না। অনেক কিস্তি রোডসেস বাকি পড়িয়াছে। ব্রহ্মত্রের রোডসেস নাই। কিন্তু আদায় তহশীলও নাই, ও হইবারও সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি ঐ বিষয় লইব না।

আমি তোমার মহাজনদিগকে লিখিয়াছি যে, তুমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদিগের দিতে রাজি আছ, নালিশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি ঐরূপ আমাকে পূর্বে লিখিয়াছিলে। সেইজন্য লিখিয়াছি। বোধ করি তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন না। কেন না বেতন ক্রোকের তাঁহাদের ইচ্ছা আছে। যদি সম্মত হয়েন ভালই, না হয়েন তবে তাঁহারা খরচা পাইবেন না। এবং আমরা আদালতে শিডিউল করিয়া দিয়া বেতনও ক্রোক করিতে দিব না। তবে আপাততঃ বাড়িটা বেহাত হইবে। কিন্তু তাহা আবার পাইতে পারিবে। বাড়ি আমার অসম্মতিতে আর কেহ লইবে না।

তোমার কন্যার একটি সম্বন্ধ শ্রীধর ঠাকুর উপস্থিত করিয়াছেন। আমার মত আছে, কিন্তু বিবাহের ব্যয় কোথা হইতে নির্বাহ হইবে, তাহা স্থির না করিয়া সম্বন্ধ করিয়া কি করিব। আমি পেনসন লইয়াছি। আমার আর কোন সাধ্য নাই। জমি-জমা বেচিয়া বিবাহ দিলে হইতে পারে, কিন্তু তুমি বাড়ি আসিবে শুনিলাম। যদি তাহা হয়, তবে তুমি আসিয়াই যাহা কর্তব্য হয় করিবে। ইতি তাং ১৩ নবেম্বর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সে সম্পত্তির এক্ষণে আর কোন মূল্য নাই, তাহার জন্য আমি ২৫০০ টাকা দিতে পারিব না। আমাকে জ্ঞান দিবার জন্য আধ দিস্তা কাগজ লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কর্তব্য বোধ না থাকিলে তোমরা এতদিনে কোথা থাকিতে তাহা বলা যায় না। তোমাদিগের নিকট হিতোপদেশ লইয়া আমার সে কর্তব্য জ্ঞান জন্মে নাই।

বলাইবাবুর পত্রখানি সেদিন ভুলক্রমে পাঠান হয় নাই, আজ পাঠাইলাম। ইতি তাং ৩০ কার্ত্তিক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যোতিশের জমি বিক্রয় হয় না, অথচ এদিকে তাঁর পাওনাদারদের অনবরত তাগাদা, নালিশ, এমন কি বেতন ক্রোকেরও হুমকি। এই অবস্থা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জ্যোতিশের জমি কিনে নিয়ে, সেই টাকা দিয়ে জ্যোতিশের ঋণ শোধ করে দেবেন ভেবেছিলেন। না হলে শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের জমি কেনার প্রয়োজন আদৌ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র জমি কিনবেন ভেবেও যখন দেখলেন, গোমস্তা নেই, আদায় তহশীল নেই, তখন আর নিজে কিনতে চাইলেন না।
বঙ্কিমচন্দ্র জমি কিনবেন ভেবেও শেষে কিনতে অরাজি হওয়ায়, সম্ভবত জ্যোতিশ তখন কাকাকে ঐ নিয়ে কিছু লিখেছিলেন।
জ্যোতিশের ঐরূপ কোন একটা চিঠি পেয়েই বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশের উপর কিছুটা রাগবশতই এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।
এই চিঠি লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্র তখন এও বুঝেছিলেন যে, অত্যধিক দেনার জ্বালাতেই জ্যোতিশ ঐরূপ লিখেছে। তাই তিনি কিছু মনে না করেই, আগের মত জ্যোতিশের জমি বিক্রির চেষ্টা করেন। এ ধরণের একটি চিঠি এর পরেই উদ্ধৃত করলাম।]

কল্যাণবরেষু,

তোমার জমির খরিদ্দার টাকা আনিতে গিয়াছে। আর ফিরে নাই। জমি কিনিবে এখন বোধ হয়।

তোমার ব্রহ্মত্র বাবত ৪০ টাকা নীলমণি আমায় কল্য দিয়াছে। কাহাকে দিব লিখিবে। ইতি তাং ৯ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যোতিশের জমি বিক্রি করে, তার সঙ্গে নিজেও কিছু দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত করেছিলেন।]

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক চিঠিতে সারদা, কীর্তি, আশু ও অঘোরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত এঁদের তেমন বিস্তৃত পরিচয় দিই নি। অথচ এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখন বেশ রীতিমতই খ্যাতিমান ছিলেন। এখন এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহ শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়রা দুই ভাই ছিলেন। শিবনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। এই জয়নারায়ণের এক পৌত্র ছিলেন সারদা। সেই দিক থেকে সারদা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। সারদাও একজন নামকরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

সারদারা ছিলেন দুই ভাই। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম ছিল নীলমণি। এঁদের পিতা অর্থাৎ জয়নারায়ণের পুত্রের নাম ছিল নকুল।

নীলমণির চার পুত্র—অবিনাশ, কীর্তি, হরিশ ও আশু। সারদা যখন ভাগলপুরে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলেন, তখন প্রায় সমবয়সী (বয়সে অল্প কিছু ছোট) ভ্রাতুষ্পুত্র অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরে গিয়ে ছিলেন।

সারদার মা অর্থাৎ অবিনাশের ঠাকুরমা অবিনাশকে বলেছিলেন—তোর কাকা অতদূরে একা যাচ্ছে, তুইও সঙ্গে যা।

তখন বিহার এবং উড়িষ্যাও নিয়ে ছিল বাংলা দেশ। পরে এই দুই প্রদেশ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

সারদা ভাগলপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করেন। ভাইপো অবিনাশ বাসায় থাকেন এবং ঐ ভাগলপুরেই চাকরিও খোঁজেন। অল্প দিন পরেই কাকার চেষ্টায় অবিনাশ ভাগলপুরের কালেকটারি অফিসে একটা কেরাণীর চাকরি পেলেন।

সারদার বদলির চাকরি। দু-এক বছর পরে তিনি ভাগলপুর থেকে বিহারেরই অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেন। অবিনাশ একা থাকেন। এই সময় তিনি মেজ ভাই কীর্তিকে কাছে নিয়ে এলেন। তাঁকে এনে পাটনা কলেজে পড়িয়ে, সেখান থেকে ল পাস করিয়ে আবার ভাগলপুরে নিয়ে এলেন।

কীর্তি এসে ভাগলপুর কোর্টে ওকালতি শুরু করলেন। দাদার প্রভাবে এবং নিজের প্রতিভায় তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ভাগলপুর কোর্টের অন্যতম সেরা উকিল হয়ে উঠলেন। সে সময় ভাগলপুর কোর্টে সিভিলে রাজা

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তিনিকালে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—তিন সর্ব প্রধান উকিল ছিলেন।

রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশ ছিলেন কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। শরৎচন্দ্র তখন ভাগলপুরে মামার বাড়িতে থাকতেন।

কীর্তির কাকা সারদা রাজা শিবচন্দ্রের ছোট বোনকে বিয়ে করে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সারদার পুত্র পঙ্কজ, তিনিও বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

কীর্তি ওকালতি করে এত পয়সা উপার্জন করে ছিলেন যে, ভাগলপুর শহরের মাঝখানে ঘড়ি ঘরের সামনেই ১৫ বিঘা জমির উপর একটা বিরাট বাড়ি করে ছিলেন। বাড়ির সঙ্গে ছিল ফল ফুলের বাগান। মরার সময় কীর্তি জমিদারী, বাড়ি ও নগদে প্রায় ১৪ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়ে ছিলেন।

ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলার পাশেই মসাকচক পল্লীতে কীর্তিবাবুর নামে একটা রাস্তা রয়েছে। তাঁর বাড়ির নাম শুধু 'কীর্তিধাম' বললেই আজও ভাগলপুরের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই সে বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

কীর্তির ছোটভাই আশু কাঁটালপাড়ার বাড়িতে থাকতেন। দেশের জমি-জায়গা ও জমিদারী দেখাশুনা করতেন। আর কলকাতায় আলিপুর ট্রেজারিতে ট্রেজারারের চাকরি করতেন।

কীর্তির তিন ভগ্নীপতির মধ্যে ছোট ভগ্নীপতির নাম ছিল অঘোর মুখোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে। কীর্তির দাদা অবিনাশ অঘোরকে ভাগলপুরে এনে নিজের কাছে ভাগলপুর কালেকটারিতে চাকরি করে দিয়েছিলেন। এঁর বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তার উপর চাকরি করে এবং কীর্তির সহায়তায় ভাগলপুরে কীর্তিবাবুর বাড়ির কাছেই একটা ভাল বাড়ি করেছিলেন। এই বাড়ির নাম এখন অঘোর ভবন। অঘোরবাবুর বংশধরেরা সেখানে থাকেন। তাঁরা বিবিধ ব্যবসা করে এখন ভাগলপুরে প্রায় ৩০।৪০ খানা বাড়ি করেছেন।

সারদা, কীর্তি, আশু প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি অবিনাশের পৌত্র কাঁটালপাড়াবাসী সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতাবাসী কীর্তির পৌত্র অজয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বাকি তথ্য সংগ্রহ করেছি, ভাগলপুরে গিয়ে সেখান থেকে।

প্রিয়তমেষু,

কীর্তি তোমার নামে কর্জর টাকা বাবত নালিশ করিবেন আমাকে লিখিয়াছেন। যাহা কর্তব্য হয় করিবে। ইতি তাং ২ শ্রাবণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্র শেষ বয়সে কীর্তি এবং কীর্তির ভগ্নীপতি অঘোর মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিছু কিছু টাকা কর্জ করেছিলেন। কিন্তু শোধ করে যেতে পারেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কীর্তি এই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে ছিলেন। চিঠিটি এই—

সহায়

প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং,

গত বিজয়া দশমীর দিন আমার ছোট ভগ্নীপতি শ্রীযুত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কাঁটালপাড়ায় গিয়াছিলেন। আশুর এবং কৃষ্ণর প্রমুখাৎ তিনি শুনিয়াছেন যে, তমস্যুকের টাকার বাবত জ্যোতিশ বলিয়াছেন যে, তামাদি হইয়া গিয়াছে, সে টাকা দিতে তিনি বাধ্য নহে। যদি কখন সুবিধা মত দিতে পারেন, তবে দিবেন, নচেৎ নহে। ইহা শুনিয়া তিনি নালিশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

দাবি এ পর্যন্ত তামাদি হয় নাই। কিন্তু আগামী জানুয়ারি মাসে তামাদি হইবে।

তামাদি হইবার পূর্বে তিনি ১০ টাকা সুদ দিয়া ছিলেন এবং তৎপরে সুদ দেওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে নিজ দেনা স্বীকার করিয়া দুইখানি পত্র তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে তামাদি হইতে পারে না।

কৃষ্ণ অঘোরকে ইহাও বলিয়াছেন যে, জ্যোতিশ Messrs Bonerjee & Ghosh এর নিকট Opinion লইয়াছেন। সেই কারণে অঘোর অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছেন। জ্যোতিশকে দুইখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন, কিন্তু উত্তর পায়েন নাই।

মহাশয় ইতিপূর্বে কবালা লিখিয়া পরিশোধের কথা লিখিয়া ছিলেন। যদি তাহা হয় তবে এই মাসের মধ্যেই কবালা তামিল হওয়া উচিৎ। নচেৎ এই মাসের শেষ ভাগে নালিশ হইবার সম্ভাবনা।

আমি অদ্য প্রাতে ভাগলপুরে আসিয়াছি। এখানকার সমাচার সমস্ত মঙ্গল। ইতি তারিখ ৭ অক্টোবর

সেবক শ্রীকীর্তিচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কীর্তির চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন জ্যোতিশকে যে চিঠিটি লিখে ছিলেন, এর পরেই সেটি উদ্ধৃত করছি—]

কল্যাণবরেষু,

কীর্তির এই পত্র আমি তোমার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। ২১০ টাকায় তিনি ঐ জমি লইতে প্রস্তুত আছেন। ইতি তাং রবিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র

পুঃ। আমি কাল বালেশ্বর যাইব। ইহার উত্তর ছোটবাবুকে লিখিও।

[বঙ্কিমচন্দ্র পরে জ্যোতিশের কাঁটালপাড়ার ঐ এক খণ্ড জমি কীর্তিকে দিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করে দিয়েছিলেন। এবং জ্যোতিশের অন্য জমি বেচে অঘোর মুখোপাধ্যায়ের দেনাও শোধ করেছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

গোঁদলপাড়ার ঔষধ আগামী পরশু আশু ডাকে পাঠাইয়া দিবে। আর আর ব্যবস্থা সে লিখিয়া দিবে। ২১ দিনের দিন ঔষধ খাওয়াইবে। আর আর সংবাদ কাল লিখিব। ইতি তাং ১৮ ফিব্রুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[গোঁদলপাড়া কাঁটালপাড়ার অদূরেই চন্দননগরের পাশে একটা শহর। আশু এখান থেকে ওষুধ এনে জ্যোতিশকে তাঁর কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।]

কল্যাণবরেষু,

আশুর দ্বারা কোন বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য বলি নাই। যাহা বক্তব্য কীর্তিকে লিখিবে।

তোমার খুচরা দেনার একটা ফর্দ দিবে। নীলমণি টাকা দিলে অগ্রে তাহাই পরিশোধ করিব। ইতি তাং ২৮ ফিব্রুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সমস্ত গোল মিটাইয়া দিব, চিন্তা নাই।

গোল মিটাইয়া দিয়া পত্র লিখিব। ইতি তাং ৯ জুলাই

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত গোল মিটিয়ে দিয়ে জ্যোতিশকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন।]

প্রিয়তমেষু,

জাল প্রতাপচাঁদ ফুরাইয়াছে। তুমি খরচ পত্র করিয়া নূতন Edition ছাপাইতে প্রস্তুত আছে কি?

বোধ করি তাহা পারিবে না। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নিজ ব্যয়ে এক Edition (1000 copies) ছাপিয়া লইতে চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদিগকে কেবল ৬০টাকা মুনাফা দিতে চাহেন। তাহাতে রাজি হইবে কিনা লিখিবে। ইতি তাং ৮ জুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ। পূর্ব পত্রের কোন উত্তর পাই নাই। সুতরাং বোধ করি দালান খানা এই বর্ষায় পড়িয়া যাইবে। ইতি—

জ্যোতিশের অংশের বাড়ি পড়ে গেলে তখন বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশের পরিবারের থাকার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন, পরের চিঠিগুলিতে তার উল্লেখ রয়েছে। সেই চিঠিগুলি এই—

কল্যাণবরেষু,

বাদলের জন্য আজিও যাইতে পারিলাম না। পাঁড়েকে পাঠাইলাম। তোমাকে আমার ঘর একটা খুলিয়া দিয়া আসিবে। দুইটা অর্থাৎ ছোটবাবু যে ঘর দিয়াছেন ও আমি যে ঘর দিলাম, এই দুইটা ঘরে তোমার আপাততঃ চলিতে পারিবে। পশ্চাৎ আমি যাইতেছি। ইতি তাং শুক্রবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাক গলির পথে হইতে পারিবে। তোমার মার রান্না বারেণ্ডায় হইতে পারিবে। নলিন বলিল যে, তোমাদের অন্দরের পাইখানা ব্যবহার যোগ্য আছে।

কল্যাণবরেষু,

তোমার যে ঘর ব্যবহার যোগ্য আছে, তাহাতে যে কেতাবপত্র আছে, তাহা সরাইয়া সদরের বৈঠকখানায় রাখিয়া সে ঘর ব্যবহার করিতে পার।

পাইখানার বন্দোবস্ত আমি না গেলে হইতে পারে না। যেরূপ বাদল ও শীত, তাহাতে আমার যাইবার সাধ্য নাই। আমার যাতায়াতে যে খরচ পড়িবে, তাহাতে পাইখানাটা মেরামত হইতে পারিবে। একদিনে পাইখানা মেরামত হইতে পারে।

যাই হোক, আমার এমন শরীর নয়, আমি এ দুর্যোগে যাইতে পারি। নলিন যাইবে না। ইতি তাং শনিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

নলিন কেবল ৺কর্তা মহাশয়ের ঘর খুলিয়া দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু ছোটবাবু যে নূতন তিনটা ঘর তৈয়ার করিয়াছেন (তুমি তাহা দেখ নাই)

তাহা খোলাই আছে। তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহার জানালার কপাট হয় নাই। কিন্তু এখন আর শীত থাকিবে না। আপাততঃ দরমা দিলেই চলিবে। তুমি বাড়িতে চলিয়া আইস। যদি ঐ চারিটা ঘরে তোমার অচল হয়, আমার ঘর খুলিয়া দিব।

তুমি শীঘ্র আসিবে বলিয়া তোমার ছুটির হুকুম তোমার কাছে পাঠাই নাই। ইতি—তাং রবিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

আমার পুনশ্চ রক্তস্রাবের রোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি কাঁটালপাড়ায় যাইতে পারি নাই। ছোটবাবু বলিয়াছেন, তাঁহার অন্দর মহলের নীচে তলার পাইখানা তুমি ব্যবহার করিতে পার। আমি তাহা খোলাইয়া দিতে বলিয়াছি। ইতি তাং ১৮ ফাল্গুন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু,

যদি আজ বৈকালে আকাশ পরিষ্কার হয়, তবে আমি বৈকালে গিয়া তোমাকে আমার নিজের ঘর খুলিয়া দিব। যদি আকাশ পরিষ্কার না হয়, তবে কাল যাইব। আমি যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ সদর বাটীতে অন্দর মহল করিয়া আমার বৈঠকখানায় সদর করিতে পার। বৈঠকখানার চাবি কৃষ্ণের কাছে আছে। ইতি তাং বৃহস্পতিবার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঁটালপাড়ার বাড়ি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, পূর্বে লিখিয়াছি। তোমার ছুটি মঞ্জুরির হুকুম আমার কাছে আসিয়াছে।

B. C. Chatterji

[জ্যোতিশ এই সময় (১৮৯৩ এর ফেব্রুয়ারি মাসে) বীরভূম জেলার সিউড়ির পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। কারণ, পোষ্ট কার্ডে ঠিকানা ছিল এই—

Babu Jatish chandra Chatterji
Inspector of Police
(Suree) Birbhum]

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশের ভালমন্দ সব খবরই যে রাখতেন, তার আর একটা পরিচয় পাওয়া যায় নীচের এই চিঠিটি থেকে—

প্রিয়বরেষু,

আজিকার গেজেটে দেখিলাম তুমি Municipal Commissioner নিযুক্ত হইয়াছ। ইতি তারিখ ৭ জানুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা দুটি বিষয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—(১) বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি প্রয়োজন হলে তীব্র তিরস্কারও করতেন। এমন কি 'নরাধম' ইত্যাদি বলে গালি দিতেও কসুর করতেন না।

(২) সঞ্জীবচন্দ্র একমাত্র পুত্র জ্যোতিশকে শাসনে রাখতে অক্ষম ছিলেন বলেই হোক, বা জ্যোতিশের প্রায় বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপর অভিভাবকত্ব করে আসছিলেন বলেই হোক্, সঞ্জীবচন্দ্র পিতা হয়েও জ্যোতিশের প্রতি তেমন নজর না দিয়ে অনেকটা উদাসীন বা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এই উদাসীনতার জন্যই বোধ করি, জ্যোতিশের চাকরির ব্যাপারে একবার এক সাহেবের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের দেখা করার কথা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশকে লিখেছিলেন—'আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে চান না।'

যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্রের কড়া শাসনে তাঁরই ভাষায় এক সময়ের 'পিতৃদ্রোহী'

ও মাতার অসম্মানকারী 'নরাধম' জ্যোতিশ শেষ পর্যন্ত কিরূপ গুণী ও ভদ্র মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটা লেখা উদ্ধৃত করে জ্যোতিশের প্রসঙ্গ শেষ করছি। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত 'জন্মভূমি' (২৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) পত্রিকায়। ঐ 'জ্যোতিশচন্দ্র' প্রবন্ধের লেখক ছিলেন কলকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজের (স্কটিশ চার্চ কলেজের তখন ঐ নাম ছিল) অধ্যাপক কালিপদ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিশ, নিজেও তখন জীবিত ছিলেন। লেখাটির কিয়দংশ এই—

'জীবিতের জীবন-চরিত লেখা নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও, আজ আমরা জীবিত জ্যোতিশচন্দ্রের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। জ্যোতিশচন্দ্র কে? ইনি সশরীরে বর্তমান একজন মহাপুরুষ, কাঁটালপাড়া-নিবাসী স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র; 'বন্দেমাতরম্' এই ঋকের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু গণিত শাস্ত্রের কঠোরতা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না।...

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও, অবিলম্বে পুলিশ বিভাগে ইন্‌সপেকটরের পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং স্বকীয় প্রতিভা বলে District Superintendent of Police এর কার্য করিতে করিতে দুর্ভাগ্যবশত রোগগ্রস্ত হইয়া বিদায় বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তদবধি তাঁহার কর্ম জীবন শেষ হইল। আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, জ্যোতিশচন্দ্র পুলিশ বিভাগে কর্ম করিয়াও স্বীয় হস্ত নির্মল রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের অঙ্ক পর্যন্তও স্পর্শ করে নাই।...

একাধারে বহুগুণের সন্নিবেশ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।...আমাদের জ্যোতিশ-চন্দ্রের গুণগ্রাম এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তাই আজ সাধারণের জ্ঞান-গোচর করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।...

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-মন্দিরে আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল, তখন তাঁহার হ্যাটকোট-ধারী মূর্তি দেখিয়া মনে হইল, বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষক-রূপে এ কোন্ জীব আবির্ভূত হইল? শুনিলাম, ইনি পুলিশের কর্মচারী ছিলেন, তখন বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়াও তাঁহাতে পুলিশ-পারুষ্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, কেবল অবিমিশ্র করুণা ও পূর্ণ

সরলতা। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইলে বুঝিলাম, জ্যোতিশচন্দ্র একটি আদর্শ পুরুষ, সৌজন্যের জলনিধি, অনন্তজ্ঞানের আধার।

জ্যোতিশচন্দ্র বৈষ্ণব।...জ্যোতিশচন্দ্র শাক্ত ও তান্ত্রিক।...জ্যোতিশচন্দ্র স্মার্ত।...জ্যোতিশচন্দ্র দার্শনিক।...জ্যোতিশচন্দ্র জ্যোতিষী।...জ্যোতিশচন্দ্র আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক।...

জ্যোতিশচন্দ্র একজন সুকণ্ঠগায়ক। 'বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়ক কে?' তদুত্তরে 'নায়ক'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় পত্রে জ্যোতিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি একবার তদীয় সুধাকণ্ঠ নির্গলিত সুধাময় হরিনাম শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি একবার তাঁহার ভাববিগলিত প্রেমাশ্রু দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, এরূপ ভাবুক—এরূপ ভক্ত—এরূপ গায়ক এ বঙ্গে নিতান্তই দুর্লভ।

এই জ্যোতিশচন্দ্র সম্বন্ধে শুধু আমি নহি, অন্য লোকেও যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Selection from Bengali literature গ্রন্থে জ্যোতিশচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি আছে।...

অমৃতবাজার স্বয়ং বলিয়াছেন—'He is a well-read man specially in spiritual literature and a famous singer of vaisnaba padavali.'

এখন জ্যোতিশের ঐ গায়ক হওয়া সম্বন্ধে একটা কথা—

নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন। একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি।'

জ্যোতিশ কাকার ঐ হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শিখতেন। বাড়িতে কাকার আগ্রহে গানের, বিশেষ করে কীর্তনগানের প্রতি আকর্ষণ থাকায়, জ্যোতিশ কাকার সহায়তায় ও নিজের সাধনায় অত বড় গায়ক হতে পেরে ছিলেন।

[রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা]

প্রিয়তমেষু,

প্রচার সম্বন্ধে আমার মত এই—

(১) ...প্রচার ভাল চলিয়া উঠিবে কিনা...

তুমি...লেখকের নাম করিয়াছ, কিন্তু তাঁহারা লিখিবেন কি ?

যেরূপ matter এখন বাহির হইতেছে...পাঁচ ফরমার অপেক্ষা তিন ফরমা ভাল।

(২) আমার বিবেচনায় তিন ফরমা প্রচার এক...মূল্য তিন হাজার গ্রাহক। ইহা হইলে প্রচার...essful হয়। প্রবন্ধ ও...তবে তিন হাজার গ্রাহক হইবে না। এই আশঙ্কা। তিন হাজার না হয় প্রচার বাহির করিবে না। যতদিন না তিন হাজার হয়, তত দিন প্রচার বন্ধ রাখ। Advertise কর যে তিন হাজার গ্রাহক না হইলে প্রচার বাহির করিব না। তিন হাজার পুরিলেই প্রথম সংখ্যা বাহির করিব। যতদিন না বাহির করি কা...নিকট টাকা চাই না। কেবল নাম ও ঠিকানা চাই। প্রথম সংখ্যা বাহির হইলে, দাম পাঠাইতে হইবে। নহিলে কেহ দ্বিতীয় সংখ্যা পাইবে না।

(৪) তোমার আপত্তি আকার কমাইলে অগৌরব আছে। আমার বিবেচনায় আকার না কমাইয়া দাম কমাইলে অগৌরব আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে জ্ঞান সুলভ করিবার জন্য মূল্য কমাইবে, মূল্য কমাইবার জন্য আকার কমাইবে তাহাতে আমার বিবেচনা অগৌরব...

(৫) যদি প্রচার রাখ, তাহা হইলে ইহা একটা earnest engrossing pursuit হওয়া চাই। কেবল সখের জন্য রাখা, কিম্বা কেবল যদি দুই পয়সা আসে, সেই চেষ্টায় রাখা অনাবশ্যক। অল্প বয়সে তাহা চলিতে পারে, এখন তোমার সে সময় নহে। মনুষ্যত্ব শিখিবার সময় ও কাজ শিখিবার সময়। সখের কার্জে মনুষ্যত্ব বা কাজ শিখা যায় না।...

(৬) প্রচারকে... ...পরিণত করিতে গেলে তোমার কি...হইবে।

আপাততঃ ...বিজ্ঞাপন দিয়া রাখ। ১লা বৈশাখ হইতে...eries আরম্ভ করিও।

এই সকল আমার আদেশ নহে। যাহা তুমি···সুবিধা বিবেচনা করিবে তাহা করিবে। আমার মনে এইরূপ উদয় হইয়াছে, এই জন্য লিখিলাম।

ইন্দু, মুটু প্রভৃতি সকল ভাল আছে। ইতি তাং ১ সেপ্টম্বর

পুঃ। নলিন যে দশ টাকার কথা বলিয়াছিল, তাহা পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে আর টাকা নাই। অতএব বিশ্বনাথ লাহাকে যে···টাকা দিবার জন্য পাঠাইয়াছি, তাহার মধ্যে দশ টাকা মাত্র···বিশ্বনাথ লাহাকে দিবে, আর দশ টাকা নলিনের বরাতে···দিকে দিবে। ইতি

[এই চিঠিটি সংগ্রহের একটু ইতিহাস আছে—

দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ একদিন আমায় বলেন—শুনেছি কবি যতীন বাগচীর বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠি আছে।—এই শুনেই কবি যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে যাই। গিয়ে তাঁর পুত্রবধূ (ফণীন্দ্র-মোহনের স্ত্রী) শচীরাণী দেবীর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করি।

শুনলাম, কলকাতায় হেয়ার স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর যতীন্দ্রমোহনের সহপাঠী ছিলেন।—সম্ভবত সেই সূত্রেই কোন এক সময়ে দিব্যেন্দুসুন্দরের কাছ থেকে তাঁর পিতাকে লেখা তাঁর দাদুর এই চিঠিটি যতীন্দ্রমোহন নিয়ে রেখেছিলেন।

যতীনবাবুর বাড়িতে এই চিঠিটি শতছিন্ন টুকরো টুকরো অবস্থায় পাই। অতি কষ্টে ঐ টুকরোগুলো সাজিয়ে চিঠিটিকে এই অবস্থায় দাঁড় করিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিটি লিখেছিলেন জ্যেষ্ঠ জামাতাকে।

জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্রকে সম্পাদক করে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রচার পত্রিকা বার করেছিলেন, সেই প্রচার প্রথম বছরে তিন ফর্মা হিসাবে ছাপা হ'ত এবং দাম ছিল প্রতি সংখ্যা তিন আনা। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রচার পাঁচ ফর্মা হিসাবে ছাপা হয় এবং দাম হয় পাঁচ আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি পেয়ে রাখালবাবু তখন এক মাস মাত্র প্রচার বন্ধ রেখে ছিলেন। তাই দ্বিতীয় বর্ষের অগ্রহায়ণ-পৌষ দু-সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় ঝিনাইদহে ছিলেন। রাখালবাবুর দুই পুত্র ইন্দু ও মুটু তাঁরাও তখন ঝিনাইদহে দাদু-দিদিমার কাছে থাকতেন।

রাখালবাবু সপরিবারে থাকতেন, কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সানকি ভাঙ্গায় ২নং ভবানী দত্ত লেনের বাসায়।]

[রামদাস সেনকে লেখা]

সুহৃদবরেষু,

আপনার প্রণয়োপহার স্বরূপ গ্রন্থ দুইখানি পাইয়াছি ও পত্র দুইখানি পাইয়াছি। পীড়া প্রযুক্ত এতদিন পুস্তক প্রাপ্তির সম্বাদ ও পত্রের উত্তর লিখিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জনা করিবেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ একখণ্ড আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় আমার কার্য্যকারককে লিখিয়াছি।

ভরসা করি আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। ইতি ১ অগ্রহায়ণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[রামদাস সেন ছিলেন বহরমপুর কোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজীবী। বাড়িতে এঁর একটি বিরাট লাইব্রেরী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকার সময় এঁর লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়তেন। ইনি বঙ্গদর্শনের লেখকও ছিলেন। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার আগে এই পত্রিকার লেখক হিসাবে তখনকার যে কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই রামদাস সেনেরও নাম ছিল। ইনি প্রধানতঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা লিখতেন।]

[তারাকুমার কবিরত্নকে লেখা]

প্রিয়বরেষু,

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা পড়িলাম। কয়টিই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলাটুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে (মানকুমারী বসু) সর্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদ করিলাম। ১৩ই মাঘ ১৩০০ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[তারাকুমার কবিরত্ন বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি মানকুমারী বসু, উভয়েরই পরিচিত ছিলেন। মানকুমারী দেবী তাঁর কাব্যকুসুমাঞ্জলি বইটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত জানবার জন্য তারাকুমারবাবুর মারফৎ একটি বই বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। সেই বই পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র তখন তারাকুমারবাবুকে এই চিঠিটি লিখে তাঁর ঐ অভিমত জানিয়ে ছিলেন।]

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি। আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও। 'আরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে…যান, আগে যারে পথ দেখাইয়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিকপালগণ পূর্বমত দিক্ পালন করিতেছেন। চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ (১২৮৯ সাল। ১৬ এপ্রিল ১৮৮২)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র

আছে।***সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দ মঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ, আত্মোদর-পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরং'।

বৈশাখের 'বান্ধব' পাইয়াছি। এবং 'মূলমন্ত্র' 'জাতীয় সঙ্গীত'!, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও "শাপেনাস্তংগমিত মহিমা', শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কিজন্য বৈতরণী সৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী' সে ব্যক্তি নিশ্চয় জানিত উড়িষ্যার বৈতরণী পারেই যমদ্বার বটে।

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেমবাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়া ছিল। সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।

আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ [১২৮৯। ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩]

অনুগ্রহাকাঙ্খী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক এই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন।

চিঠির হেমবাবু হলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।]

[ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদূর জানি এ দেশীয় বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড় বিরল। সুতরাং এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য যে, দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বালিকাদিগের স্বামি সংসর্গ অবিধেয়। এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার-বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইন মতে সম্মতি দানের [বয়স] দশ বৎসর, দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

বাল্য বিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।

কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পূর্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। 'ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ' ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি, অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না, দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ি যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজ-গৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

আমার মতে আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইতি তাং ২৯ আশ্বিন [১২৯৮]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্মা

[ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের একজন নাম করা লেখক ছিলেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'প্রচার' পত্রিকার লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠিতে, বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলনের কথা বলেছেন, সেই আন্দোলনের একটা বিরাট ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের কিছুটা হচ্ছে এই—

আগের দিনে আমাদের দেশে খুব অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার একটা রীতি ছিল। তবে এই বাল্যবিবাহ থাকলেও তখন স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের একটা বয়স নির্দিষ্ট ছিল। তখন গবর্ণমেন্ট সহবাস সম্মতির আইনে বধূর বয়স দশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এই আইন চলাকালেই একবার এক পাষণ্ড তার বালিকা বধূর উপর এমন অত্যাচার করে যে, তার ফলে বধূটির মৃত্যু হয়। তখন এই সংবাদটি নিয়ে কাগজে কাগজে খুব লেখালেখি চলতে থাকে। এই দেখে গবর্ণমেন্ট সহবাস সম্মতির আইন আবার নতুন করে তাতে বধূর বয়স বার করে দেওয়ায়, দেশের লোক মহা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই নিয়ে বিরাট আন্দোলনও শুরু করে। দেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থেকে শুরু করে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত এই আন্দোলন নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন।

এই আন্দোলন সম্বন্ধে সেকালের এক ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় যা লিখে গেছেন, তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'আইনসভায় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রও (হাইকোর্টের জজ) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ এ সকল প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া বার বৎসর বয়স নির্ধারণ করিয়াই সহবাস সম্মতি আইন পাস করেন। দেশের সর্বত্রই ইহার প্রতিবাদ হয়। কলিকাতার স্থানে স্থানে, অবশেষে গড়ের মাঠে লোকারণ্যের মধ্যে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ হয়। চূড়ামণি (শশধর তর্কচূড়ামণি) মহাশয় জ্বালাময়ী ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। সভা ভঙ্গের পর যখন সেই লোকপ্রবাহ বড়লাটের বাড়ির (বর্তমানের রাজভবন) সম্মুখ দিয়া 'আইন চাই না' 'আইন চাই না' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, সে দৃশ্য এখনও পর্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ লোক 'বঙ্গবাসী'তে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ

লিখিতেন। কয়েকটা প্রবন্ধের জন্য বঙ্গবাসীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে আদালতে হাজির হইতে হইয়া ছিল। পরে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখনকার রাজদ্রোহ আইন সুস্পষ্ট ছিল না। বঙ্গবাসীর এই মোকদ্দমা হইতে তাহাকে সুস্পষ্ট করা হয়। এখন অনেকে যে তাহার কবলে পড়িতেছেন, তাহা অবশ্য সকলে লক্ষ্য করিতেছেন।'

গবর্ণমেণ্ট যখন 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী, তখন বঙ্গবাসীতে পাঁচটি বিশেষ প্রবন্ধের মাধ্যমে এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বঙ্গবাসীতে ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হলে সরকার বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা রুজু করেছিল।

সরকারের সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে লিখে বঙ্গবাসী যখন মামলায় জড়িত, প্রায় সেই সময়েই ঠাকুরদাস বঙ্গবাসীতে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেন। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই বঙ্গবাসীর লেখক হিসাবে তিনি বঙ্গবাসীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাস বঙ্কিমচন্দ্রেরও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই সূত্রেই মনে হয়, সরকারের সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কি মত, তা জানবার জন্য ঠাকুরদাস বঙ্কিমচন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও উত্তরে ঠাকুরদাসকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

আজ (১৯৭৮ খ্রীঃ) ভাবতেও বিস্ময় লাগে যে, মাত্র সাতাশি বছর আগে স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের আইনে স্ত্রীর বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বার করায় তখন দেশে কী মার মার কাট কাট রব উঠেছিল। অথচ আজ একরূপ প্রতিটি পরিবারেই বিশ-পঁচিশের আগে মেয়েদের বিয়েই হচ্ছে না। আর এই বয়সে বিয়ে হচ্ছে শুধু শহরেই নয়, পল্লীবাংলারও প্রায় ঘরে ঘরেই।

ঠাকুরদাসকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিটি পড়ে দেখা যাচ্ছে, সমসাময়িক কাল বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি শুধু স্বচ্ছই ছিল না, তখনকার হাইকোর্টের জজ রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়েও তিনি ছিলেন অনেক বেশী উদার, চিন্তাবিদ ও প্রগতিশীল।]

[প্রমদাচরণ সেনকে লেখা]

…'সখা' পড়িয়াছি। সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। 'সখা' প্রধানতঃ বালক-বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্তু এ 'সখা'র সাহায্য অনেক পলিত কেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। বালক-বালিকার এমন সদ্বন্ধু অতি দুর্লভ। এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয় গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচি মার্জিত। এই 'সখা'র সঙ্গে এ দেশীয় তরুণ বয়স্ক মাত্রেরই সখিত্ব করা উচিত। 'সখা'র জন্য, যাহার ঘরে শিক্ষনীয় বালক-বালিকা আছে, সেই আপনার নিকট ঋণী। আপনি যশস্বী ও কৃতকার্য হউন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। ইতি ৩০শে অগ্রহায়ণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[প্রমদাবাবু কলকাতার সিটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার উদ্দেশে 'সখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। প্রমদাবাবু কয়েক খণ্ড পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে, তখন তিনি প্রমদাবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

চিঠিটি 'সখা সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এই চিঠিটির কথা আমাকে জানান আমার এক বন্ধু অশোক উপাধ্যায়।]

[ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

Berhampore,
The 14th March [1872.]

My Dear Sir,

I am very happy to acknowledge your favour of the 11th. You are mistaken in considering me a stranger ; I claim the honour of being acquainted with you ; we have met more than once.

I scarcely know how to thank you for the many fine things you are kind enough to say of me. But as I know that my obligations to you in this respect are of long standing, I will not seek to diminish their weight by a tardy return of thanks.

I wish you every success in your project.[১] I have myself projected a Bengali Magazine[২] with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular ; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be ; I think that we ought to disanglicise ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand. I therefore project a Bengali Magazine. But this is only half the work we have to do. No purely vernacular organ can completely represent the Bengali culture of the day. Just as we ought to address ourselves to the masses of our own race and country, we have also to make ourselves intelligible to the other Indian races, and to the governing

race. There is no hope for India until the Bengali and the Panjabi uuderstand and influence each other, and can bring their joint influence to bear upon the Englishman. This can be done only through the medium of the English, and I gladly welcome your projected periodical. But I have thought it necessary to give you my ideas on the subject of an Anglo-Bengali literature at length, because you will find me singing to a different tune on other occasions, on the principle that each side of a question must be put in its strongest light, specially when we have to fight against a popular one.

After this, I need not tell you that I shall not want in inclination to co-operate with you, and if my literary services are worth enlisting on your side, they are at your disposal. It is true I am likely to be a little overworked at present, owing not to my literary engagements, but to a reduction in the number of officers at our Staion, but I will nevertheless make time both for your Magazine and mine. And if it be worth while to insert my name in your list of contributors I have no objection to your doing so.

Hoping this will find you all serene, I am,

My Dear Sir,
Yours truly,
Bankim Ch. Chatterji.

[শম্ভুবাবুকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিগুলি সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল প্রথমে 'বেঙ্গল : পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট (১৯১৪ এপ্রিল-জুন)' পত্রিকায় টীকা সহ প্রকাশ করেছিলেন।

১ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিন' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তখন এই পত্রিকা যে পর্যন্ত মাত্র ৫ মাস চলেছিল। পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা পুনরায় চালু করে, তিনি তখন এই পত্রিকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখা চেয়েছিলেন।

২ বঙ্গদর্শন পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে।]

Berhampore,
May 13, 72.

My Dear Sambhu,

I don't see why we should 'Babu' each other. Pray, call me plain Bankim in future.

Many thanks for your kind opinion of my periodical. I was rather disappointed to find that the Patriot[১] contained no review of it, specially as I had requested my publisher to send out presentation copies to no Editors except yourself. My publisher[২] has not I find strictly acted up to my wishes.

My pot-bellied reviewer[৩] comes out strong under the disguise of an anonymous correspondent—as he did on previous occasions when he had to review my books. On this occasion, however, it is possible that the writer is a genuine correspondent, for the review has very much the appearance of having been written by some lad who has yet his Entrance Examination test to pass. You will hardly find it worthy of being replied to in the columns of the Patriot, but nevertheless I have asked my publisher to send you the paper, if only to enable you to teach the Editor a lecture on the impropriety of admitting silly communicatious which disgrace journalism.

You can hardly catch me tripping in the matter of that treacle (? tirade) of mine against Anglicism. I was prudent enough to make a salvo in the case of people who take up your ground. I have carefully distinguished between the case of those who speak to India at large and the ruling caste and that of those who address their own race only. And you may remember I warned you that you will find me singing to another tune on the ground that one must place

(or) always try to place, his view of a question in the strongest light, if he wants to persuade.

Your remarks on the getting (up) of the Banga Darsana, I have communicated to the manager, He must improve. Poor Dinabandhu[8] is not responsible for that feeble article on our costume, It was from another celebrity, whom I was obliged to humour.

When do you bring out your first issue ? I have got the prospectus, I hope to commence a tale in your Magazine, as soon as I get my contributors to work in earnest. I hope to be in time for your second issue. Pray, try to enlist Raj Krishna Mukerjee, M. A. of the High Court Bar, one of our most promising young men. Babu Gooroo Churan Dass, Depy. Magistrate may be of use to you, if you ask him. No more space,

Yours very truly,
B. C. Chatterji.

[১ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা। শম্ভুবাবু এক সময় এই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় খুব লিখতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সময়কার পুস্তক ও পত্রিকার সমালোচনাগুলি প্রায় সবই ছিল শম্ভুবাবুর লেখা। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার তখন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল।

২ কলকাতায় ভবানীপুরে ১নং পিপুলপট্টি লেনে ব্রজমাধব বসুর একটি প্রেস ছিল। ইনি একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ছিলেন। প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনের ইনিই ছিলেন মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

৩ ইনি সম্ভবত সেকালের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'এর খ্যাতনামা সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

৪ নাট্যকার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র।

৫ বঙ্গদর্শনের লেখক ঐতিহাসিক ও বহু ভাষাবিদ্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি পরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বাংলা অনুবাদকের কাজে যোগ দিয়েছিলেন।]

Berhampore,
July 22, 72.

My Dear Sambhu,

So you are out at last! First of all I congratulate you on your excellent getting up. I have not yet gone through all the articles, but I have skipped over them all, and what I have read leaves no doubt in my mind that the Magazine will be a success. I am specially glad of the eloquent tribute of affection you pay to my lamented friend Girish.[১] Ras Behari's[২] orthography is disgraceful, e.g., Jashahar for Jasohar, Protap for Pratap, etc. He makes also some ludicrous mistakes and cites the বত্রিশ সিংহাসন for the 'Betal Panchisi'. Baidyanath[৩] is a very well article. "Infant Marriages"[৪] is not worthy of the Rev. K. M. Banerji. The article on Lobb[৫] is, I believe, by Ashutosh Mukarji—is it not? So far as I have read, it seemed very clever. Why is the single epigram from the Sanskrit[৬] headed "Epigrams?" The Epigram itself does not seem to me to be in any way Epigrammatic, but then it is written by a live Raja, and the title may, like charity, cover a multitude of sins. Rajendra's article[৭] is, of eourse, superb. I wish he had given us more of it. And your squib on Tobacco[৮] is also capital. I wish you would go on as you have begun.

I suppose you continue to get my Magazine. If so, I don't think it will be necessary to send you another copy in exchange for yours. I have not forgotten my promise to contribute my little mite to your Magazine. Trusting this will find you all hale and hearty,

I am,
Yours sincerely,
Bankim Ch. Chatterji.

১ ['হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদ পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় পর্যায় 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে' শম্ভুবাবু নিজে এঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

২ যশোহরের তখনকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাসবিহারী বসু। ইনি দ্বিতীয় পর্যায় মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যায় 'অ্যান্টিকুইটিজ অব্ যশোর ঈশ্বরীপুর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

৩ 'দি ট্রাভেলস অব্ এ হিন্দু' গ্রন্থের লেখক ভোলানাথ চন্দ্র দ্বিতীয় পর্যায় মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যায় 'এ ভিজিট টু বৈদ্যনাথ' নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ঐ প্রবন্ধের কথাই বলেছেন।

৪ দ্বিতীয় পর্যায় মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটির আসল নাম ছিল Infantine Marriages in India.

৫ এই প্রবন্ধটি ছিল 'মিঃ লব অন দি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি'। লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি নিজের নাম না দিয়ে লেখক হিসাবে লিখেছিলেন 'বাই এ গ্র্যাজুয়েট অব দি ইউনিভারসিটি'।

৬ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রবন্ধ 'এপিগ্রামস ফ্রম দি স্যাংসক্রিট'।

৭ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ 'দি হোমার অব ইণ্ডিয়া'।

৮ শম্ভুবাবুর নিজের প্রবন্ধ 'অন টোব্যাকো অ্যাণ্ড স্মোকিং'।]

Berhampore,
Sept. 4, 72.

My Dear Sambhu,

Kindly excuse the long delay which has taken place in replying to you. At first something or other made me put off the reply—and then came a long and serious illness, from which I have just been freed.

I would have redeemed my promise and contributed my

humble mite to your Maga [zine] but for my illness. All brain-work is prohibited to me at present, so much so that I have been obliged to make over my own Maga [zine] to a friend, 'pro tem'.

By the way is your second issue out ?[১] I fancy not. If so, you are sadly wanting in punctuality. Of course you never promised punctuality, but restricted your engagements to ten issues in the year. But still you are lagging behind.

I assure you I do not deserve—at least have long ceased to deserve—your compliments on my gallantry. I see you have not forgiven my transgressions. I yet hope you will.

The Observer[২] is hard upon you. As you are able to hold your own against the Observer, I wish you won't waste breath on the subject.

I never read the Bengal Times ?[৩] What did he say ?

Trusting this will find you all hale,

I am,
Yours sincerely,
Bankim Ch, Chatterji.

[১ মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

২ কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি ইণ্ডিয়ান অবজারভার'। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে।

৩ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দি বেঙ্গল টাইমস' পত্রিকা।]

Berhampore
Septr. 27, 72.

My Dear Sambhu,

I have been unable to write to you in acknowledgment of your second number, which is really splendid. I have liked almost all the articles—that on Nuddea[১] specially. "Oviparous Genesis"[২]—evidently by Rajendra—is also first-rate. I have had a relapse and am still unable to do my usual amount of work. Will you be in town during the holidays ?

Yours sincerely,
Bankim Ch. Chatterji.

১ পণ্ডিত মাধবচন্দ্র শর্মা লিখিত প্রবন্ধ 'The Antiquity and Importanceof Nuddea and the History of its Sanskrit University : I The School of Logic'.

২ এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম হিসাবে ছিল—MITRANUS. আসলে ইনি ছিলেন—ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র।]

Berhampore,
28th December [1872.]

My Dear Sambhu,

Really you take me by surprise. Were you my debtor ? That is a lucky discovery. I thought it was I who had lagged behind in the matter of correspondence. Now that you confess yourself to be in the wrong, I hold myself entitled to read you a lecture. That intellectual treat I reserve for a future occasion.

Ashu of Chooa has been defaming me. In the first place I don't keep good health, though I always did justice to the sweetmeats and other noneatables manufactured at Chooa. In the second place I have been doing right loyal service to the State by trying to fill its coffers, so that it may rebuild the Jagur barracks and indulge in other magnificent pastimes, to the edification of the tax-paying public. What the devil do niggers want their money for? They had better pay in their all at the Government Treasuries, and Government will do them an immense deal of good by erecting uninhabitable barracks and by abolishing slavery in Zanzibar. You see my work is genuine philanthropy. The luxury of [illegible, taxing the ?] people for their own good! I am afraid you outsiders don't appreciate it.

'Mookerjee' is getting on so splendidly that I thought such little assistance as I could render was not needed. But since you wish that even the coarse and scentless 'Dhutura' should bloom in your Nandana (excuse poetical flights) by the side of the Mandara and the Parijata, why, you shall be satisfied. Now, let me know what I shall write. Stories? But you seem to have enough of them, and one serial story like Bhubaneswari[5] is enough for one Maga [zine]: Shall it be a review? I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonia against 'Mookerjee'. That is why 'Banga Darsan' has so little of politics in it. Shall I send you light sketchy things which shall be neither flesh nor fish nor red herring? Do you want nonsense? I can manufacture that precious commodity 'ad libitum'.

One should think from the lengthy apology you tack to

your note that you have been falsely accusing me of murder, robbery and rape. You only said wise and good things, and I don't see that needed an apology.

When do you issue your next ? By the end of January I suppose ? Trusting this will find [you] as jolly as ever.

I am,

Yours sincerely,

Bankim Ch. Chatterji.

[১ রাসবিহারী বসুর লেখা 'Bhooboneshoree or the Fair Hindu widow'.]

Berhampore,

The 5th January, 73

My Dear Sambhu,

A happy New Year to you and to your maga [zine].

I am engaged in writing something for you. Indeed it is ready, and it should have gone before this, but I am obliged to wait a little for one or two books I find it necessary to refer to.

If you are issuing your next in the middle of January, why, I must wait for your next issue.

Pray don't insert that bit of confession[১] anywhere. Campbell and Bernard[২] know enough of me to be able to identify this penitent at once. Not that they would hang me if they did, but it would not be [at] all agreeable.

My story (the one intended for 'Mookerjee') shall wait till Bhubaneswari chooses to leave the coast clear, though I certainly don't wish for such a consummation.

Trusting this will find you all serene,

I am,

Yours sincerely,

Bankim Ch. Chatterji.

[১ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ The Confession of a young Bengal.

২ বাঙ্গলার তৎকালীন লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল এবং তাঁর সেক্রেটারী মিঃ চার্লস বার্ণাড।]

Berhampore,

The 19th Jany. [1873]

My Dear Sambhu,

There are three good libraries in Berhampore, and I have got the books I wanted, but have been unable to make the use of them I intended from [want] of time. I have been busy writing the Banga Darsan for Falgun. I have, therefore, been unable to finish my paper intended for 'Mookerjee'. It does not matter, however ; for if I waited to finish it, it might grow too bulky for your maga [zine] : I therefore send you the paper[১] as it is, rather incomplete, but still in a readable shape. I hope you will accept it. If you do, I will try to send you another instalment and complete my plan.

I have been obliged to send you the rough draft as a matter of course—rather tough work for the printer, as I write the worst hand in the world. I am afraid I must ask you to send me a proof, if you admit the article.

Nor have I been able to revise the paper carefully—so if

you can make time, pray carefully look over the grammar, about which I don't pretend to be over-careful. Some small critics, white of course, have been carping at the grammar of your maga [zine].

I have to thank you for a copy of your pamphlet, so kindly sent to me. Of course the "The Prince in India"[২] is not new to me, though I never had an opportunity of reading it through. I am doing so now.

When do you bring out your next No. ?

Trusting this will find you all serene,

I am,
Yours sincerely,
Bankim Ch. Chatterji.

[১ ১৮৭৩ এর মে সংখ্যা মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ 'The study of Hindu Philosophy'.
২ এটি সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিজের লেখা প্রবন্ধ।]

Berhampore,
February 6, 72 [1873]

My Dear Sambhu,

I am sorry I have disappointed you. But it is so much easier to write a serious essay than things which go under the name of light literature, that the temptation was strong upon a hard-worked poor devil like me. If you dislike the paper I sent you, you can consign it to your rubbish basket. I will take the earliest opportunity of sending you something more to

your liking, but that earliest opportunity may not altogether be an early one.

Every European with Lord Northbrook's candour and wide sympathies will say what he said about 'Mookerjee'. The critics I spoke of are of that class who are impatient of anything Bengali which ts good ; and their criticism does not go beyond the debatable points of grammar, as you can see in the English weeklies. You can afford to depise these critics, but then that is no reason why I, who am conscious of my weakness, should not take care.

I never had more things on my hand than I have just now. Trusting this will find you more free to enjoy life than your humble collaborateur,

I am,

Yours sincerely,

Bankim Ch. Chatterji

Berhampore,

The 16th March, [1873.]

My Dear Sambhu,

I have received only the latter half of the proof,[১] and this I received only yesterday evening. The other half I have not yet received. The post is very regular with me ; so pray don't abuse it. I will send yon the proof back as soon as I receive the whole. I see the printer has made glorious work out of my delicate calligraphy. It is lost labour to ask me to write legibly. You may as well preach to the winds.

More hereafter. I am rather fidgetting just now.

Yours sincerely,

Bankim Ch. Chatterji.

[১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'The study of Hindu Philosophy' প্রবন্ধের প্রুফ।]

Banga Darsan,
Editor's Office, Berhampore,
The [Not dated] 187

My dear Mirza Sambhu Chandra,

The story about my illness was a pure fiction. The gentlemen who gave it out in the papers managed also to send news of my death to my house at Kantalpara.[২] The announcement in the Haleeshahar Patrika[৩] of my illness was intended merely to create belief in the report of my death sent to my relatives, this being supposed an excellent way of punishing a man for his literary opinion.[৪]

I wish there were the same amount of truth in the news of your illness—which you yourself give. But as you have got rid of it, we will not discuss the question further.

"Shawkari Jawlpawn"[৫] (am I right in the orthography ?) is a capital fellow, and I wish I could "emetet" not only his orthography, but also his great good sense and his exquisite English. And I am grateful to the naughty fellow for making room for poor "Bankim" in the same para with yourself and that deaf "Sabhaung." May the shadow of that orthographical prodigy never grow less !

I ought to have told you that your last double number[৬] was the best you have issued—the best—so far as I know which the "head-eater"[৭] of any magazine—has succeeded issuing in India—almost all the articles were very good, the Bride of Shambhu Das[৮] exquisite. The article on Commerce[৯] I read with avidity—is Bhola Nath Chunder the writer ? The

design of the Avatar[১০] was well conceived—but it is easily seen that your engraver is not first-rate.

Mr. De's[১১] review of বিষবৃক্ষ is rather of the faint praise and civil sneer type. The reviewer is evidently the editor himself, who grossly contradicts some statements he made in an article he contributed to the Calcutta Review a few years ago. R. C. Dutt[১২] writes to me that he intends reviewing the book in the Patriot. Will your head-Eatership condescend to eat my head in 'Mookerjee'? An exquisite critic in the Somprakash[১৩]—Pot Belly himself for aught I know—pronounces the book unreadable, and the author an unmitigated dunce. This is high praise. Praise from such a quarter would have damned the book.

That promised second part of Hindu Philosophy is a Frankenstein which would kill me. To make it worthy of your maga [zine] I must go through a fearful amount of tough reading, which to an indifferent Sanskrit scholar and hard-worked man like myself would be dreadful. Besides I have exhausted what I had to say about the Sankhya in an article in the Calcutta Review and a series of articles in the Banga Darshan—and the Sankhya is the only system [of] which I have made anything like a study. What I intend to give you—if you will take it—is a sketch of Sankaracharya's influence on Hindu thought as an illustration. Even for this, you must give me time. In the meantime, if a sketch or a squib be not unacceptable to you, I will send you some after the holidays. I don't suppose I will show my sweet face to your longing eyes during the holidays, for I have got another lover here to attend to—the glorious Road Cess. I am too fond of him to leave him even for a fortnight, especially in this his lingering

old age. But this is spinning a fearfully long yarn—and I must close.

Yours very sincerely,
Bankim Ch. Chatterji.

[১ চিঠিটি সম্ভবত ১৮৭৩ এর জুনে লেখা।

২ ২৪-পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। এই গ্রাম বর্তমানে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত।

৩ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৭৩ এ এটি সাপ্তাহিক হয়।

৪ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় কঠোরভাবে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য অনেকে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিরূপ হয়েছিলেন।

৫ ১৮৭৩ এর জুন সংখ্যা মুখার্জীজ ম্যাগাজিনের 'What he should not be : By Shaukare Jaulpwan' লেখাটি প্রসঙ্গে বলেছেন।

৬ নবম ও দশম সংখ্যা এক সঙ্গে ডবল সংখ্যা হিসাবে ১৮৭৩ এর জুনে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭ Head-eater বলে কৌতুক করেছিলেন।

৮ ১৮৭৩ এর জুন সংখ্যা মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রাম শর্মার (নব গোপাল ঘোষ) কবিতা 'The Bride of Sambhudos. A Tale of Pingal' প্রসঙ্গে বলেছেন।

৯ ভোলানাথ চন্দ্রর প্রবন্ধ 'A Voice for the Commerce and Manufactures of India' প্রসঙ্গে বলেছেন।

১০ A Modern Avatar নাম দিয়ে মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেলকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গ চিত্র।

১১ রেভারেণ্ড লাল বিহারী দের মাসিক পত্রিকা 'The Bengal Magazine' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষের' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন।

১২ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত আই.সি.এস.

১৩ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'সোম প্রকাশ'।]

Berhampore,

The 27th Novr. [1873.]

My Dear Sambhu,

I just drop a line to give my thanks to the Amateur Homoeopath[১]—who I know is no other than the "Head-Eater" himself. By the bye—why don't we see more of that "Gret geneus" the "Shaukari Jawlpawn".

I cannot congratulate you on your frontispiece[২] this time. I am no admirer of Sir George Campbell, but I think it was due to yourself that you should not descend to "Georgy Baba" and "George Pir," though I don't object to "Georgy Natu." It is folly in me—your junior both in years and in reputation,—to attempt to dictate to you in matters of taste, but it seems to my humble judgment that caricatures like "Georgy Baba," etc., though good for my friend of Amrita Bazar [Patrika]. suit ill the taste and breeding of our best literary magazine. But a truce to preaching.

I am growing very fond of the Kerani.[৩] His sketches are exquisite.

Trusting this will find you in the full swing of enjoyment in this enjoying season, I am,

Yours sincerely,

Bankim Ch. Chatterji.

[১ ১৮৭৩ এর অক্টোবরের মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে An amateur Homoeopath নাম দিয়ে সম্পাদক শম্ভুবাবু নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের সমালোচনা করেছিলেন। শম্ভুবাবু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন।

২ ১৮৭৩ এর অক্টোবরে মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত।

৩ কেরাণী জীবন নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ।]

[নবীনচন্দ্র সেনকে লেখা]

বইয়ে ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্র সেনকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠির কথা বলেছি এবং নবীনবাবুর 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে ঐ চিঠির কিছুটা উদ্ধৃতও করেছি। নবীনবাবু তাঁর বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পুরা চিঠিটি দেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসও তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্রের Essays and Letters বইয়ে ঐ চিঠিটি পুরা দিতে পারেন নি। এঁরাও মূলত নবীনবাবুর বই থেকেই চিঠিটি সংগ্রহ করেছেন।

বইয়ে ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি ছাড়া ব্রজেনবাবুদের বই থেকে ঐ চিঠিটির অতিরিক্ত আরও কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি।

ব্রজেনবাবুরা তাঁদের বইয়ে নবীনবাবুকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি পত্রাংশ দিয়েছেন। সেটি এর পরে দিলাম—

Jajpur
January 20th 1883

* * * *

I warn you, however, not to be too confident of success. Of popularity I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth century—while others will take it to be a parody of the Mahabharat and I must assure you that an inadequate execution is likely to bring it down to the latter level.

Lastly, will your poem be historically and politically true? I have advised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned. But I am hardly bold enough to advise you to do so in the case of large national movements. Now I believe it is not historically

true, either that Krishna set himself up against Brahmanical authority (there was never a greater champion of it) or that the Brahmans ever coalesced with the Non-Aryans, in order to put down the Kshatryas.

I must also tell you that the second canto (?) (কুরুক্ষেত্র) has struck me as being a sort of parenthesis between the other two—the main action being carried on by the first and third. The action in the second canto (?) is mainly the death of Abhimanyu and the only connection it has with the action of the poem is that it brings some personal misfortune to Krishna and Arjun. But the death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage, viz, the establishment of the empire ; and it is therefore only an episode. An episode ought not to take up one of the three cantos (?) to itself.

13-5-83.

I do not quite understand why you should feel any diffidence in carrying on the 'Raibatak'. My own plan is never to seek the opinions of others, and as I have found by experience that my interference in the way of advice or criticism has spoilt many a fine work, I give none myself. It is a rule with me at present to pass no opinion on contemporary productions. Genius—even mere talent,—must work out its conception.

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

Jajpur, Camp Burchora.
November 13/82.

My Dear Bhudeb Babu,

I have received the পারিবারিক প্রবন্ধ। I should perhaps earlier have acknowledged the very kind words with which the present was accompanied, but I believe no thanks I could send would have been acceptable to you unless I could also send you my assurance that I have read through the book in 48 hours. I can say so now.

I write all this without any scruple because although the publication is anonymous, I believe you do not wish to keep the authorship a secret from me, and you would take me for a greater blockhead than I am if I pretended that I did not guess it. There is only one hand which could have produced the work ; and the whole public is probably aware whose it is.

I take this opportunity of confessing to you—what perhaps few others will venture to tell you—that I have often felt hurt by your withholding your name from your writings. It has seemed to you that you feel reluctant to lend the honour of your name to such a thing as Vernacular Literature. In the present case the book rightly comes without a name. The most devout worship is that which is performed in secret. The whole book is one grand hymn to the holiest of human affections, and is best sung by an invisible chorister.

The highest poetry is also the highest practical wisdom—the poetry of Real Life. There is more practical wisdom in Shakespeare's plays than in Bacon's Essays—or in any other Engiish writings whatever. Many of my educated countrymen

have no hesitation in admitting this as an abstract proposition, but very few of them realise it in life. I believe your little volume will enable many of them to do so, if they will resort to its pages. But most of them think it 'infra-dig' to go to a Bengali book for instruction, even though that book be your writing.

I hope you will now do for our Social life what you have done for our Domestic life. The Social life presents the more unmanageable problem of the two. The inherent excellence of our domestic institutions and the true greatness of our women preserve our domestic life from disintegration.

Yours affly
Bankim Ch. Chatterji.

Byree, Jajpur.
The 22nd Nov. [1882.]

My Dear Bhudeb Baboo,

I shall be happy to send you some notes of my feelings—I cannot call them thoughts—on the various social problems before us. But may I ask you what is the plan on which you propose to deal with the social questions—if you deal with them ? I make the enquiry, because a knowledge of your plan may help me to explain myself better than I can without it. Social life is far more complicated than domestic life ; and its aspects are so multifarious,—so numerous are the questions it presents for solution, that I do not think that either you or any other individual writer, can undertake its exhaustive treatment— You have therefore I dare say formed some plan, or intend to

form some plan with the aid of which you propose to thread the labyrinth—some map or chart of the regions you propose to traverse. If I get a glimpse into that chart, I may be able to judge how far and in what manner I can follow you. In the meantime I will try to jot down a few notes regarding what is uppermost in my mind.

I had not space enough in my last letter to write of the delight with which I found that the পারিবারিক প্রবন্ধ had been written in a style suited to all, and the price low enough to be within the means of most. This will I hope enable the book to find its way, as it ought to do, into every household where there are readers. It enables a man to make his life sweeter to himself and to others at the cost of eight annas only.

I hope Nyayratna[১] remembers me. I have not ceased to love and esteem his sweet character.

Yours very sincerely,
Bankim Ch. Chatterji.

১ রামগতি ন্যায়রত্ন।

[স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদককে লেখা]

এই চিঠিগুলি জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড হেষ্টির স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির উত্তর।

এই চিঠিগুলির প্রসঙ্গ কথা হিসাবে আগে বইয়ে ৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় কিছু বলেছি। এখন চিঠিগুলি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ সহ এখানে উদ্ধৃত করছি।

I

[The Statesman, October 6, 1882.]

THE MODERN ST. PAUL.

To The Editor.

Sir,—Will you allow me to suggest to Mr. Hastie, who is so ambitious of earning distinction as a sort of Indian St. Paul, that it is fit that he should render himself better acquainted with the doctrines of the Hindoo religion before he seeks to demolish them ? As matters stand with him, his arguments are simply contemptible ; and I think the columns of the Statesman might have been more usefully occupied by advertisements about Doorga Pooja holiday goods than by trash which renders the champion of Christianity contemptible in the eyes of idolaters. This may be harsh language, but the writer who mistakes Vedantism for Hindooism, and goes to Mr. Monier Williams for an exposition of that doctrine, hardly deserves better treatment. Mr. Hastie's attempt to storm "the inner citadel" of the Hindoo religion forcibly reminds us of another equally heroic achievement—that of the redoubted knight of La Mancha before the windmill.

Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of Sanskrit scriptures in the Original. Let him study then critically all the systems of Hindoo philosophy—the Bhagabat-Gita, the Bhakti Suka of Sandilya, and such other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot

teach what they don't understand ; the blind cannot lead the blind. Let him study them with a Hindoo, with one who believes in them. And then, if he should still entertain his present inclination to enter on an apostolic career, let him hold forth at his pleasure, and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him. At present, arguments would be thrown away on him. There can be no controversy on a suject when one of the controversialists is in utter ignorance on the subject-matter of the controversy ; and if under such circumstances the "Olympians only yawn", and do not assert, Mr. Hastie has only to thank his own precipitate ignorance.

Ram Chandra.

II

[The Statesman, October 16, 1882]

EUROPEAN VERSIONS OF HINDOO DOCTRINES

Sir,—The solution of riddles and conundrums is not a legitimate subject for the columns of the Statesman, and if I again seek to occupy any portion of its space, it is not with a view to essay my skill in exercises which Mr. Hastie may possibly have found beyond the capacity of unpromising students in the General Assembly's Institution. The courage and dash with which Mr. Hastie throws down the gauntlet I admire and acknowledge with a low salaam, merely suggesting, in all humility, the necessity of further improvement in transliterating and transcribing Sanskrit texts. Contempt for diacritical marks is no doubt right, but I am afraid that, without them, even Dr. Muir himself will not acknowledge the multilated fragment to be Vedic verse.

But Mr. Hastie's letter of the 6th has a serious as well as a comic side. Mr. Hastie now ascends from the apostolic serenity of his former letters, to the grandeur of prophetic fury. It is no longer St. Paul addressing the benighted heathen in the language of persuasion; it is the old Hebrew prophet hurling forth anathemas against the enemies of God and of Israel. In plain language, as some irreverent heathen may be supposed to say, Mr. Hastie loses temper. That is an important point gained in favour of Hinduism. Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings, in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling-house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the nation. And all this without the slightest provocation, and from no other motive than a somewhat overflowing zeal in the cause of truth and of religion. And then, when an humble individual of the nation whose religion he tramples upon, ventures upon a single retort, Mr. Hastie's temper is on fire and it explodes. The combatant who loses his temper in fight is rarely believed to be on the winning side. That is the point I score in favour of Hinduism. If this is the attitude which the Christian missionary of the present day thinks it proper to assume towards Hinduism, Hinduism has nothing to fear from his labours.

But to come to the real casus belli, which alone is of any importance. I suggested to Mr. Hastie that before putting himself forward as the assailant of the Hindu religion, he should study the Hindu scriptures in the original, and under the guidance of native scholars who believe in them. That Mr. Hastie does not choose to accept my advice does no

harm either to me or to my cause. It is no loss to the Hindu religion that its assailants do not choose to be better armed than they are. But beneath Mr. Hastie's scornful rejection of my advice, there lurk errors which are not confined to him, but are shared by a large class of Europeans, whose numbers, position and influence, and sincere good feeling for Indian populations give them an importance far superior to what can arise out of this shallow and somewhat worn-out controversy.

The first of these errors consists in the assumption that, because European Sanskritists are competent scholars, the translations from Sanskrit which they produce must necessarily teach all that the originals have to teach. A brief consideration will convince Mr. Hastie, and others who think with him, that no translation from the Sanskrit into a European language can truly or even approximately represent the original.

Let the translator be the profoundest Sanskrit scholar in the world—let the translation be the most accurate that language can make it, still the disparity between the original and the translation will be, for practical purposes, very wide. The reason is obvious. You can translate a word by a word, but behind the word there is an idea, the thing which the word denotes, and this idea you cannot translate, if it does nat exist among the people in whose language you are translating. The English or the German language can possess no words or expressions to denote ideas or conceptions which have never entered into a Teutonic brain. Now, a people so thoroughly unconnected with England or Germany as the old Sanskrit-speaking people of India, and developing a civilisation and a literature peculiarly their own, had necessarily a vast store of ideas and conceptions utterly foreign to the Englishman or the

German, just as the Englishman or the German boasts a still vaster number of ideas utterly foreign to the Hindu. These, which form the spirit and the matter of religious and philosophical treatises, are entirely distorted and, as a matter of necessity, misrepresented in every translation—even in the best. And the best translation—not translations merely, but all comments and expositions in any language so widely differing as the European languages differ from the Sanskrit—must, thus, to a great extent be misleading.

And who is best qualified to expound the ideas and conceptions which cannot be translated—the foreigner who has nothing corresponding to them in the whole range of his thoughts and experiences, or the native who was nurtured in them from his infancy? If obviously the latter, what is the meaning of this towering indignation at my suggestion that Mr. Hastie should resort to the latter for instruction? I added that he should take his lessons not merely from a Brahmin, but from a Brahmin who believed in them. Was it so very unreasonable as to call down a protest from Mr. Hastie on behalf of the helpless, ill-treated scholars of Europe? Does Mr. Hastie believe that any department of human thought which has had its influence on a large portion of the human race, will yield any valuable results without a loving and reverential study? If Mr. Hastie thinks that he can comprehend the vast complicated labyrinth of Hindu religious belief without studying it in the original sources of knowledge, and in a spirit of patient, earnest, and reverential search after truth, he will meet with bitter disappointment. He will fail in arriving at a correct comprehension of Hinduism, as—I say it most emphatically—as every other European who has made the attempt has failed.

And if he thinks that his eloquence alone will enable him to demolish the oldest and the most enduring of all religious systems without a correct knowledge of its doctrines—why, I can only wish for an Indian Cervantes to record his achievements.

Mr. Hastie has unnecessarily complicated the question by his protest on behalf of Europeaa Sanskritists. No one questions their scholarship. I can assure him that men like Max Muller and Goldstucker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr. Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen often recoil in fear and despair. And I, as a native of India, would be ccrtainly shamefully wanting in gratitude, if I did not acknowledge their great services in the dissemination of the Sanskrit language and Sanskrit learning throughout the civilised world. When, however, Mr. Hastie goes on to say that "both the Sanskrit language and the Sanskrit literature are much better understood in Europe and America than they are in India," I decline to follow. It is, I believe, one of the most monstrous assertions ever made ; but what gives it importance is that not a few Europeans, and possibly some anglicised natives—Hindus I cannot call them—who do not mix with their own race, believe it to be true. The principal ground for this belief is, I think, to be found in the circumstance that these Europeans and natives are more familiar with what European scholars have written on Indian languages and Indian literature than with the writings of native scholars. A few natives, like Dr. Rajendralala Mitra and Dr. K. M. Banerjee, write in

English. Those not less estimable men, who are more anxious to address the vast mass of their own countrymen than a few European scholars, prefer writing in their own vernacular. The cxistence and the scholarship of those who choose to write in their own vernacular, in perference to Mr. Hastie's, remain to him and to those who think with him as things unknown. I am also willing to confess that the native scholars have written much less than Europeans, and that the intellectual culture of the mass of the readers whom they seek to instruct being inferior to that of the highly educated class whom European writers address, the scientific value of their writings is necessarily proportionately inferior. But the inference does not follow that native scholars are less at home in the language and literature of their own country than European Sanskritists.

The question is, however, hardly relevant. European scholars may be all that Mr. Hastie says that they are ; no one seeks to depreciate their merits. What I said of them was— "They cannot teach what they do not understand ; the blind cannot lead the blind." This of course is a mere truism on the surface, but it is not the mere truism which has induced Mr. Hastie to explode. I did mean to say that the fundamental doctrines of the Hindu religion and its vast details are what no European scholar uuderstands and what no European scholar is competent to teach. This I did mean to say, and this I again positively assert. I will add, that there are many other things in Indian literature and Indian philosophy—other things than the religious doctrines—which no European scholar understands, and no European scholar is competent to teach. I will also assert with equal emphasis that in these

cases, the native scholar is decidedly a better teacher than the European. What I assert I am prepared to maintain, and if you, Mr. Editor, will not grudge me space, and your readers their patience, I will maintain what I assert in my next letter. This one is already too long.

In conclusion, I regret that having to write from a part of India accessible with difficulty, I am necessarily tardy in replying. I shall cheerfully respond to Mr, Hastie's invitation to write under "my own honest patronymic" in my concluding letter, if Mr. Hastie will insist on it. That I do not do so now, proceeds merely from a desire to spare Mr. Hastie the disappointment of finding himself opposed by an unworthy antagonist. In the meantime, I enclose my card, in order that Mr. Hastie may satisfy himself, at his pleasure, about the very humble position, but also about the genuine Brahmindood of his adversary.

Ram Chandra

P.S.—The most amusing part of Mr. Hastie's letter is perhaps the parenthetical interrogation, "Did he write Suka ?" Mr. Hastie, who gladly recognises it "among the pearls of Sanskrit literature," does not see his way to correcting your printer's mistake. Sandilya's celebrated treatise is entitled Bhakti Sutra, not Bhakti Suka.

III

[The Statesman, October 28, 1882.]

THE INTELLECTUAL SUPERIORITY OF EUROPE.

Sir,—I am sorry to have again kept Mr. Hastie and his "confidential circle" waiting for the promised amusement, but

a Brahman's proper occupation during the Pujas is feasting, not controversy. Advised by Mr. Hastie that religious discussions contribute so abundantly to clerical mirth, I now hasten to treat him to a rather large measure of that commodity.

What I offered to maintain in my last letter was that the fundamental doctrines of the Hindu religion, and its vast details, are what no European scholar understands, and what no European scholar is competent to teach ; that this is true not only of the doctrines of the Hindu religion, but also of much in Hindu literature and Hindu philosophy, and that in these cases the native scholar is a better teacher than the European.

Your readers may consider it somewhat super fluous that anybody should undertake to prove that those who profess a religion understand its doctrines better than those who do not profess it. I must do Mr. Hastie the justice to say that he has nowhere distinctly denied this. It is, however, really the absurd conclusion to be drawn from the position Mr. Hastie has taken up. It is the logical outcome of that monstrous claim to omniscience, which certain Europeans—an extremely limited number happily—put froward for themselvers. No knowledge is to them true knowledge unless it has passed through the sieve of European criticism. All coin is false coin unless it bears the stamp of a Western mint. Existence is possible to nothing which is hid from their searching vision. Truth is not truth, but noisome error and rank falsehood, if it presumes to exist outside the pale of European cognisance. The rest of mankind are the dwellers in the thick wood, says Mr. Hastie, who see not before them, and to lend sight to

whom, hosts of beneficent angels have to descend from Western skies, bearing mysterious fragments of Vedic verse on their radiant wings.

Yet nothing is a more common subject of merriment among the natives of India than the Europeans' ignorance of all that relates to India. A thousand stories in illustration are current in the bazaars, one of which will admirably serve my purpose here, and I hope your readers will tolerate it. A navvy who had strayed into the country, and felt fatigued and hungry, asked for some food from a native whom he met on the way. The native gave him a cocoanut. The hungry sailor, who had never seen a cocoanut before, bit the husk, chewed it, in spite of instructions to the contrary, and finding it perfectly inedible, flung the fruit at the head of the unhappy donor in the shape of thanks. The sailor carried away with him an opinion of Indian fruits parallel to that of Mr. Hastie and others, who merely bite at the husk of Sanskrit learning, but do not know their way to the kernel within.

Did the limits of this letter permit, I could advance a dozen reasons why, in the case of every country and every people, the natives must, as a necessary consequence of their being natives, understand their own language and their own literature better than any foreign student. Mr. Hastie would probably have no hesitation in admitting this, if the question were one between one European people and another. His refusal to do so, when the question is between Europeans and Hindus, is grounded upon the reason he has distinctly asserted, the intellectual superiority of Europe, the divine right of Mr. Hastie and his co-religionists to intellectual prerogatives which may not be questioned. I cheerfully admit the intellectual

superiority of Europe. I deny, however, that the conclusion follows from the premises. I deny that intellectual superiority can enable any one to dispense with the essential conditions under which alone knowledge can be acquired, that it can enable the blind to see or the deaf to hear. Intellectual superiority may make a desperate bite at the husk, it cannot arrive at the kernel without the necessary native guidance.

In the case of religious doctrines, again, there is an additional reason why the native alone can be a competent teacher; it is, that he is a believer in them. Religious doctrines are, in the absence of that faith in them which gives them their highest value, mere dead formulæ, the lifeless carcase which may yet yield a lesson to the anatomist, but which is useless to the student of human nature.

Let us lay aside all general reasoning, and come to a circumstance peculiar to India, which alone is of sufficient weight to decide the case in my favour. I refer to the existence, unheeded by, or unknown to, the European, of a vast mass of traditionary and unwritten knowledge in India, used to supplement, illustrate, or explain the written literature. It is generally understood now that even before the art of writing was known in India, there was already a bulky literature which had to be handed down from teacher to pupil by word of mouth. Long before the introduction of writing, therefore, oral instruction had been systematised into an art such that writing could never entirely drive it out of the field. It could not do so because writing, though an undoubted convenience, was not by any means an easy art in the early stages of its

existence ; it was indeed never so in India even when it attained to its final perfection in the Deva Nagri character. Copying manuscripts was a work of time, and it may easily be conceived that only the substance of the doctrines to be taught was reduced to writing, the explanatory and illustrative portions being reserved for the easier method of oral communication. After this once grew into a system, it continued ever afterwards to be retained as the most convenient form of instruction, for the circumstances out of which it arose never changed. Knowledge in India thus came to be in part recorded in a written literature, and in part handed down as unwritten and traditional. All who have studied under the older generation of Bhuttacharyas of the tols, know, as I have the good fortune to know, that of the wealth of learning which flowed from their lips, much had no record except in the memory of the professors. This was specially the case with artistic and scientific knowledge, where another motive—professional jealousy—came into play. Each discoverer, anxious to confine to himself and his own circle the discovery at which he had arrived, never trusted it to writing, and satisfied himself with communicating it to his pupils in cofidence. To this jealousy we owe that India has now utterly lost so many of her ancient arts, and so much of her ancient sciences. Medical science is a conspicuous instance ; and the native physician, trained in European schools, still fails to wrest from the jealousy of the kabiraj treasures of knowledge which both regard as invaluable. Now all this unwritten and traditional knowledge, which is flesh and blood to the dry bones of the written literature, is wholly unavailable to the European scholar. The dry bones rattle in his hand and

as he knows how to rattle them well, they make a thundering noise in the ears of the civilised world. But the breathing form of the old learning and the old civilisation is visible to native eyes only.

I have no hesitation in admitting the decided superiority of the European enquirer in the fields of Vedic literature. To the Indian student the Vedas are dead ; he pays to them the same veneration which he pays to his dead ancestors, but he does not think that he has with them any further concern. They do not represent the living religion of India, and the only interest that can be felt in them by any human being is merely the historical intersest. That is all in all to the accomplished European scholar, but of little moment to the native student, who has never displayed any gifts for history. This accounts not only for the superior Vedic learning of the European, but also for the far superior value of his contributions to Indian and Aryan history. In all other departments of learning there can be no comparison between the profound but unostentatious learning of the Pundit of the tols with the shallow but showy acquisitions of the European professors. The rich and varied field of Indian philosophy the latter has trod but with a slight step. Into the subtle and profound Nyaya philosophy of the Bengal school, into that which formed the field on which Raghunatha, Gadadhara, Jagadisa won their great and lasting triumphs of intellect, the pride and glory of the Bengali race, he has not yet obtained a glimpse, or has obtained only the faintest glimpse. Of the great Vaishnava philosophy first formulated in that book of books—the Bhagavata Purana, and developed by a succession of brilliant thinkers, from Ramanuja to Jiva Goswami he

has no adequate conception. Nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of Tantra literature the European knows next to nothing. The secular poetry of ancient India he has studied, translated, and commented upon, but has failed to comprehend. A single hour of study of the Sakuntala by a Bengali writer, Baboo Chandranath Bose, is worth all that Europe has had to say on Kalidasa, not excepting even Goeth's well-known eulogy. Hindu law, the Smriti, is still the almost exclusive study of the Hindus themselves. The legends of the Hindu faith, which are to the European inexpressibly silly, he has hitherto honoured only with his laughter ; to the loving study of the author of Pushpanjali (also a Bengali writer, Baboo Bhudeb Mukerjee) they have yielded results not surpassed in loftiness and splendour by anything in European literature. And I might go on with this enumeration for columns together, but this ought to be enough. I have freely admitted European superiority where it is to be found. But their success in their special studies do not entitle the European Sanskritists to act as competent guides in departments of learning which they have not made their own.

I have been some what taken by surprise to find in Mr. Hastie's letter of the 16th instant, that he expects to find in this letter of mine such "explanation and defence" of Hinduism as I may be able to offer. He forgets that the issues between us exclude the larger question of the merits of Hinduism, and that in my very first letter I told him that no controversy was possible with him at present, because he did not possess the necessary qualifications.

Hinduism does not consider itself placed on its defence. In the language of lawyers, there is not yet a properly framed charge against it. And at the bar of Christianity, which itself has to maintain a hard struggle for existence in its own home, Hinduism also pleads want of jurisdiction. But I admit Mr. Hastie's right to demand an exposition of their views from those who do not accept his own. And an exposition of rational Hinduism from a native and believer will no doubt have other uses than Mr. Hastie's en-lightenment. I would leave this arduous task to more competent hands than mine. Even if I made the attempt, I could not accomplish it within the compass of a single letter, already long enough, and I don't think, Mr. Editor, either that you can afford space, or that I can find time for any more. It is, however, possible to close this letter with a few observations on Hinduism from the Hindu's point of view, for the benefit of those who may be inclined to study it for themselves before resolving upon its final extinction. They will at least help to illustrate, what I have advanced on the main issues in this controversy. As with these observations I positively close my share in it, I hope you will excuse the otherwise unjustifiable length to which this letter must necessarily attain.

Hinduism, like every other fully-developed religious system, consists of, first, a doctrinal basis or the creed; secondly, a worship or rites; and lastly, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis. This is the whole field of study; but let it be well surveyed. The doctrinal basis will be found to consist in (1) dogmas formulated, explained, and illustrated in a mass of philosophical literature; and (2) legends, which form the legitimate subject of the Puranas,

though these encyclopaedic productions contain many things other than the legends. The value of the legends is inferior to that of the philosophy, in the depths of which are laid, broad and solid, the foundations of modern Hinduism. The whole of Hindu religious philosophy is probably post-Vedic, and serves to mark the era of separation between the ancient and the modern religions of India. Each modern Hindu sect has now its own system of philosophy, but the more general conclusions of philosophy are common to all; and among all the dogmas, there is one in particular which has had more influence in shaping the destinies of India than any other. Kapila had the glory of first announcing it to the world, and the philosophy of Europe and Asia has not up to this day alighted upon a discovery grander or more fundamental than the profound distinction first made by him between matter and soul—between purusha and prakriti. In the hands of the eclectics, who are the real fathers of modern Hinduism, this great conception has taken its place as the backbone of their fabric. It runs through the whole world of Hindu thought, shaping the legends, prescribing the rites, and running through even the secular literature. So long as the student of Hinduism keeps this great idea before him, he will find Hinduism a living organism which has grown, and not a collection of dead formulae lumped together by finest craft.

Prakriti, properly translated, is Nature. Modern science has shown what the Hindus always knew that the phenomena of nature are simply the manifestations of force. They worship, therefore, Nature as force. Sakti, literally and ordinarily means force or energy. As destructive energy, force is Kali, hideous and terrible, because destruction is hideous

and terrible. As constructive energy, force is the bright and resplendent Durga. The universal soul is also worshipped, but in three distinct aspects, corresponding to the three qualities ascribed to it by Hindu philosophy. These are known in English translations as Goodness, Passion, and Darkness. I translate them as love, power, and justice. Love creates, power preserves, justice dooms. This is the Hindu [idea] of Brahma, Vishnu and Siva. I cannot stop to discuss the relation of these gods to their Vedic predecessors of the same names. The new religion grew out of the old, the time-honoured names were retained, but were grouped under new ideas. The citadel had been stormed and battered down by the Buddhists and the philosophers themselves; and had to be reconstructed out of the old materials, but on new and more solid foundations. Pantheism and polytheism, philosophy and mysticism, all lent a hand; and out of this bold eclecticism rose the beautiful religion which I do not believe to be of Divine origin, but which I accept as the perfection of human wisdom.

The great Duality—Nature and Soul—presides over all. Let us now see how the same great conception shapes the Legends. It will be enough to take for this purpose the legends of Krishna, because they are the most important, but I have time only for the briefest explanation. Krishna is Soul, Radha is Nature. The Sankhya philosophy—the school to which the great conception of Nature and Soul originally belongs but which in spite of its wealth of thought, is a gloomy pessimism —had laid down that supreme human bliss consisted in the dissociation of Soul from Nature. It had pronounced their connexion illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connexion. Nevertheless, the Hindu

worships this illicit union. He worships it because, with a truer insight than is given to the morose philosopher, he has perceived that in this union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth, and all love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion, of love for all that exists, is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe,

I will next add an illustration to show how the same great conception runs through even the secular literature of ancient India. The Kumara Sambhava, the noblest philosophical poem to be found in any language, but, I regret to say, also one of the least understood both in India and Europe, celebrates the marriage of Nature with Soul, typified in Uma and Siva. In the hands of the great poet, the union is a legitimate one—a holy marriage. The poet could soar above both philosopher and Puranist. I regret I have not space to explain or to do justice to Kalidasa's magnificent conception ; the yearning of the physical and human for the moral and the divine, and the accomplishment of their union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discripline of the heart. In that sacrifice, and in that discipline is to be found the poet's refutation of the philosopher. The sacrifice the destruction of Kama, is narrated in a well-known passage, which still remains the loftiest in all Indian literature, and is unrivalled by any I have come across in the poetry of any other nations.

I now pass on to the worship. Much of the Hindu ritual is mere mummery, admitted to be so by even the priests, and rejected with deserved contempt by educated Hindus.

Mr Hastie finds out, I hope, that the Hindu Idolatry, which is generally treated by the Christian missionary as covering the whole field of Hinduism, is really a small fraction of it and comes under consideration as a subordinate part of this second division of our subject. Mr. Hastie will probably be startled to hear that idolatry, though a part of Hinduism, is not an essential part even of the popular worship. Idol worship is permitted, is even belauded in the Hindu scriptures, but it is not enjoined as compulsory. The daily worship of the Hindu—his Sandhya,—his Ahnika, is not idolatrous. The orthodox Brahman is bound to worship Vishnu and Siva every day, but he is not bound to worship their images. He may worship their images if he choose, but if he does not so choose the worship of the Invisible is accepted as sufficient. The majority of Brahmans, I believe, do not in the daily rites go beyond this worship of the Invisible and the Unrepresented. A man may never have entered a temple and may yet be an orthodox Hindu.

And I must ask the student of Hinduism when he comes to study Hindu Idolatry, to forget the nonsense about dolls given to children. I decline to subscribe to what is simply childish, even though the authority produced is titled authority with a venerable look. The true explanation consists in the ever true relations of the subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as jusifiable as that of the

tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship.

Nor must the student fall into the error of thinking that the image is ever taken to be the God. The God is always believed, by every worshipper, to exist apart from the image. The image is simply the visible and accessible medium through which I choose to send my homage to the throne of the Invisible and the Inaccessible. Images of gods have in themselves no sanctity. They are daily sold in the bazaars as toys. The very images worshipped are made by impure workmen, sold in the bazaars, and are treated on exactly the same footing as other shopkeeper's wares. They do not acquire any sanctity till the 'prana pratistha', i.e., till I consent to worship it. The image is holy, not because the worshipper believes it to be his god—he believes in no such thing—but because he has made a compact with his own heart for the sake of culture and discipline to treat it as God's image. Like other contracts, this one with the worshipper's own heart, he may terminate at his pleasure. When he terminates it, he ceases to worship the image and throws it away, as we have just thrown away by thousands the images of Durga. He could not do this if for a moment he believed it to be his God.

Our idols are hideous, say they. True, we wait for our sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay, because India has produced no sculptors. The few good images we had have been mutilated or destroyed by the hand of Mussalman

vandals. The images we worship in Bengal are, as works of art, a disgrace to the nation.[১] Wealthy Hindus should get their Krishnas and Radhas made in Europe.

We come last of all to the ethics of the Hindu Religion. Like all other complete codes of morality, the Hindu ethical system seeks to regulate the conduct of individuals as well as the conduct of society. It is a system of ethics as well as a polity. The code of personal morality is as beautiful, if not more so, as any other in the world, not excepting the Christian; a degree of excellence which the Christian accounts for by supposing, like Mr. Hastie, that it must have been derived from Christian sources, very much after the logic of a little fellow I know, who insists that every man who drives in a carriage is his grandsire, on the ground that his grandsire drives in a carriage. The social polity is even more wonderful. It is the only system which has ever succeeded in substituting the government of Moral power in the place of that of Physical power. It is the only system which has abolished war and the military power.

If the profoundest European thinker of the nineteenth century had any acquaintance with India, he might have known that his dream of a Positive Polity and an intellectual hierarchy had, thousands of years ago, been thought out and realised with a success transcending all his anticipations-

Here, too, however, the student must distinguish between the essentials of Hinduism and its non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure ethics, and not religion. The

[১ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি কিন্তু বহু হিন্দু সত্য বলে স্বীকার করেন না।
—গ্রন্থকার।]

social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. There have been and there still are many Hindu sects who discard caste distinction. The Chaitanyaite Vaishnavas furnish an instance in point.

Mr. Hastie may turn round upon me here and say, "You strip Hinduism of its rites, its idolatry, its caste ; what do you then leave it ?—I leave the kernel without the husk.

I have done. I hope Mr. Hastie now understands how I dispose of his challenge. The modern Ram Chandra turns away from the Western Janaka's bow without touching it even with the tip of his little finger. For, alas ! the new Janaka has no Janaki to offer as the prize. Truth, the Janaki he seeks to win, must be wooed in another fashion. Methods of disputation which find favour only among pugnacious school-boys gathered at a wedding feast are as unworthy of Mr. Hastie as they are of me. But if a confession from me of inferiority to Western scholars in Vedic learning will bring any comfort to Mr. Hastie, he will see that I have already made such confession on behalf of my countrymen, and I even more readily make it on my own behalf. I make no pretension to scholarship of any kind.

I have to thank Mr. Hastie for his very kind offer to procure for my lucubrations the recognition of the great Sanskritists of Europe. I assure Mr. Hastie that he has again mistaken his man. Happy that such recognition is already the fortunate lot of certain distinguished countrymen of mine, whom I somewhat reluctantly spare the humiliation of being mentioned by name in this connection. I hasten to assure Mr. Hastie that I am not ambitious of honours which I do not deserve and may not pride. As my card is already at

Mr. Hastie's disposal, I may presume to tell him that the approbation of a whole people has consoled me during a quarter of a century, and may console me still, for the absence of laurels which more fitly grace the heads that were them now. If Mr. Hastie knows anything of Hinduism, he knows that the Hindu places the wreath round the full, not round the empty vessel. I am sorry to have to say this, but Mr. Hastie's pointless jest carries an insinuation which can be met only in this way.

In conclusion, I have to thank you for allowing me the very unreasonable extent of space which I have taken up ; I have also to expreess my deep commiseration for Mr. Hastie's bitter disappointment in finding that Ram Chandra was not the very great man from whose encounter he had expected to add fresh lustre to his rusty arms. There is, however, nothing like hope. Let him cheer up. A louder and shiller blast at the castle-gate of Hinduism may not yet procure him the honour of an encounter with even—ay, even with the windmills.

Ram Chandra

IV

[The Statesman, November 22, 1882.]

THE RECENT CONTROVERSY.

Sir,—I have no wish to reopen the controversy I have closed, but allow me to remove a misconception—a most painful one, as your readers will see.

Dr. K. M. Banerjee writes :—"RAM CHANDRA tells us that nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of the Tantra literature the

European knows next to nothing. If this has any meaning, it must be that the Tantra with its unwrittin traditions, is the general basis of Hinduism."

That certainly is not the meaning, and I have not understood how such an interpretation has been arrived at. There may be opinions which influence the destinies of nations, without being the base of national religion, The paganism of Greece has largely moulded, in some of its aspects at least, the civilisation of modern Europe ; but the paganism of ancient Greece is not the general basis of Christianity. Islamism has very greatly influenced the destinies of India, without being the general basis of Hinduism. Christianity at this day largely influences the destinies of India, yet Christianity is not the general basis of Hiuduism.

What the influence of Tantrikism has been on the people of Bengal, of Assam, and of Orissa, I do not propose to discuss here. I do not say that the influence has been beneficial. I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in Kapala Kundala in regard to the morality of that form of Hinduism. True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness, and I say with as much sincerity as he does, that let it never be assumed that Tantrikim is the general religion of the Hindus ; no one, I believe, has ever thought of making such an assumption.

Let Tantrikism perish—but let it not perish unstudied. The study of the darkest errors of humanity yields lessons as valuable as that of Truth itself. And what is history, if it is not the history of human errors ?

When Mr. Hastie talked of the "Tantrika Bible," and such other nonsense, I did not consider it necessary to make a reply: he had shown himself not to be entitled to any. It is different when Dr. Banerjee misconceives my meaning. I respect him too highly to remain silent.

As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my own.

Bankim Chunder Chatterji

November 18, 1882.

[কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

Calcutta

27th February, 1894

Dear Sir,

I believe we have no word in our language to signify the 'challenge of a sentinel'—at least I know of none. We may possibly coin a word to signify it, but I am against coining new words. The plan I recommend is to have recourse to a periphrasis where the adoption of the English word is not practicable, where it is practicable, the English word should be boldly imported into the language. Our language has been enriched by large importation from Arabic and Persian, and I do not see why we should be so jealous of English words. Unnecessary purism is a great evil.

Yours faithfully

Bankim Chunder Chatterji

এই চিঠিটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের The Calcutta University Magazine এ প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠির প্রাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় যে কে তা জানা গেল না। B. L. M. নাম দিয়ে এক ব্যক্তি এই চিঠিটি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে ছাপতে দেবার সময় সম্পাদককে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটিও ঐ সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি এই—

Sir,

Looking for some papers in my paper-box last year, I find the following letter addressed to Badu Krishnalal Mukherjee by the Late Babu Bankim Chander. It is on the subject of coining new words and needs no introduction.

Yours faithfully

15th July, 1895 B. L. M.

[জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীকে লেখা]

The 6th December

My dear Gyan Babu,

I have gone through your translation of Ratnabali carefully. The first 25 pages I have carefully compared with the original word by word. I can congratulate you on the result. I do not of cousse mean to say that I have not here and there detected trifling inaccuracies or omissions which a more careful revision than what a busy man like you can not find time for would have enable you to detect. But I do undertake to say that it is as good a translation as any in the language. The most renowned translation in our language (and deservedly renowned) is Kali Prasanna Sinha's Mahabharata. I have had lately occation carefully to scrutinise its accuracy and I have found it quite full of slips of the nature I speak of, which I know by experiences to be disadvantage in the circumstance that there in no good dramatic language in Bengali, as there is in English and in Sanskrit, and you have intentionally put yourself under the additional difficulty of translating verse in verse, a feat which even that most accomplished translator my friend Tarakumar can not always accomplish successfully though his skill in this respect is unapproachable. Should you ever undertake to publish your translation, and I think it fully worth while, I should advise you to substitute prose translation for metrical ones. I dare say such my country men as do not know Sanskrit will feel grateful to you for your spirited translation of this sweet little drama—a thing unequalled in its way.

Yours very sincerely
Bankim Chunder Chatterji

পারেন, মানুষ নিজ পুস্তক প্রবন্ধাদির গুরুত্ব কিরূপ অনুভব করেন। যদি আমি কাহাকে সুস্পষ্টরূপে সম্মান বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে অভিলাষ করি, আমি তাঁহাকে আমার রচিত অকিঞ্চিৎকর পুস্তক উপহার দিয়া থাকি। আমার মনে হইতেছে, এগুলি আপনি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিবেন। কেন না, আপনি আমার উপর বড় সদয়। আমি যাহা আপনাকে প্রেরণ করিতেছি, তাহা সম্ভবতঃ যৎসামান্য উপহার বটে, কিন্তু আমি যখন এ সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিব (চলিয়া যাইব), তখন ঐ সকল পুস্তক আপনাকে ও আপনার আত্মীয়-স্বজনকে এমন এক লোকের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবে, যে ব্যক্তি স্বদেশের জন্য কিছু কার্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে অল্পই কৃতকার্য হইয়াছে।

ভবদীয় প্রণয়াস্পদ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়